এস.এম. জাকির হুসাইন

কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল এবং মৃত্যুহীন জীবন

মিলেনিয়াম মানবের জন্য ইউনিভার্সাল মাইন্ড কন্ট্রোল

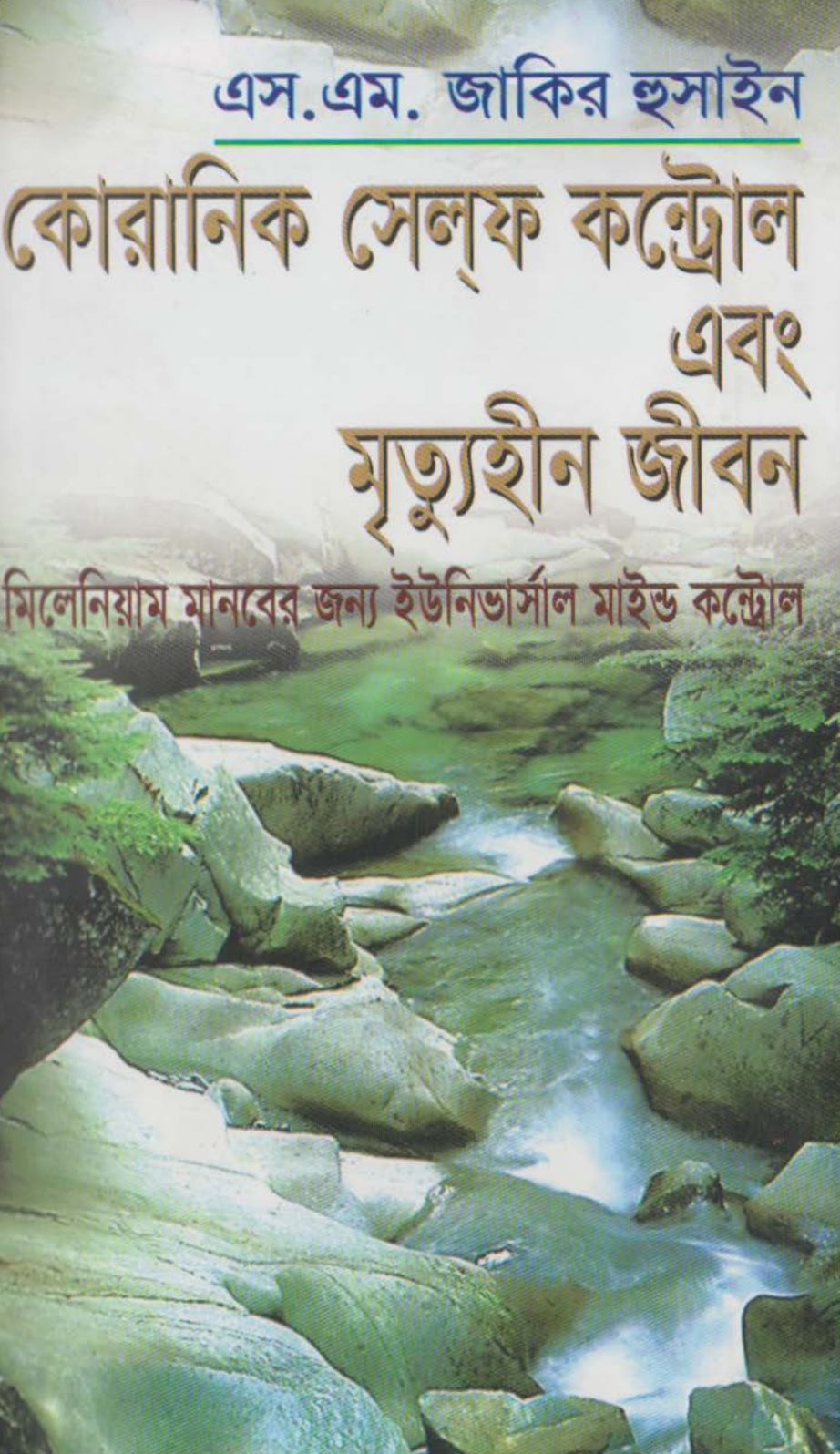

কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল এবং মৃত্যুহীন জীবন

মিলেনিয়াম মানবের জন্য ইউনিভার্সাল মাইন্ড কন্ট্রোল

এস. এম. জাকির হুসাইন

লেখকের অন্যান্য বই

কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস এবং অলৌকিকের সান্নিধ্যলাভ
কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য
সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন! (গাণিতিক প্রমাণ)
উদ্ভাবনী চিন্তার কাঠামো
The Beauty of Mathematics
অন্ধকারের বস্ত্রহরণ : বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার রাজ্যে এক গোপন অভিযান
ইত্যাদি

জ্ঞান কোষ
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

পঞ্চম প্রকাশ

জানুয়ারী ২০১৫

চতুর্থ প্রকাশ

মে ২০০৯

তৃতীয় প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ

নভেম্বর ২০০২

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০০১

প্রকাশক

শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৩৮৪৪৩

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

এস. এম. মামুন

কম্পোজ

বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০ ফোন : ৭১১১১৪৪

মুদ্রণেঃ

নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্
১৫বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN : 984-70277-0039-8

মূল্য ১৫০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক

ঢাকা : জ্ঞানকোষ, সোবহানবাগ; জ্ঞানকোষ, মমতাজ প্লাজা, ধানমণ্ডি
নীলক্ষেত : ডলফিন বুক সেন্টার, ফরিদা কর্পোরেশন, ফ্রেন্ডস বুক কর্নার
নিউমার্কেট : বুক ভিউ, বুক মার্ট
চট্টগ্রাম : কারেন্ট বুক সেন্টার, জলসা সিনেমা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ড. শহীদুল্লাহ মৃধা

এবং

প্রফেসর ড. আবদুর রব মিয়া

ড. মৃধা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। এমন যদি হতো যে এই বইটি পৃথিবীতে কেবল একজন পড়তেন, তাহলে সেই একমাত্র পাঠকই হতেন ড. মৃধা, যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। বইটি প'ড়ে তিনি যত খুশি হতেন, আমি আল্লাহর করুণায় এটা লিখতে পেরেও তত খুশি হতে পারিনি। বইটি দ্বারা যদি ইসলামের কিঞ্চিত উপকারও হয়, তাহলে আমি তার বিনিময়ে এবং উছিলায় আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

ড. রব আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রিয়তম শিক্ষক। আমার মতে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে-ক'জন হাতে-গোনা আদর্শ শিক্ষক আছেন, তাদের মধ্যে ড. রব অন্যতম। তার শিক্ষাদান পদ্ধতি সমস্ত গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। তিনি ইঙ্গিতে শেখান, হাসিয়ে শেখান, হাতে-কলমে শেখান—তথা চিন্তা করতে প্রলুব্ধ এবং বাধ্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর মতো অন্তত পঞ্চাশজন শিক্ষক থাকলে বাংলাদেশ উন্নত হয়ে যেত এবং যাবেও হয়তো। তিনি এখন আমাকে দেখলেও আর চিনতে পারবেন না। আমি কখনো তার মুখোমুখিও হইনি। তাঁকে নীরবে শ্রদ্ধা করেছি শুধু। আর এটাই আমার পছন্দ। আমি তাঁর ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

মানুষকে মৃত্যু দেয়া হয়েছিল কেন?
মৃত্যুকে অতিক্রম করার জন্য।
কেন দেয়া হয়েছিল জীবন?
জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হবার জন্য।
তা না হলে জীবনের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জীবন থাকত না।
সুতরাং জীবন শেষ হবার আগেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা চাই।

জীবনের ভূমিকা হলো মৃত্যু এবং মৃত্যুর ভূমিকা জীবন। ফলত যে-কোনোটি নিয়ে প'ড়ে থাকা মানে শুধু একটি ভূমিকার পর্যায়েই প'ড়ে থাকা। এই বইটি মূলত এই দ্বিবিধ সংকট থেকে উত্তরণের ভূমিকামাত্র। সুতরাং বইটির নিজস্ব কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু ব'লে রাখি যে, যে-সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়াতকে পুনরুক্ত ক'রে পাঠককে কিছুটা বিরক্ত করা হয়েছে, সে-সব ক্ষেত্রে তা এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে আয়াতগুলিকে বারবার পড়তে পড়তে সেগুলি যেন পাঠকের মনে গেঁথে যায়।

বিনীত
এস. এম. জাকির হুসাইন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মাইন্ড থেকে সেল্‌ফ ১

কী এই মাইন্ড বা মন? ১
মন এবং মহাবিশ্ব ২
মাইন্ড কন্ট্রোলের নামে বিভ্রান্তিকর কথকতা ৭
কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল এবং এর বিশেষত্ব ৮

মনের অসুখ ১০

প্রশ্নের শূন্যতা ১০
শেষ প্রশ্ন ১৪
প্রশ্নের প্রশ্ন ১৫
শৈশবের প্রশ্ন এবং যৌবনের উত্তর ১৯
প্রশ্নের গর্ভে ইবলিসের সন্তান ২১

মনের খুঁটি ২৭

ধ্বংসের সৃষ্টি ৩৩

মৃত্যুর মধ্যে জীবনের হাতছানি ৩৮

কোত্থেকে এলাম, কোথায় এলাম? ৪০

মনের অন্ধকূপ ৬৭

চিন্তার দারিদ্র্য এবং স্বভাবের গোঁড়ামি ৬৭
সৃষ্টির সময় বনাম সময়ের সৃষ্টি ৮১

দুঃখ-কষ্ট রোগ-ব্যধির কারণ : কোরানিক ব্যাখ্যা ১০৩

মনের শত্রু, মনের মিত্র ১৩৮

ক্রোধ ১৪৪
পছন্দ-অপছন্দ ১৫৫
আফসোস ১৬০
হতাশা ১৬২
কৃপণতা ১৬৩
ভয় ১৬৪
যৌবনের বাসনা ১৬৫
বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি : যা পাই তা চাই না ১৭১

নারীর মনের রহস্য ১৭৪

নারী কেন সুন্দর? কে এই নারী? ১৭৯

পরকীয়ার রহস্য ১৮৩

আল্লাহর আক্রোশ ২১০

www.pathagar.com

এক

মাইন্ড থেকে সেল্‌ফ

১. কী এই মাইন্ড বা মন?

মন কী?

তা যা-ই হোক না কেন, কোনো বিজ্ঞান বা দর্শনের বা ধর্মের এ কথা মানতে কোনো আপত্তি নেই যে মনটাই মানুষ।

আমার 'আমি'ই আমার মন।

কিন্তু 'আমি' কে?

এর কোনো জবাব নেই। 'আমি'কে না পেয়ে কখনোই বলা সম্ভব নয় আমি কে। আবার 'আমি'কে যে জানেনি, তাকে হাজার ব'লেও বুঝানো যাবে না তিনি কে। 'আমি'কে জানার একমাত্র উপায় হলো তাকে পাওয়া। এটাই এ বইয়ের উদ্দেশ্য।

মানুষের মনটাই তার অস্তিত্বের তথা আমিত্বের ধারক। অর্থাৎ মনই তার উপভোগ, মনই তার ভালোবাসা, মনই তার আকাঙ্ক্ষা, মনই তার কাম্যবস্তু—এক কথায় মনই তার আসল বন্ধু।

অথচ মানুষের বড় শত্রু এই মনই। তার যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রানুভূতি, পীড়া, অস্থিরতা এ সবকিছুরই হোতা হলো তার মনটাই। মানুষের মনই তার নরক রচনা করে—এবং মনের মধ্যেই তা গনগনে দোজখের মতো জ্বলতে থাকে।

মানুষ মনে করে যে তার মন যে দুঃখ-যন্ত্রণায় ভোগে, তার কারণ বাইরের জগৎ, বাইরে থেকে তা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তার এই ভাবনার মূলে রয়েছে মন সম্বন্ধেই তার চরম অজ্ঞতা। মনকে যিনি জানেন, তিনি স্পষ্টভাবে জানেন যে জগতে 'বাহির' ব'লে কিছু নেই; অজ্ঞ মনের বিচারে যাকিছু বাইরের জগৎ, প্রজ্ঞাবান এবং আলোকপ্রাপ্ত মন তাকে নিজের ভেতরেই খুঁজে পেয়েছে—বাইরে পেয়েছে কেবল তার ছায়া। ফলত চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে মনের কষ্টের কারণ সে নিজেই। মন নিজের ওপরই অবিচার করে থাকে। তাকে আয়ত্ত করা মানেই মানব জীবনের সব উদ্দেশ্যই সফলভাবে হাসিল করা।

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।
(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

এই হারিয়ে-যাওয়া মনকে ফিরে পাবার উপায়টা জানলে আর কোনো দুঃখের কারণ থাকে না :

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

আমি তাদের ভোগান্তিকে/দুঃখ-কষ্টকে সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলাম।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯৫)

তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১)

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত বিশ্রামের প্রশান্তি পায়। (সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮)

২. মন এবং মহাবিশ্ব

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার সৃষ্টির সাথে গোটা দৃশ্য এবং অদৃশ্য, জ্ঞাত এবং (আপাতভাবে) অজ্ঞাত সৃষ্টি জড়িত। যাবতীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সেবা করা—প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। পবিত্র কোরআনেই বলা হয়েছে যে যাবতীয় সৃষ্টিকে মানুষের আজ্ঞাধীন বা উপকারের অধীন ক'রে দেয়া হয়েছে।

আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছুকে আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য অধীন ক'রে দিয়েছেন। লক্ষ্য কর, চিন্তাশীলদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।
(সূরা জাসিয়া, আয়াত : ১৩)

ফলে সৃষ্টির প্রতিও মানুষের একটি দায়িত্ব রয়েছে—তা হলো, সে যেন গোটা দৃশ্য এবং (আপাতভাবে) অদৃশ্য সৃষ্টির সাথে তার দেহ-মনের সমস্ত ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই জীবন-যাপন করে। আর এই দায়িত্ব পালন করার সর্বপ্রথম এবং মৌলিকতম উপায় হলো তার নিজের মনের ওপর যথাযথ কর্তব্য পালন করা। মানুষের মনের গতিবিধির সাথেই যাবতীয় সৃষ্টির ভারসাম্যকে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে যেন মন তার নিজের সৃজনশীলতা এবং চেতনা দ্বারা নিজের ওপর যে ক্রিয়া করে, গোটা

www.pathagar.com

আসমান এবং জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টিই সেই মনের এবং তার ধারকের (দেহের) ওপর সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে। একথা পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

... আল্লাহ্ তার কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর যে করুণা বর্ষণ করেছেন তা কখনও পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মনকে পরিবর্তন না করে ...
(সূরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)

যারা **নিজেদেরকে পবিত্র করে** আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী; যারা সৎকাজ করে **তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে** সুখসয্যা। **কারণ** যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (সূরা রুম, আয়াত : ৪৪-৪৫)

তারা অন্যদেরকে এ (কোরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং নিজেদেরকেও; কিন্তু তারা তো শুধু **নিজেদের আত্মাকেই ধ্বংস করে**, কিন্তু তারা তা বোঝে না।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ২৬)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য **তোমাদেরই বিরুদ্ধে** যায়।
(সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

আল্লাহ্ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।
(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ইচ্ছা, অঙ্গীকার, হৃদয়ের পবিত্রতা, আল্লাহমুখিতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা এসবের যাবতীয় মঙ্গল এবং অমঙ্গল তারই দিকে ফেরত যায়। এসব দিয়েই রচিত হয় তার বাস্তবতা। কিন্তু কিভাবে? বাস্তবতার সাথে অদৃশ্য, অপরিমাপযোগ্য এই মানসিকতা ও আচরণবিধির সম্পর্ক কী? নিচের আয়াতগুলো থেকে সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হবে :

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (অর্থাৎ মানুষের কর্মফলই মানুষের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু কিভাবে? পরবর্তী আয়াতগুলোতে এর সমাধান রয়েছে।) (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, যেন প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে। (অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিফর্মুলার মধ্যে মানুষের সেই প্রতিশ্রুতিও একটা উপাদান যা প্রত্যেক মানুষ তার জন্মের আগে তার প্রতিপালকের কাছে দিয়েছিল। মানুষের কাজকে সেই প্রতিশ্রুতির সাথে মিলানো হয় এবং সেই অনুসারে কাজ থেকে কর্মফল সৃষ্ট হয়ে মানুষের কাছেই ফিরে আসে। চমৎকার সমীকরণ : যার কর্ম সেই ভোগ করবে—তার সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।) (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

আকাশে রয়েছে তোমাদের **জীবনোপকরণের উৎস** এবং **প্রতিশ্রুতি**। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতোই সত্য।

(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২)

তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং (পরিমাপের জন্য) ভারসাম্য স্থাপিত করেছেন, যেন তোমরা পরিমাপে বৃদ্ধি না কর (ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর)। ন্যায্য ওজনের মাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিয়ো না। (পরিপূর্ণ ভারসাম্যই আকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য। মানুষ খারাপ কাজ করলে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলা মানুষেরই ভোগান্তির কারণ হয়। আকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের বিভিন্ন কর্মফল সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।) (সূরা রহমান, আয়াত : ৭-৯)

তুমি বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই—যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেন—তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হোক—আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল, আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন; এবং **প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন** এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

(সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ, আয়াত : ৯-১২)

আসমান উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, এবং ফেরেস্তাগণ তাদের প্রতিপালকের **প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,** এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (এই রহস্যময় আয়াতে আল্লাহর নামের রহস্য এবং মাহাত্ব বর্ণিত হয়েছে। মানুষের কৃতকর্মের ফলে আকাশে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আল্লাহর নামের শক্তিতে তা কেটে গিয়ে তাতে আবার ভারসাম্য স্থিত হয়। মূলত গোটা সৃষ্টিজগতের পরিচালনার শক্তি আসে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ থেকে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন—তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর। এই আয়াতটা থেকেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।)

(সূরা শুরা, আয়াত : ৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ **যথাযথভাবে** আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, **যেন** প্রত্যেক মানুষ তার **কর্মানুযায়ী ফল** পেতে পারে; তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

আমি আমার **ক্ষমতাবলে** আকাশ নির্মাণ করেছি, এবং আমি অবশ্যই মহাক্ষমতাশালী।

(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭)

... তিনি জানেন—যা কিছু **ভূমিতে প্রবেশ করে** ও **ভূমি থেকে নির্গত হয়**, এবং **আকাশ থেকে যা বর্ষিত হয়**, এবং **আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়** ... (এখানে আল্লাহ আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যত কর্ম, কর্মফল, শক্তি, বস্তু ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, অর্থাৎ শক্তি শৃঙ্খল, খাদ্য-শৃঙ্খল, কার্বন-শৃঙ্খল ইত্যাদির বৃত্তীয় গতিবিধি যা সংঘটিত হয়, তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কোয়ান্টাম ফিজিক্‌সে যে-সব মহাজাগতিক রশ্মি এবং শক্তি-কণার কথা বলা হয়ে থাকে, যা দূর মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীতে আপতিত হয়, তার সবকিছুর প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।) (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৪)

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে **আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত**। (কারণ মানুষের বিশৃঙ্খল কামনা বাসনা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম কোনো সুষম ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। এজন্য জীবন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদেরকে সেই নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে যা দৃশ্য-অদৃশ্য-জ্ঞাত-অজ্ঞাত সব বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআনের নিয়মাবলীই সেই সার্বিকভাবে সুষম নিয়মাবলী।) (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে **যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ** দান করেছেন। (এ কারণে সেই বাস্তবতাই ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবতা যাতে প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যবস্থা তার নিজ নিজ প্রকৃতিতে অটল থাকতে পারে, কোনো বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি না হয়। ফলে বিবর্তনের একেক ধাপের জন্য সার্বিক ভারসাম্য ভিন্ন ভিন্ন হয় : যেহেতু দীর্ঘমেয়াদে বস্তুর প্রকৃতির কিছুটা পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটানোর জন্য পূর্বপরিকল্পিত।) (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি ফর্মুলার সাথে তথা অস্তিত্বের সাথে সকল জীবজন্তুর সৃষ্টি প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্য কথায়, মানুষ হলো গোটা সৃষ্টি জগতের **সমন্বয়কারী ফর্মুলা**—সবকিছু মানুষের মধ্যেই আছে, যা সাধকগণ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষীয় ধর্মগ্রন্থগুলোতেও একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।) (সূরা ফাতির, আয়াত : ৪৫)

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। (অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই রয়েছে গোটা বিশ্ব। হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন—তোমার মধ্যেই রয়েছে গোটা মহাবিশ্ব।)

যারা দাঁড়িয়ে, ব'সে, ও শুয়ে আল্লহ্‌কে স্মরণ করে, এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে—হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ অনর্থক সৃষ্টি করনি ...

(সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৯১)

www.pathagar.com

তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, যেন তোমরা ভারসাম্যের সীমা লঙ্ঘন না কর। (সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৭-৮)

আয়াতগুলোর মধ্যে যে মহারহস্য লুকিয়ে আছে তা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে। এগুলোতে সৃষ্টিরহস্যের এমন কিছু তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে বিজ্ঞান যার এক অংশমাত্র জানতে পেরেছে। আল্লাহর অলিগণ এরূপ সত্য সরাসরি প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন। আমরা আয়াতগুলো থেকে জানতে পারছি যে আমাদের মানসিকতা এবং আচরণ দ্বারা আকাশের গঠন-কাঠামো প্রভাবিত হয়—তার ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ফলে তা আমাদেরই ওপর যথোচিত প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে। আকাশের তথা গোটা মহাবিশ্বের সৃষ্টির এবং ধ্বংসের ফর্মুলার সাথে মানব মন এবং আচরণ অন্তর্ভুক্ত, যে কারণে মানুষ মহাবিশ্ব থেকে তার কর্মের ফল কড়ায়-গণ্ডায় পেয়ে যায় : সে ভালো কাজ করলে আকাশ থেকে উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হয়, ঋতু পরিবর্তন যথোচিত নিয়মে ঘটে, ফসলের ফলন ভালো হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না ... ইত্যাদি; অপরপক্ষে মানুষ খারাপ কাজ করলে জলে-স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে—ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, উল্কাবৃষ্টি ... ইত্যাদি আকারে মানুষেরই কর্মফল মানুষের কাছে ফিরে আসে! পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শক্তি শৃঙ্খল, কার্বন-শৃঙ্খল, খাদ্য-শৃঙ্খল ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান একথা বলে, যদিও বিজ্ঞান জানে না মানব মনের থেকেই গোটা সৃষ্টিজগতের জ্বালানি সরবরাহ হয়। আমরা আচরণের পরিমাপ লঙ্ঘন করলে আকাশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, কারণ আল্লাহ আসমান ও জমিনকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তারা মানুষের কাছে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাঠায়। আসমানের সৃষ্টি ফর্মুলার মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার যা সে পৃথিবীতে আসার আগে আল্লাহকে দিয়েছিল, ফলে তাতে আমাদের জীবিকার যে উৎস আছে তা আমাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়—সেই প্রতিশ্রুতি এবং আচরণের গরমিল দ্বারা উক্ত উৎসের ভারসাম্য প্রভাবিত হয়। এই ভারসাম্য রক্ষিত হয় কোরআন দ্বারা নির্দেশিত পথে চললে; খামখেয়ালিপূর্ণভাবে চললে তাতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। শুধু আসমান নয়, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিকুলও মানব মনের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে মানুষকে ধ্বংস করতে হলে তার সবই ধ্বংস হয়ে যেত। গোটা সৃষ্টির ফর্মুলাতে আল্লাহর নামের শক্তি এবং মানব মন জড়িত—ফলে সৃষ্টিই মানুষের জন্য ফাঁদস্বরূপ, তবে সে আল্লাহকে স্মরণ করলে ফাঁদ তাকে আটকাবে না, বরং তা তার দাসত্ব করবে।

সৃষ্টির সাথে সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে মানুষকে যেভাবে জীবন-যাপন করা উচিত সেভাবে জীবন-যাপন করতে পারলেই সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে—জীবনের কাছ থেকে তার পাওনাটুকু পূর্ণ সার্থকতার সাথে লুফে নিয়ে এমন অভাবনীয় তৃপ্তি লাভ করতে পারে যা সাধারণ অস্থির মন

www.pathagar.com

কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে মানুষকে প্রথমে তার মনকে সঠিক উপায়ে পরিচালিত করতে হয়। মনকে যথাযথভাবে এরূপ নিয়ন্ত্রণে রাখাকেই বলে মনোনিয়ন্ত্রণ। এই কাজকে আপাতভাবে মনের ওপর পরাধীনতা আরোপ করা ব'লেই মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে মনকে প্রকৃতার্থে স্বাধীন এবং দুঃখ-কষ্টহীন করতে হলে প্রথমে তাকে নিজের খামখেয়ালপনার কবল থেকে মুক্ত করা চাই। মনের সৃষ্টিরহস্য এমনই যে বন্ধনের মধ্যেই তার মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে, কিন্তু মনের আত্মচেতনা বা স্বাধীনতার কারণে মন প্রাথমিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না যে তার প্রকৃত চেতনা এবং শান্তি লুকিয়ে রয়েছে তারই স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতার মধ্যে। মনের এই স্বেচ্ছাচারিতাই মানুষের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি, দৈহিক যন্ত্রণা, অভাব-কষ্টের কারণ। সঠিক প্রজ্ঞা এবং আচরণ দ্বারা মনকে তার প্রকৃত শান্তি এবং সফলতার পথ দেখানোকেই মাইন্ড কন্ট্রোল বলে। এর উচ্চতম স্তরে পৌঁছতে পারলে মৃত্যুকেও অতিক্রম করা যায়। এই স্তরকেই আমরা বলছি সেল্‌ফ কন্ট্রোল।

৩. মাইন্ড কন্ট্রোলের নামে বিভ্রান্তিকর কথকতা

বলা বাহুল্য, গত কয়েক দশক ধ'রে positive thinking, mind control, mesmerism, hypnotism, self-hypnosis-ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে যে মানসিক ব্যায়ামের চর্চার হিড়িক চলছে, তা সামান্য কিছু ব্যায়াম এবং ছেলে-ভুলানো তত্ত্বকথা মাত্র। উদভ্রান্ত 'আধুনিক' দুপেয়ে জীবগুলো তাদের মানসিক স্বাধীনতার সীমারেখা চরমভাবে অতিক্রম করেছে ব'লে জীবনের দান তাদের কাছে আধিক্যের অভিশাপের কারণে অধিকাংশ সময়ে জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। এই অভিশাপের জ্বালা থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাবার জন্য তারা সাপ্তাহিক ছুটি-কাটানোর মতো মাঝে মধ্যে জীবনকেই ভুলে থাকতে চায়। আর এরই উপায় হিসেবে তারা ড্রাগ থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন কথা-সর্বস্ব চটকদার মাইন্ড কন্ট্রোলিং একসারসাইজের আশ্রয় নেয়। এতে তারা কখনো-কখনো আত্মচেতনার অপব্যবহার থেকে উদ্ভূত দোজখের আগুন থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকার তৃপ্তিটুকু পেয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারা জানে না যে এ হলো কেবল ক্লান্তির পরে বিশ্রামের তৃপ্তিমাত্র। ক্লান্তিকে ভুলে থাকা আর ক্লান্তিকে অতিক্রম করা এক কথা নয়। একথা অনুধাবন করার সময়ও তাদের নেই। সময়ের সাথে তারা দুর্ব্যবহার করেছে ব'লে সময় এবং জীবন তাদেরকে অহরাত্র ফাঁকি দিয়ে চলেছে। তথাকথিত মাইন্ড কন্ট্রোলের নামে তারা এই ফাঁকির মৃত্যু থেকে সাময়িকভাবে বাঁচার আশায় relaxation এর নামে আত্মবিস্মৃতির কবরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে থেকে চেতনার

www.pathagar.com

বোঝা কমাতে চায়। আত্মচেতনার অপব্যবহার বিশুদ্ধ চেতনার ওপর যে জঞ্জাল এবং যাতনা চাপিয়ে দেয়, তা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা সাময়িক চেতনালোপ বা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে, আর এ কারণে বর্তমানে সর্বত্র চলছে মাইন্ড কন্ট্রোলের নামে মাইন্ডকে ভুলে-থাকার দাওয়াই সেবনের হিড়িক।

কিন্তু কেউ নিজেকে ভুলতে পারে না।

আত্ম-চেতনা যখন চেতনার অপব্যবহার করে তখন চেতনাও তার পাল্টা আগুন দিয়ে তার প্রতিশোধ নেয়। ঘুম দিয়ে তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা গেলেও নেভানো যায় না।

৪. কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল এবং এর বিশেষত্ব

মাইন্ড কন্ট্রোলের সর্বোচ্চ স্তর হলো সেল্‌ফ কন্ট্রোল, যার প্রকৃত সুফল এবং শক্তি নিহিত রয়েছে পবিত্র কোরআন এবং নবী (সঃ)-এর সুন্নাহতে, যাদেরকে মেলাতে হয় বিশেষ উপায়ে সাধনার মাধ্যমে। আমরা ইতোমধ্যে কিছুটা বুঝেও নিয়েছি কী এর ফলশ্রুতি। এর রূপরেখা এবং পদ্ধতিগুলো কী তা আমরা স্পষ্টভাবে জানব। আমরা প্রমাণ সহকারে জানব যে ইসলামিক মাইন্ড কন্ট্রোল মানে কোনো সাময়িক ব্যায়াম নয়, তা হলো পুরোপুরি **লাইফ কন্ট্রোল।**

মনোনিয়ন্ত্রণ মানেই জীবন-নিয়ন্ত্রণ।

অর্থাৎ জীবনকে পাওয়া।

অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্তি।

সকল দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করা।

এমনকি শারিরীক যন্ত্রণাকেও অতিক্রম করা।

জীবনের স্বরূপ দর্শন।

নিজেকে ফিরে পাওয়া।

মানব-মনের স্বাভাবজাত স্বর্গসুখে পুনস্থিত হওয়া, যা আমরা আত্ম-চেতনা প্রাপ্তির সাথে সাথেই ভ্রান্তিবশত হারিয়ে ফেলেছি।

ইসলামিক আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে মনের যাবতীয় ময়লা থেকে মনকে পরিষ্কার করা।

অন্ধকারের অতল থেকে আলোর জগতে উঠে আসা।

সকল সীমাকে অতিক্রম ক'রে অসীমে উত্তরণ।

অন্তরের দারিদ্র্যমোচন।

ন্যূজ দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অনাড়ষ্ট সবলতা অর্জন।

www.pathagar.com

চিরকালীন মুক্তি।

দুশ্চিন্তা, হতাশা, যুগের ক্লান্তি থেকে চিরমুক্তি।

মোহমুক্তি।

তীলে তীলে মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে যাওয়া।

এর মাধ্যমে জীবনের অভিশাপ থেকে জীবন চিরমুক্তি লাভ করে। ভোগ পরিণত হয় যথার্থ সম্ভোগে। সংযম পরিণত হয় পরম প্রশান্তিতে। দানের মধ্যে আত্মপ্রাপ্তি ঘটে। প্রাপ্তির মধ্যে প্রকৃত সার্থকতা লাভ হয়। ভালোবাসা হয়ে ওঠে আনন্দঘন। বিরহ হয়ে ওঠে প্রেমময়।

এর দ্বারা লাভ হয় পরম স্বাধীনতা।

উচ্ছ্বসিত আনন্দ।

অদম্য আত্মবিশ্বাস।

অনড় আস্থা।

সীমাকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত, অবিনশ্বর অসীমের সাক্ষাৎ।

সকল শৃঙ্খল থেকে চিরমুক্তি।

ইহকাল-পরকালকে একত্রে বেঁধে ফেলে মৃত্যুহীন অসীম চেতনাতে একাকার হয়ে যাওয়া।

না, এ কোনো কবিসুলভ কথার ফুলঝুরি নয়। এটাই হলো পরম বাস্তবতা। যাবতীয় অবাস্তবকে অতিক্রম ক'রে যুগ-যুগের কারাভোগের পর স্মৃতিবিজড়িত আনন্দে নিরুদ্বেগ ঘরে ফেরা। পবিত্র কোরআনো যেমন বলা হয়েছে :

> তাদের পূর্ববর্তীগণও কৌশল করেছিল; কিন্তু সব বিষয়ের মূল পরিকল্পনা আল্লাহরই। তিনি প্রত্যেকটা আত্মার কাজের খবর রাখেন; এবং শীঘ্রই অবিশ্বাসীরা জানবে কারা অবশেষে ঘরে ফেরে। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৪২)

www.pathagar.com

দুই

মনের অসুখ

১. প্রশ্নের শূন্যতা

মানুষের মন তার নিজের অজ্ঞতার কারণে ব্যাধিগ্রস্ত। পবিত্র কোরআনে বারবার এই ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে :

যারা **নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে** তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে।
(সূরা আন্‌আম, আয়াত : ২০)

তাদের **খারাপ কাজ** তাদেরকে **আনন্দ দেয়**। (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৭)

... আমি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তারা যা করছে তা শোভনীয় করেছি।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ১২২)

পাশাপাশি তাতে এই ব্যাধি থেকে চিরমুক্তির আশ্বাসও দেয়া হয়েছে, যা ইহকালেই সম্ভব :

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

আমি তাদের ভোগান্তিকে/দুঃখ-কষ্টকে **সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত ক'রে** দিয়েছিলাম।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯৫)

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই **চিত্ত বিশ্রামের প্রশান্তি** পায়। (সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮)

কিন্তু কী সেই অসুখ? এবং কেনই বা তা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে অহরাত?

কারণ ...

কারণ, মানুষের মন নিজের অজ্ঞতার অন্ধকারেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; সে তার আল্লাহ-প্রদত্ত স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারীর মতো ব্যবহার ক'রে বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে, যার ফলে সে তার উৎসকে ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। হৃদয় তার একটাই—যা দেয়া উচিত সেই হৃদয়ের স্রষ্টাকে, অথচ সে তার কামনা-বাসনার দাসত্ব ক'রে নিজেকে পরিচয়হীন ক'রে ফেলেছে। শয়তানের ধোঁকার পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে না পেরে হয়ে গেছে অন্ধ, অযথা সত্যের বিরুদ্ধে তুলেছে বিতর্ক; ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেছেন :

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪)

যারা নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে।
(সূরা আন্‌আম, আয়াত : ২০)

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।
(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়া এবং উদারতায় ভরপুর, তবুও অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬১)

যার হৃদয়কে আমি আমাকে অবহেলা করার অনুমতি দিয়েছি, সে অধীনতা স্বীকার করবে না। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮)

অতঃপর ওরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ্ ওদের হৃদয় বাঁকা ক'রে দিলেন।
(সূরা সাফ, আয়াত : ৫)

আল্লাহ্ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।
(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

... শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, যারা পাষাণ হৃদয়। সীমালঙ্ঘনকারীরা অশেষ মতভেদে আছে।
(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৩)

যারা অন্ধ এবং যারা দেখে, তারা সমান নয় : তারাও সমান নয়, যারা বিশ্বাস করে এবং ভালো কাজ ক'রে, এবং যারা মন্দ কাজ ক'রে। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৫৮)

মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। (সূরা কাহাফ, আয়াত ৫৪)

মানুষ ভুলে গেছে সে কে।

ধরুন আপনার বাড়ির পাশ্ববর্তী কোনো রাস্তার মোড়ে একজন লোক কোনো কারণে ঘুমিয়ে কিংবা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আপনার পরিচিত কয়েকজন লোক তাকে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে এল আপনার কাছে। তারপর আপনি তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে বা চিকিৎসা করিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

সে জেগে উঠেই চারদিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে এক নজর দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল—আমি কোথায়? কিভাবে এলাম এখানে?

কেন সে নিজেকে নিয়ে এভাবে প্রশ্ন করল?

কারণ তার মনে আছে সে বেহুশ হবার বা ঘুমিয়ে পড়ার সময়ে কোথায় ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ভুলে গেছে আপনার বাড়ি আসা পর্যন্ত সময়ে সে কোন পথ কিভাবে অতিক্রম করেছিল।

ফলে সে যখনই আত্মচেতনায় ফিলে এল, তখনই সে অনুভব করল যে তার স্মৃতির সর্বশেষ বিন্দুটিতে সঞ্চিত রয়েছে সেই স্থানের চিত্র যেখানে সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ফলে তার স্মৃতির চিত্রের সাথে তার জেগে ওঠার মুহূর্তের পারিপার্শ্বিকতার চিত্র মিলল না। এই অমিল বা অসামঞ্জস্য তার মস্তিষ্কের আত্মচেতনাকে ধারণকারী স্নায়ুতন্ত্রেও একটা শূন্যতার সাড়া সৃষ্টি করল, যা মস্তিষ্কের ভাষা-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পৌঁছে কিছু শব্দকে প্রশ্নের মাত্রায় ফেলে সাজিয়ে সৃষ্টি করল দুটো বাক্য—আমি কোথায়? কিভাবে এলাম?

মানুষের কোথাও থাকা না-থাকা তার অস্তিত্বের (existence) ব্যাপার। আর সে ব্যাপারে তার জানা বা না-জানা হলো তার চেতনার ব্যাপার, যা সমৃদ্ধ হয় আত্ম-চেতনা থেকে লব্ধ তথ্যের দ্বারা। অস্তিত্বের এবং মনের সহাবস্থান এবং ভারসাম্যের শর্ত হলো : এই মুহূর্তের অস্তিত্ব বা বাস্তবতা এই মুহূর্তের চেতনায় এবং আত্মচেতনায় চিত্রিত হতে হবে। কিন্তু কোনো কারণে আত্ম-চেতনায় যদি তথ্যের ঘাটতি পড়ে যায়, তাহলে আত্ম-চেতনা চেতনার বাস্তবতার সাথে নিজেকে মিলাতে গিয়ে উদ্ভূত শূন্যতাটুকু পূরণ করবে প্রশ্ন দিয়ে। ব্যাপারটা পুরোপুরি যান্ত্রিক এবং আবশ্যিক। অস্তিত্বের সবকিছুকেই আত্মচেতনাতেও থাকতে হবে—নইলে আত্ম-চেতনা তার ধর্ম অনুযায়ী প্রশ্ন তুলবে।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে লোকটাকে আপনার কাছে আনা হলে আপনি পরীক্ষা করার জন্য কোনোভাবে কোনো এক প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে তাকে এমন ইনজেকশান দিয়ে দিলেন যাতে ক'রে তার স্মৃতি থেকে তার বিগত জীবনের সব ঘটনা কিছু সময়ের জন্য পুরোপুরি মুছে গেল। এ অবস্থায় তার কোনো স্মৃতি নেই। ফলে তার জীবনের বিগত বাস্তবতা ব'লে তার ধারণায় কিছু নেই। তখন সে জেগে উঠে আপনাকে কি প্রশ্ন করবে 'আমি কোথায়'?

না। কারণ সে আগে কোথাও ছিল কি-না তাই তো তার জানা নেই।

এ অবস্থায় সে কি আপনাকে প্রশ্ন করবে—আমি কিভাবে এখানে এলাম?

না। কারণ কোনোখান থেকে কোনোখানে যাওয়া বলে কোনো ঘটনা ঘটলে তার অর্থ কী দাঁড়ায়, তা সে জানে না।

এখন ভাবুন তো : জ্ঞানী হই বা অজ্ঞ হই, ধনী হই বা গরীব হই, আধুনিক হই বা সেকেলে হই, ভালো হই বা মন্দ হই—জীবনের কোনো এক মুহূর্তের জন্যে হলেও কি এই প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকের মনে উদিত হয়নি—আমি কোত্থেকে এলাম? কিভাবে এলাম? পৃথিবীর সাথে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে এটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কি মাঝে-মধ্যে ভেতরটা আন্দোলিত ক'রে কোনো এক সুদূরের ঝড়ো বাতাস হু-হু করে বয়ে যেতে যেতে এই বোধ এবং শূণ্যতা জাগিয়ে দেয়নি—আমি আসলে এখানকার কেউ নই; এখানে আমার বিচরণ, কিন্তু আমার উৎস এবং গন্তব্য অন্য কোথাও?

www.pathagar.com

কেন এরূপ প্রশ্ন মনে জেগেছে?

আমাদের জন্মই যদি আমাদের স্মৃতির এবং অস্তিত্বের শুরু হতো, তাহলে তো, একটু আগে যেমন দেখেছি, আমাদের মনে কোনো প্রশ্নই জাগত না। তাহলে প্রশ্ন কেন জাগল?

তাহলে কি এটাই অনুমেয় নয় যে আমরা সেই বেহুঁশ হয়ে পড়া লোকটার মতো এমন কিছুটা পথ এবং সময় পার হয়ে এসেছি যা এখন আমরা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলেছি?

লক্ষ্য করুন : পবিত্র কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, যেমন—আদম, নফ্‌স, ইন্‌সান। সাধারণভাবে মানবজাতিকে এবং প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে বুঝানো হয়েছে 'ইন্‌সান' শব্দটি দ্বারা। শুনে অবাক হবার কিছু নেই যে শব্দটির মূল হলো 'নিস্‌সান', যার অর্থ হলো 'ভুলে যাওয়া', এবং 'ইন্‌সান্' মানে হলো 'যে ভুলে গেছে'। একথা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করেও বলা হয়েছে সে মানুষ ভুলে গেছে আল্লাহর কাছে দেয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের কথা যা সে জন্মের আগে আল্লাহর কাছে দিয়ে এসেছিল এবং যা সে স্ব স্ব যুগের নবী (আঃ) এর নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ অনুযায়ী স্পষ্টভাবে মেনে নিয়েছিল :

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৫)

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রতিশ্রুতি। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতোই সত্য।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২)

আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে আগেই যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপূর্ণ হও, (তাহলে চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। যেন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই (তোমরা কিভাবে জীবন লাভ করেছ এবং কিভাবে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হবে)। আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা নিজ নিজ যৌবনে উপনীত হতে পার। তোমাদের মধ্যে (শিশু অবস্থায়) কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা ভুলে যায়। (সূরা হজ্ব, আয়াত ৫)

www.pathagar.com

২. শেষ প্রশ্ন

এবার আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একজন তুখোড় সাইকিআট্রিস্টের অভিজ্ঞতার সমান্তরাল একটা কাল্পনিক ঘটনার কথা ভাবুন : ধরে নিন যে সেই লোকটা জ্ঞান ফিরে পেয়েই চারদিকে তাকিয়ে এবং নিজেকে এবং অপরকে দেখে এবং ছেনে-ছুঁয়ে একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন ক'রে বসল—**আমি কে?**

প্রশ্নটা সরাসরি আপনার নিজের অন্তরের অন্তস্তলে বিধে যাবে।

তা আপনাকেও সংক্রমিত করবে।

আপনার মধ্যেও প্রতিধ্বনি তুলবে—**আমি কে?**

উপস্থিত সবাই তখন তার থেকে নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করবে—আমি কে?

তখন সবাই লোকটাকে দেখেই প্রশ্ন করবে—আমি কে?

কেউ আর কাউকে প্রশ্ন করবে না—প্রশ্ন করবে কেবল নিজেকে।

কেউ কাউকে আর জবাব দিতে পারবে না। কেবল প্রশ্নের ঘোরে এবং চমৎকারিত্বে মুগ্ধ এবং হতভম্ব হয়ে থাকবে।

সবাই তখন প্রথমে প্রশ্নটার মর্ম উপলব্ধি করার জন্য চাইবে নির্জনতা। কারণ এখন সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার নিজেরই প্রশ্নটা। অথচ কেউই জানছে না সে প্রশ্নটা করছে কাকে?

একটা রহস্যময় প্রশ্ন আছে—অথচ ব্যক্তির জানা নেই কে প্রশ্নটা করছে এবং কার কাছেই বা উত্তর চাচ্ছে।

অস্তিত্ব এবং আত্মচেতনার মধ্যবর্তী শূন্যস্থান তখন কেবল একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নবোধক চিহ্নের হাহাকারে ভরা।

সম্পূর্ণ একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন—আমি কে?—অথচ উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিত্বের সন্ধান মিলছে না, পাওয়া যাচ্ছে না কোনো ব্যক্তিকে, এবং কোনো ব্যক্তিবাচক বা subjective জবাব পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে প্রশ্নটাই রয়ে যাচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক বা objective, বা শাশ্বত। যে প্রশ্ন কোনো বিশেষ ব্যক্তির নয়, সমানভাবে সবারই, তা ব্যক্তিস্পৃষ্ট বা subjective নয়, তা পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক। কারণ তার যদি কোনো জবাব পাওয়া যায়, তাহলে তা সবার ক্ষেত্রেই সঠিক জবাব। এ কারণে এক্ষেত্রে যে-জবাব পাওয়া যাবে, তা শাশ্বত, সার্বজনীন। কোরআন এই প্রশ্ন **সৃষ্টি করে** এবং তার **জবাব দেয়**। ফলে কোরআন শাশ্বত এবং সবার জন্যই। যারা একথা অস্বীকার করে, তারা তো কেবল নিজেদেরই অস্বীকার করে মাত্র, কারণ তারা নিজেদের অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, ফলে তাদের দুর্দশার জন্য তারাই দায়ী :

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে **কে সে তোমাদের বাধা দেয়?**

(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।

(সূরা আনফাল, আয়াত : ৫১)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

(সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

তারা **আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।**

(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী; যারা সৎকাজ করে তারা **নিজেদের জন্যই রচনা করে** সুখসয্যা। **কারণ** যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (সূরা রুম, আয়াত : ৪৪-৪৫)

তারা অন্যদেরকে এ (কোরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং নিজেদেরকেও; কিন্তু তারা তো শুধু **নিজেদের আত্মাকেই ধ্বংস করে,** কিন্তু তারা তা বোঝে না।

(সূরা আন'আম, আয়াত : ২৬)

হে মানবজাতি, **তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে** যায়।

(সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

এবার ভাবুন তো কেন এই প্রশ্ন মনে জাগল? এর কারণ না জানলে এর উত্তর জীবনের কোনো কাজে লাগবে না। কারণ তখন আমরা আমাদেরই অজ্ঞতার কারণে উত্তরটাকে চিনতে পারব না। **প্রশ্নের বা তার জবাবের চেয়ে প্রশ্নের উৎপত্তি কেন হলো, কেনই বা মানব মনে প্রশ্নের উদয় হয়, তা জানাই বেশি জরুরি।** কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান বা সহস্র বছরের পুরনো দর্শনশাস্ত্রও প্রশ্নের কারণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেনি—তারা কেবল প্রশ্নকে 'অনুভব' করছে এবং এই অচিহ্নিত (unidentified) অনুভূতি দ্বারাই তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। অথচ, আমরা জানি, আল্লাহর অলিগণ সর্বান্তকরণে **'প্রশ্ন কেন জাগল?'** এরই জবাব সন্ধান করেন। এই রহস্য না জানলে জীব হওয়া সত্ত্বেও জীবনকে পাওয়া যায় না। এই রহস্য না জানলে কোনো সার্থক মাইন্ড কন্ট্রোল সম্ভব নয়।

৩. প্রশ্নের প্রশ্ন

মন কেন প্রশ্ন সৃষ্টি করে?

কারণ, আমরা আগেই দেখেছি, সে তার অস্তিত্ব এবং সচেতনতার বা আত্মচেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চায়।

www.pathagar.com

অন্য কথায়, **প্রশ্ন হলো সমগ্রের প্রতি অংশের নিবিড় ইঙ্গিত।**

প্রশ্ন হলো শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে ছুটে চলার একান্ত তাগিদ।

প্রশ্ন হলো অস্পষ্টতার দ্বারা স্পষ্টতাকে আলিঙ্গনের আকুতি।

পশ্ন হলো গতির অভিমুখিতা।

গতি।

ঝোঁক।

প্রবণতা।

পূর্ণতার আকর্ষণ।

আলোর অমোঘ টান।

অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে বিন্দু বিন্দু ধবধবে আলোর প্রয়োজনীয়তা।

প্রশ্ন হলো ফিরে-পাবার বাসনা।

ঘরে ফেরার আকুলতা।

একজন আত্মদর্শী এবং প্রত্যক্ষভাবে অসীমদর্শী ব্যক্তিত্বকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : জগৎমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছিল কেন?

তিনি রহস্যময় প্রশান্তির হাসি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—**তোমার এই প্রশ্নটাকে সৃষ্টি করার জন্য!**

পরম সত্য কথা!

মনে প্রশ্ন না জাগলে মনের তথা সৃষ্টির কোনো সার্থকতা থাকত না। সৃষ্টি ক'রে স্রষ্টা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, এই উদ্দেশ্যে যে তাঁর সৃষ্টি তাকে খুঁজুক, খুঁজে পাক, এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং মহিমাকে প্রকাশ করুক। একটি হাদিসে এই রহস্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই রাসুল্লাহ (সঃ) কে বলেছেন :

আমি ছিলাম লুকায়িত সম্পদরাজির মতো।
আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলাম।
তাই সৃষ্টির কাজে হাত দিলাম।

কি চমৎকার! সকল দর্শন এবং দার্শনিকেরই উচিত এই বাণীতে ফিরে আসা।

কিভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন? **সৃষ্টির মনে তাঁকে পাবার বাসনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে।** আর এই বাসনার প্রাথমিক বিন্দু হলো প্রশ্ন। এরূপ প্রশ্নকে পবিত্র কোরআনেও করবার উস্কে দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে :

তবে কি ওরা **এই বাণীর (কোরআনের) ব্যাপারে চিন্তা করে না?** না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? (সূরা মোমেনুন, আয়াত : ৬৮)

www.pathagar.com

বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২০)

ওরা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি ওরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? নাকি ওরা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? (সূরা তূর, আয়াত : ৩৫-৩৬)

তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তা থেকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই। ... তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা অংকুরিত কর, না আমি তা করি? (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৬৪)

বল-আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল-আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (দুইটার যে-কোনো একটাই সত্য হতে পারে, উভয়টা নয়।—বিস্ময়কর আয়াত!) (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

রবীঠাকুর এই প্রশ্নের মাহাত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, যা তিনি সহজ ভাষায় তুলে ধরেছিলেন এই কবিতাটিতে :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চ'লে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে তিনি উত্তর পাননি। এমনও হতে পারে যে তিনি 'মেলেনি উত্তর' দ্বারা প্রশ্নের শ্বাশ্বত চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আল্লাহর অলিগণ পেয়েছেন উত্তর—এবং ফলে তারা যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছেন প্রশ্নের মাহাত্বকে। আর তখনই সব প্রশ্ন তাদের মন থেকে শুকনো পাতার মতো ঝ'রে প'ড়ে গেছে। রেখে গেছে আনন্দবোধ, বিস্ময়বোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, পূর্ণতাবোধ—এবং অসীমের সাথে অনুগত একাত্মতা।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা গেল যে মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। বরং মনে প্রশ্ন না জাগাই অস্বাভাবিক। আমরা প্রশ্নের ভারে জর্জরিত হই, নিজেকে খুঁজি—আর নিজেকে পাবার পরই আল্লাহকে পাওয়া শুরু হয়।

... আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও জমিনের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখাই, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর যখন তার ওপর রাত আচ্ছন্ন হলো, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, **যা অস্তমিত হয় আমি তা পছন্দ করি না**। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। যখন সেটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। এটাই সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর সমকক্ষ কর, তা থেকে আমি মুক্ত। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মুখ স্থাপন করলাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন'আম, আয়াত : ৭৫-৭৯)

লক্ষ্য করুন, স্বয়ং একজন নবীকেই বস্তুজগৎ নিয়ে প্রশ্ন করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছিল, যেভাবে অগ্রসর হতে হয় একজন বিজ্ঞানীকে। অথচ অনেক বিজ্ঞানীই বিভ্রান্ত হয়। তাদের ধারণা যে আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই তারা জ্ঞানী হয়েছে।

মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে—আমি তো এ পেয়েছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। আসলে এ এক পরীক্ষা, কিন্তু দের অধিকাংশই বোঝে না। ওদের পূর্ববর্তীরাও একথা বলত—কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি।

(সূরা যুমার, আয়াত : ৪৯-৫০)

স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন :

যে নিজেকে জেনেছে, সে আল্লাহকে জেনেছে।

সুতরাং প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং তার জবাবের জন্য আল্লাহ-মুখী হওয়াই তো ইবাদত। আর মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং সার্থকতাই আল্লাহর ইবাদত করা।

অর্থাৎ প্রশ্নই আসে আল্লাহর কাছ থেকে। অথচ এই প্রশ্নের বাণ দ্বারা আহত হতে না চেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত দাম্ভিক নাস্তিকরা সেই প্রশ্নবাণকে আল্লাহর প্রতিই ছুড়ে মারে। তারা আল্লাহকে প্রশ্নের দূরত্বেই রেখে দেয়। একবার ভেবেও দ্যাখে না যে তিনি প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। ফলত যে-প্রশ্ন দ্বারা সে উপকৃত হতে পারত তার দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.pathagar.com

৪. শৈশবের প্রশ্ন এবং যৌবনের উত্তর

গতকালই কোনো এক জায়গায় এক লেখক কোনো এক ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলেন জনৈক আরজ আলী মাতব্বরের সম্বন্ধে। তিনি উক্ত মাতব্বর নাম্নী লেখকের ভূয়সী প্রশংসার সাথে সাথে তার বইয়ের বাঁধাই এবং প্রকাশ নিয়ে বিস্ময়োক্তি করছিলেন। তাদের আলাপের মধ্যে একটু ঢুকে পড়তে হলো কেবল একটা প্রশ্ন করার জন্য : আচ্ছা, আরজ আলী মাতব্বরের বইয়ের যে কাটতি এবং গেট-আপ, তা সত্যিই ঈর্ষণীয়; কিন্তু আমাকে একটু বলবেন কি বইগুলো কারা পড়ে?

আমার কথা শুনে সেই লেখক মশাই বললেন, 'কেন? প্রগতিশীল মনের পাঠকেরা।'

তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন প্রশ্নটা ক'রে আমি মস্ত বড় বোকামির পরিচয় দিয়ে ফেলেছি। তবুও আমি লাজ-শরমের মাথা খেয়ে নিজের স্বভাবের সাথে বিরোধিতা ক'রেই তার মুখের ওপর ব'লে উঠলাম—কিন্তু কী আছে তার বইতে? উনি তো একজন ভালগার ম্যাটেরিয়ালিস্ট—জ্ঞানের গভীর বিষয়গুলো নিয়ে তিনি কতকগুলো বুনো এবং বেয়াদবসুলভ অগভীর প্রশ্ন করেছেন মাত্র। তার মতো বোকামিপূর্ণ প্রশ্ন করত সেই আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক সফিস্টরা, কিন্তু নি:সন্দেহে তাদের যোগ্যতার সাথে মাতব্বর সাহেবকে তুলনা করাও বোকামি। তিনি ছিলেন এক অশিক্ষিত গেঁয়ে ভূত—তা তার কথা থেকেও টের পাওয়া যায়। তিনি রসিয়ে রসিয়ে দর্শন শিক্ষা এবং তা আলোচনার কথা বলে কৃত্রিমতাপূর্ণ বিনয়ের আড়ালে সে-কি দম্ভ করেছেন; কিন্তু ভাবতেও হাসি পায় যে, যে-মার্কসবাদীরা দর্শনকে তাদের মতবাদের উৎস ব'লে দাবি করে, তারা এই আধুনিক যুগেও মাতব্বরের মতো গণ্ডমূর্খ একটা লোকের অল্প-বিদ্যা ভয়ংকরী গোছের বিদ্যা-বুদ্ধিতে দর্শন খুঁজে পেল কিভাবে। আমার ভাবধারার সাথে তার ভাবধারা মিলুক বা না মিলুক, একথা আমি অবশ্যই বলব যে কাল মার্কস একজন বড় মাপের চিন্তাবিদ ছিলেন, কিছুটা পরিমাণে দার্শনিকও; তার অনুসারীদের মধ্যে আরো বড় মাপের দার্শনিক ছিলেন এবং আছেন। তাদের ধ্যান-ধারণাকে ধারণ ক'রে শিক্ষিত নাস্তিকদের পক্ষে মাতব্বরকে দার্শনিক বলা কিভাবে শোভা পায় তা আমি বুঝি না। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলাই যদি প্রগতিশীলতা এবং ফ্যাশান হয়, তো ভালো কথা; তা দিয়েই ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু মাতব্বর নিজে কি দর্শন কাকে বলে বুঝতেন? পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল তারাই দার্শনিক হয়েছেন যাদের ছিল মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মেধা। এঁদের পাশাপাশি মাতব্বরকে দার্শনিক বললে কী সেই সব প্রতিভা এবং দর্শনশাস্ত্রকেই অপমান করা হয় না? পৃথিবীর সব দার্শনিকই তার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন। গণিতের ভেতরকার abstract রহস্যকে ভালোভাবে জেনেই দর্শন শেখা শুরু করতে হয়। আরজ আলী মাতব্বর কতটুকু গণিত জানতেন?

আমার প্রশ্ন শুনে লেখক মশাই কিছুটা ভড়কে গেলেন। তিনি কিছুটা থেমে আসল কথাটা বললেন : আসলে আরজ আলীর বই আমরা কেউই পড়ি না, ঘরে রাখি মাত্র।

www.pathagar.com

আমরা শুধু জানতে চাই তার আগ্রহ এবং প্রশ্নমুখী চিন্তা সম্বন্ধে। একজন গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ কিভাবে নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্ন করত, এটাই আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি জানেন আরজ আলী মাতব্বর তার বইতে কী জাতীয় প্রশ্ন করেছেন? তিনি অত্যন্ত অল্প জ্ঞানের ওপর ভিত্তি ক'রে তুচ্ছ থেকে মানব জীবনের চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো পর্যন্ত বারবার উচ্চারণ করেছেন। তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোরআনের সত্যতা নিয়ে কিছু তুচ্ছ এবং হাস্যকর প্রশ্ন করেছেন। **তিনি নিজের প্রশ্নের মাধ্যমেই তার হালকামিকে তুলে ধরেছেন।** তিনি যে একটু বাহবা পাবার আশায় কত সচেষ্ট ছিলেন তা তার বই পড়লেই বুঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা গল্প বলি। আমার এক আত্মীয়র একটা ছেলে আছে—নাম শুভ। বয়স-৭/৮। সে তার মাকে একদিন বলল—আচ্ছা মা, আমি তোমাকে বিয়ে করব। তার কথা শুনে তার মা সহ উপস্থিত সবাই তো হেসে খান-খান। তখন বিব্রত হয়ে সে জানতে চাইল—কেন মা, মাকে কি বিয়ে করা যায় না?

শুভ এমন একটা প্রশ্ন করেছে যা শিশুর মনে জাগতেই পারে, এবং জাগেও। এর সাথে যৌনতার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কেউ কি শুভকে 'না' ছাড়া অন্য কোনোভাবে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? প্রশ্নটা কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ? না। কারণ এই শুভই যখন বড় হবে, তখন তার মনে আর এই প্রশ্নটাই জাগবে না। **যে প্রশ্ন অজ্ঞতা থেকে আসে, জ্ঞানের আলোর উপস্থিতিতে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।** আমাদের আলোচ্য মাতব্বর সাহেবের সবগুলো প্রশ্নই মনের অপরিপক্কতার ফল। তিনি শুধু মূর্খের মতো প্রশ্নই করেছেন, কারণ তাতে তার অহমিকা তৃপ্তি পেয়েছে, কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর খোঁজেননি, কারণ সে যোগ্যতাও তার ছিল না এবং **জবাবের চেয়ে প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করার ওপরই তার ব্যবসায়ের সফলতা বেশি নির্ভর করতো।**

কয়েকদিন আগে আমার ৭ বছর বয়েসী মেয়ে বিভা তার অন্তঃস্বত্তা মাকে জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা মা, আমার ভাইয়াটাতো আর কয়েক মাস পরে পৃথিবীতে আসবে। সে কিভাবে পেট থেকে বের হবে?

অবস্থা বেগতিক দেখে আমিই তাকে চট ক'রে বলে দিলাম—অপারেশনের মাধ্যমে। ডাক্তারই বের করবে।

সে তৎক্ষাণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল—কিন্তু ইভানকে তো (তার ছোট ভাই) ডাক্তার আম্মুর পেট কেটে বের করেনি। আম্মুর পেটে তো কোনো দাগ নেই। অথচ আমার অ্যাপেনডিসাইটিসের অপারেশনের দাগটা এখনও আছে।

আমি এবার তাকে বললাম—তুমি আরেকটু বড় হও, তখন বুঝবে। উত্তরটা এত কঠিন যে এখন তা বোঝার যোগ্যতা তোমার হয়নি।

www.pathagar.com

বিভা বড় হলে প্রশ্নটাই আর করবে না। কারণ জবাবটা সেই নিজেই খুঁজে নেবে এবং পাবে।

আরজ আলী মাতব্বর কিছু শিশুসুলভ প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তিনি তার জবাব খোঁজার জন্য বড় হননি, অপেক্ষা করেননি। প্রশ্নের উত্তেজনায় তিনি কাতর ছিলেন। কিন্তু জবাব খোঁজার মতো কসরত করতে তিনি ছিলেন নারাজ। শুধু প্রশ্ন ক'রেই যদি বিখ্যাত হওয়া যায়, তাহলে আর কী চাই? তাহলে আর কষ্ট-সাধনার কী দরকার?

৫. প্রশ্নের গর্ভে ইবলিসের সন্তান

সুতরাং, প্রিয় পাঠক, প্রশ্ন করা খারাপ কিছু নয়; সব খারাপ নিহিত প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের মধ্যে। আল্লাহ আছেন কি না, তিনি কী খান, সন্তান জন্ম দেন কি না— এসব প্রশ্নেও কোনো অপরাধ নেই। কারণ মানব মনের চরিত্র এমনই যে সে এরূপ প্রশ্ন নিজস্ব তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হয়েই ক'রে ফ্যালে। স্বয়ং আল্লাহই পবিত্র কোরআনে এরূপ প্রশ্ন তুলে তার জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য যদি মাতব্বর সাহেবের মতো হয়, তার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানার্জন না হয়, তাহলে তা প্রশ্নকারীর জন্য আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ প্রশ্নের জন্য অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে, যা কোরআনে বলা হয়েছে :

> তোমার পূর্বে কিছু লোক এরূপ প্রশ্ন করেছিল, এবং এ কারণে তারা তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১০২)

রসুল (সঃ) নিজেই প্রশ্নের গুরুত্ব সম্বন্ধে উৎসাহমূলক হাদিস রেখে গেছেন :

> জ্ঞান হলো একটি রত্নভাণ্ডার এবং তার চাবি হলো অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন। —হাদীস

কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে মনে আল্লাহ এবং সৃষ্টির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায় ইবলিস। আসলে আল্লাহ মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সম্মান দিয়েছেন ব'লে তাকে যাচ্ছেতাই প্রশ্ন করার যোগ্যতাও দিয়েছেন।

> বল, 'সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে'; **যে বিশ্বাস করতে চায়, করুক,** এবং **যে তা অস্বীকার করতে চায়, করুক**। (অর্থাৎ মানুষকে বিশ্বাস বা সন্দেহ করার— তথা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ কারণে কাউকে জোরপূর্বক ধর্ম পালনে বাধ্য করা যাবে না। মানুষের আত্মচেতনার স্বাধীনতাই তার আমিত্ব। এ স্বাধীনতা আল্লাহই দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে এ থেকেই তার প্রশ্নের উৎপত্তি। ফলে সে যে-স্বাধীনতা ভোগ করছে, তাই-ই তাকে ধ্বংস করে।) (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯)

> যার হৃদয়কে আমি আমাকে **অবহেলা করার অনুমতি দিয়েছি**, সে অধীনতা স্বীকার করবে না। (প্রশ্ন করার স্বাধীনতা মানুষের ঐশ্বরিক প্রাপ্তি। কিন্তু কেউ যদি অহংকারীর

www.pathagar.com

মতো শুধু প্রশ্নই করতে থাকে এবং তার জবাবের আশা না ক'রে জমজমাট প্রশ্নের ব্যবসা খুলে ব'সে বাহবা কামাতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে তাঁকে অস্বীকার করার অনুমতি দেন—অর্থাৎ তার তৃপ্তিকে শুধু প্রশ্নের মধ্যেই ঢুকিয়ে দেন। ফলে সে কখনও প্রশ্ন থেকে বের হতে পারে না। অথচ সে অহংকারীর মতো মনে করে বসে যে তার মনে প্রচুর প্রশ্নের উদয় হচ্ছে—তাহলে নিশ্চয়ই সে জ্ঞানী এবং প্রগতিশীল। কিন্তু আসলে সে ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে।) (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮)

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের কাছে **শয়তান ছেড়ে রেখেছি**–ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেবার জন্য। সুতরাং ওদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি ক'র না, আমি তো **গণনা করছি**–ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। (ইবলিসকে/শয়তানকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে মূলত মানুষকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য—এটাই আল্লাহর কর্মপদ্ধতি। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানকে প্রশ্রয় না দেয়, তাহলে সে তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। একথা কোরআনেই বলা হয়েছে।) (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৮৩-৮৪)

তাহলে কি যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, **আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সৎপথে চালিত করতে পারতেন?** এবং অবিশ্বাসীরা যা করেছে, তাদের কর্মফলের জন্য তাদের প্রতি নিশ্চয়ই বিপদ উপনীত হবে, অথবা বিপদ তাদের আশেপাশে পতিত হবে। ... নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (কি চমৎকার ইঙ্গিত! আল্লাহ নিজেই বলছেন যে তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছা দ্বারা জোর ক'রে মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করেন না—তিনি মানুষকে স্বাধীনতার সম্মান দিয়েছেন। অথচ তার পরও মানুষ বোঝে না।) (সূরা রাদ, আয়াত : ৩১)

শেষোক্ত আয়াতটা রহস্যময়। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা দ্বারা মানুষের মুক্ত-ইচ্ছাকে প্রভাবিত করেন না। মানুষকে স্বাধীনতার সম্মান দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে–অর্থাৎ যারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে বেহেস্ত লাভ করে। যারা তাদের আমিত্ব নিয়ে দূরে থাকে, তাদের দূরত্বই তাদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়। পরবর্তী আয়াতের আলোকে এই আয়াতটিকে বিবেচনা করলে এর প্রকৃত রহস্য বুঝা যাবে।

... **কেউ যেন না বলে**, আল্লাহ আমাকে পথ দেখালে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৭)

কিন্তু স্বয়ং তিনি মানব মনে কেবল ভালো প্রশ্নগুলো জাগিয়ে দেন এবং খারাপ প্রশ্নের সুযোগ ক'রে দেন ইবলিসের কুমন্ত্রণার মাধ্যমে :

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের কাছে **শয়তান ছেড়ে রেখেছি**–ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেবার জন্য? সুতরাং ওদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি ক'র না, আমি তো **গণনা করছি**–ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৮৩-৮৪)

আমি কি তোমাকে জানাব কার প্রতি **শয়তান অবতীর্ণ হয়?** ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটা ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারাই যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা **লক্ষ্যহীনভাবে** সর্ব বিষয়ে **কল্পনা-বিহার ক'রে থাকে?** এবং ওরা **যা বলে তা করে না**। তবে তাদের কথা আলাদা যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ... (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ২২১-২২৭)

... **শয়তান যা নিক্ষেপ করে**, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, যারা পাষাণ হৃদয়। সীমালঙ্ঘনকারীরা অশেষ মতভেদে আছে।
(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৩)

তিনি ইবলিসকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে মানুষের পেছনে ছেড়ে দিয়েছেন। এর জন্য দোষ তাঁর নয়! **এ হলো মানুষকে পুরোপুরি স্বাধীন করার পেছনে তাঁর ঐশী মেকানিজম বা কর্মপদ্ধতি**। তিনি দেখতে চান কে যথেচ্ছাচারীর মতো তার স্বাধীনতা ভোগ করে আর কে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজের ইচ্ছাকে ছেড়ে দেয়। যে দ্বিতীয় পথ বেছে নেয়, সেই কৃতকার্য হবে, কারণ সেই-ই মুসলিম : 'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ এবং 'মুসলিম' মানে হলো আত্মসমর্পণকারী।

সরলপথের নির্দেশ আল্লাহর দায়িত্ব, এবং তার মধ্যে বক্র কুপথও আছে। (পথ যদি শুধু একটা হতো, তাহলে তা হতো মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার নামান্তর—কারণ তখন মানুষকে বাধ্য হয়েই এক পথে চলতে হতো, তার সামনে কোনো বিকল্প choice থাকত না। মানুষকে বিকল্প সরবরাহ না ক'রে তাকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করা মানে তো প্রহসনমাত্র। তাই আল্লাহ তাঁর সরল পথের সাথে বক্র পথকেও সংযুক্ত রেখে তাঁর পথকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।) (সূরা নহল, আয়াত : ৯)

অতঃপর ওরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ ওদের হৃদয় বাঁকা ক'রে দিলেন। (তিনি বাঁকা পথ দিয়েছেন বটে, তবে সে পথে যে চলে তার হৃদয়ও বেঁকে যায়, এবং ফলে সেই বাঁকা পথকেই তার ভালো লাগে। এ কোনো অবিচার নয়, এটাই বিজ্ঞানসম্মত সত্য—যাকে বলে অনুবর্তন বা conditioning : কোনো ব্যক্তির কাজ বা অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস তার মনের ওপর ছায়াপাত করে এবং তার ইচ্ছাকে পুনঃপুন সেই কাজেই রত করাতে চায়। পদার্থবিদ্যায় এই সত্যটা নিউটনের গতির প্রথম সূত্র নামে সূত্রবদ্ধ আছে, যা সর্বপ্রথম প্রমাণসহকারে উপস্থাপন করেছিলেন কালজয়ী বিজ্ঞানী নিউটন।)
(সূরা সাফ, আয়াত : ৫)

সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত ক'র না, কিংবা সত্যকে জেনে তাকে গোপন ক'র না।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৪২)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর উপাসনা করে দ্বিধায় সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (এরূপ লোকের আত্মসমর্পণ পূর্ণাঙ্গ হয়নি। নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে সমর্পণ না করতে পারলে মুসলমান হওয়া যায় না। অর্ধেক মুসলমান ব'লে কিছু নেই। রসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে যার অন্তরে একটা সরষে দানার মতো ইমানও আছে, সেও বেহেস্তে

www.pathagar.com

প্রবেশ করবে—তবে শাস্তিভোগের পর। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শুধু বেহেস্তে যাবার সুযোগ পেলেও মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলিম মানে হলো পূর্ণাঙ্গ মানুষ—সেই মানুষ যিনি তার পরিচয় জেনেছেন।) (সূরা হজ্ব, আয়াত : ১১)

তবে আল্লাহ আছেন কি? কে তাকে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন এমন মৌলবী বা আলেমকেও করা উচিত নয় যিনি এর জবাব দিতে পারবেন না। যিনি আপনাকে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারবেন, কেবল তাকেই এরূপ প্রশ্ন করুন এবং বিভ্রান্ত হওয়ার হাত থেকে এবং নিরীহ ধার্মিকদেরকে বিব্রত করার মতো ধৃষ্টতা থেকে দূরে থাকুন। কিছু লোক—এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো বিখ্যাত গণিতবিদ দার্শনিকও—বলেছেন যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণও করা যায় না অপ্রমাণও করা যায় না। তাদের যুক্তির ভ্রান্তি তারা ধরতে পারেননি। তাদের স্বভাবই তাদের যুক্তিকে কলুষিত করেছে। স্রষ্টার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণযোগ্য—যুক্তির মাধ্যমে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে, গণিতের মাধ্যমে, এবং পরোক্ষভাবে। এমন প্রমাণ যার সত্যতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কেবল স্বভাব দ্বারা তাড়িত হয়ে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া। স্বয়ং ইবলিস বা প্রখ্যাত কাফেরদের মধ্যেও অনেকে আল্লাহর সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে—তবে তারা তাঁকে মানতে চায়নি। যুক্তিকে মেলাতে না পারা পর্যন্ত মনের অস্থিরতা, অনাস্থা, অসহায়ত্ব থেকেই যাবে। এখানেই ইসলামিক সেল্‌ফ কন্ট্রোলের আবশ্যকতা। তা মানুষের চেতনা, আত্ম-চেতনা এবং বাস্তবতাকে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহাবস্থানপূর্ণ ক'রে দেয়।

কেন, নামাজে দাঁড়িয়ে কি চিন্তাকে কন্ট্রোল করতে পারেন? হাজার রাজ্যের চিন্তা কি মগজকে মুহুর্মুহু আক্রমণ করে না? নফ্‌স বা রিপু কি গাদা-গাদা প্রশ্ন নিয়ে এসে মনের মধ্যে ভিড় জমায় না? অথচ মনে রাখবেন যে অনেক নামাজী আছেন যাদের নামাজ থেকে সমস্ত ময়লা আল্লাহ সাফ ক'রে দিয়েছেন। তারা তাদের নামাজে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের নামাজই মে'রাজ।

সত্তর বছর ইবাদত করার পরও অনেক মুসল্লি গভীর অন্ধকারে মনের গোপন ঘরে প্রশ্ন করেন : আল্লাহ কি আছেন? সত্যিই আছেন?—অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

না। এরূপ প্রশ্নই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্তর বছর পরেও যার এরূপ প্রশ্ন মনে এসে বেধে, সে হতভাগার জন্য দোয়া করা উচিত।

কেউ বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং প্রত্যাখানের জন্য হৃদয় মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হবে এবং তার জন্য মহা শাস্তি আছে ... । (সূরা নহর, আয়াত : ১০৬)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর উপাসনা করে দ্বিধায় সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ১১)

www.pathagar.com

তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করে না, এবং কেবল অনুমান ক'রে থাকে। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১১৬)

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ পোষণ করে না ... (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৫)

প্রিয় পাঠক। প্রশ্নকে অতিক্রম করা চাই। আর তার জন্য চাই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জেনে নেয়া। এবং তা করা চাই ইবাদত করতে করতেই। নইলে আপনি বড়জোর একজন দার্শনিক হতে পারবেন, বিশ্বাসী বা আল্লাহর পাগল নয়। মনে রাখবেন, যে-সব দার্শনিক মনকে কেবল এক-গাদা প্রশ্নের তালিকায় পরিণত করেছেন, তারা ভারবাহী গাধার সমতুল্য, যা কোরআনেও বলা হয়েছে।

আবার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণের তাগিদ স্বয়ং রসুলল্লাহ (সঃ)-ই দিয়েছেন :

কেউ জনগণকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়ে বুঝাতে না পারলে সে একজন প্রকৃত ফিকাহশাস্ত্রবিদ (ধর্মশাস্ত্রবিদ) হতে পারে না। —হাদীস

সন্দেহ একটা চমৎকার রহস্যময় জিনিস। তার অস্তিত্বই আল্লাহর সত্যতাকে সুপ্রমাণিত করে। লক্ষ্য করুন, স্বয়ং আল্লাহই কোরআনের মাধ্যমে রসুল (সঃ)-কে ওহীর ব্যাপারে সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন :

সত্য এসেছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং তুমি (হে মুহাম্মদ (সঃ)) সন্দেহকারীদের অন্তর্গত হয়ো না। (সূরা আলইমরান, আয়াত : ৬০)

তাহলে তুমি কি (হে মুহাম্মদ (সঃ)) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ বাদ দেবে এবং তোমার বক্ষ সংকুচিত করবে? যেহেতু তারা বলে—কেন তার প্রতি ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি, অথবা তার সাথে ফেরেস্তা আসেনি? (সূরা হুদ, আয়াত : ১২)

নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কেতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার (মূসা (আঃ)এর) কেতাব প্রাপ্তির বিষয়কে সন্দেহ ক'র না। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২৩)

আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তো ওদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হবার কাছাকাছি গিয়েছিলে। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত ৭৪)

ওহী এসেই ওহীকে সন্দেহ না করতে বলছে! স্বয়ং নবীকেই নবুয়তির ব্যাপারে সন্দেহ না করতে বলা হচ্ছে! কারণ কী?

কারণ মানব-মনে প্রতিনিয়ত বিস্মৃতির পর্দা পড়তে থাকে এবং তার চেতনা এবং আত্ম-চেতনার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকে। সে ভুলে যেতে থাকে তার আসল পরিচয়। এই বিস্মৃতিজাত দ্বিধা বা শূন্যতাই সন্দেহ পদবাচ্য।

www.pathagar.com

তাদের হৃদয়ে সন্দেহ আছে, তাই তারা সন্দেহের দোলায় দোলায়িত।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৪৫)

আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই **স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও** আল্লাহর প্রতি সিজদায় নত হয়, এবং সকালে ও বিকালে তাদের ছায়ারাও।
(সূরা বা'দ, আয়াত : ১৫)

এই আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সৃষ্ট জীবের অনিচ্ছাও আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ।

যাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই তাদের প্রার্থনা হলো মনের নিরর্থক অস্থিরতা।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ১৪)

আমি কি তোমাকে জানাব কার প্রতি **শয়তান অবতীর্ণ হয়?** ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটা ঘোর বিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারাই যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার ক'রে থাকে। এবং ওরা যা বলে তা করে না। তবে তাদের কথা আলাদা যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ... (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ২২১-২২৭)

এ কারণে চাকরিতে ছুটি থাকলেও ইবাদতে ছুটি ব'লে কিছু নেই। মানুষকে আত্মসমর্পণ ক'রে যেতে হয় ধারাবাহিকভাবেই। তাতে কোনো ছেদ বা ক্লান্তির অবকাশ নেই। **স্বয়ং নবীজী (সঃ)-এর মনেই যদি সন্দেহ জাগতে পারে, তাহলে তা দিয়ে কী প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে কোরআন সত্য এবং সন্দেহ হলো মানব মনের একটা আবশ্যিক উপাদান, যাকে অতিক্রম করাই জীবনের এবং সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য।** শয়তানের প্রভাবে আমাদের আত্মচেতনা বারবার আমাদেরই আমিত্বের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বিস্তৃত হবার সুযোগ পায় না। এর থেকে রেহাই পাবার উপায় হলো মনের **অনিচ্ছাসত্ত্বেও** তাকে আল্লাহর ইবাদতে রত করা, যা আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াতটা থেকেই দেখতে পাচ্ছি। মনে ইবাদতের অনিচ্ছা জাগাই স্বাভাবিক, কিন্তু তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে হবে, তার দাসত্ব করা যাবে না; মনের খামখেয়ালির অনুসরণ করা যাবে না। মন যদি আল্লাহর আদেশ পালন না করতে চায়, তাহলেও এমন ভাবার দরকার নেই যে আপনি বেইমান হয়ে গেছেন—মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই তো প্রকৃত ইবাদত। সে যত বেয়াড়াপনা করবে, তত আপনার মঙ্গল—কারণ তখন আপনি তাকে শাসন করারও বেশি বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু তার স্বেচ্ছাচারিতাকে অবশ্যই মেনে নেয়া যাবে না :

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

www.pathagar.com

তিন

মনের খুঁটি

যাদের মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারেই প্রশ্ন জাগে, তাদের উচিত বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য সম্ভাব্য এবং আবশ্যকীয় সবকিছু করা। প্রাথমিকভাবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, তা হলো : আমি না জানলেও এমন ব্যক্তি ছিলেন এবং আছেন যারা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিই জানেন যে আল্লাহ আছেন, তাঁর রসুল (সঃ) সত্য, কোরআন সত্য, আখেরাত সত্য, পুনরুত্থান সত্য, কবরের আযাব সত্য, বেহেস্ত-দোযখ সত্য। তারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং দ্বিধাহীন সাক্ষ্যপ্রদানকারী। কালেমায়ে শাহাদাত জানেন নিশ্চয়ই : আশ-শাহদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু অশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু অ-রসুলহু।—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সঃ) তাঁর গোলাম এবং সংবাদবাহক।

সাক্ষ্য কে দেয়? যে প্রত্যক্ষদর্শী সে-ই সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষীর মর্যাদা দেয়া হয় না। হয় কি?

নামাজীদেরও খেয়াল করা উচিত এই কালেমার মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে। আমাদের সবাইকে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই তাহলে আমাদের মধ্যেই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, আছেন, এবং চিরকাল থাকবেন। অবশ্যই তাই। তবে যারা সাধারণ মানুষ, তাদের প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা থাকারও কোনো দরকার নেই। কারণ আমরা এমন এক নবীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি যিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরই সম্মানে আমাদের সাক্ষ্য সম্মানিত হবে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি যুগেই আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী অলি থাকেন। তাঁদেরকেও খুঁজে বের করা চাই। পরকালে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে আমরা আমাদের যুগের ইমাম বা নেতাকে খুঁজে নিয়েছিলাম কি না। একথার মানে এই নয় যে আপনাকে কোনো পীরের কাছে ধর্ণা দিতে হবে। তবে একথাও সত্য যে আপনি যদি স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যান কোনো পীর বা বুযুর্গ ব্যক্তি একজন খাঁটি মুমিন এবং আল্লাহ তাকে করুণা ক'রে আপন রহস্য জানিয়েছেন, তাহলে তার আনুগত্য করতেই হবে, তার হাতকে সবল করতেই হবে, তাকে নেতৃত্ব দানের সুযোগ দিতেই হবে।

www.pathagar.com

প্রতিটি যুগের প্রতিটি নবী রসুলের (আঃ) জন্য নির্দিষ্ট কালেমা ছিল এবং প্রতিটি কালেমাতে দুটো শাহাদাহ বা সাক্ষ্য ছিল—আল্লাহর সত্যতার ও একতত্বের ব্যাপারে, এবং সংশ্লিষ্ট নবীর (সঃ) নবুয়তির সত্যতার ব্যাপারে।

সুতরাং মনে দুর্বলতা থাকলে মনকে বলুন : মন, তোমার চেয়ে উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চ ক্ষমতাধারী ব্যক্তিত্ব অনেক আছেন যারা সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসী। তাহলে তোমার মতো ছারপোকার আবার এই প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা কেন? তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এ কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তাহলে কি স্বয়ং দীনের নবী, মানবসম্রাট হযরত মুহম্মদ (সঃ) মিথ্যে বলেছেন? তাঁর মতো জীবন যদি ধর্মের জন্য ব্যয়িত হতে পারে, আউলিয়াদের মতো রত্নমানবেরা যদি ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে যেতে পারেন, তাহলে তোমাকেও তা করতে হবে—তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর বা না কর। মনকে বলুন : মন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার আমি ধারি না। মনকে এভাবে শাসাতে হবে। কারণ তার মধ্য দিয়ে কথা বলে ইবলিসই।

মনের এই অসুখটাকে সারাতে না পারলে মাইন্ড কন্ট্রোল থেকে লাইফ কন্ট্রোলের সুফল পাওয়া যাবে না। তখন তা হবে সাময়িক বিনোদনমূলক ব্যায়ামমাত্র। মানুষের এই কালিমাযুক্ত মনের আদালতে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলগণকে ইবলিস রীতিমতো আসামী বানিয়ে ছেড়েছে। তাতে আল্লাহ এবং তাঁর নবীদের কোনো ক্ষতি হয়নি, হবারও কথা নয়। ক্ষতি যত আমাদের। তাই তো পরম করুণাময় নিজের কৃপায় আমাদেরকে সাক্ষী হিসেবে নির্বাচিত ক'রে সঠিক-উপায়ে সাক্ষ্য দেবার আদেশ করেছেন। আর যথাযথভাবে সাক্ষ্য দিতে পারলে তখন আবিষ্কার করা যায় যে, এতদিন ইবলিসই তার কারাগারে আমাদের সবাইকে আসামী বানিয়ে রেখেছিল, এবং স্বয়ং আল্লাহ এবং রসুলগণই সাক্ষ্য দিয়ে আমাদেরকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং সত্য সাক্ষ্য দেবার সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। যখনই সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে যে তা আসলে এসেছিল আল্লাহর তরফ থেকে, এবং আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা যেন কোনোক্রমেই সত্য গোপনকারী না হই।

এবং সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত ক'র না, কিংবা সত্যকে জেনে তা গোপন ক'র না।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৪২)

বিশ্বাস সুদৃঢ় করার একটি অত্যুৎকৃষ্ট উপায় হলো হঠাৎ ক'রে কোনো বড় ধরণের ত্যাগ স্বীকার করা। ধরা যাক আপনি ধূমপান করেন। তাহলে আজই, এখনই, একটা সিগারেট জ্বালিয়ে মাত্র একবার ফুঁকে সেটাকে থুথু মেরে দূরে ছুড়ে ফেলুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন : প্রভু গো, আমার নফ্‌স এটাতে শান্তি পেত। আমি শুধু তোমাকে খুশি করার জন্যই আমার নফ্‌সকে এ থেকে বঞ্চিত করতে চাই। এ ত্যাগের বিনিময়ে তুমি আমার ঈমান মজবুত ক'রে দাও।

www.pathagar.com

তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এবং তোমরা যাকিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে ব্যাপারে বিশেষভাবে জ্ঞাত। (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত : ৯২)

প্রার্থনা করুন—প্রভু গো, আমার মনে যত প্রশ্ন জাগে তুমি তার জবাব দিয়ে দাও।

প্রভু গো, সেই জবাবই সবচেয়ে উত্তম, যা তার প্রশ্নকে ধ্বংস ক'রে দেয়। তুমি আমাকে এমন জবাব দান কর যা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকে নির্মূল ক'রে দেবে।

তুমি আমাকে ইবলিসের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে : প্রতিদিন কমপক্ষে একটা ক'রে আপত্তিকর অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে নফল নামাজে দাঁড়ান। ধরুন আপনার একটা বদভ্যাস আছে পরস্ত্রীর প্রতি বা আপনার স্ত্রী নয় এমন নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া। নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করার আগে আপনার এই স্বভাবের কথা স্মরণ করুন। তারপর মনকে একনিষ্ঠ ক'রে সারা শরীর শিথিল (relax) ক'রে উদ্দেশ্যকে মনের সামনে রেখে কমপক্ষে সাতবার ইস্তেগফার (তওবা) পড়ুন :

আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম অতুবু ইলাই(হ্)।

আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহর নিকট যিনি অনাদি ও অনন্ত এবং তারই দিকে ফিরে আসছি এবং তওবা করছি।

আল্লাহ আপনাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন :

তোমরা নিজেদেরকে নিষ্পাপ মনে ক'র না। (সূরা নাজম, আয়াত : ৩২)

সুতরাং তওবা করতেই হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা না-চাওয়াই বড় অপরাধ। নিজেকে অপরাধী মনে না-করাই বড় অপরাধ। একটা চমৎকার জিনিস লক্ষ্য করবেন : যখনই একটা খারাপ কাজ থেকে তওবা করবেন, তখনই ইবলিস মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেবে—আল্লাহ কি আসলেই সত্য নাকি যে তার জন্য এই আরামের জিনিস ত্যাগ করতে হবে? এরূপ ভাব জাগা মাত্রই আবার relax ক'রে প'ড়ুন :

আমান্‌তুবিল্লাহি অমালাইকাতিহি
অকুতুবিহি অরুসুলিহি
অল্‌ইয়াওমিল্ আখিরি
অল্-ক্বাদরি খাইরিহি
অশার্‌রিহি
মিনাল্লাহি ত'য়ালা
অল্‌বা'সি বা'দাল্ মাওত।

www.pathagar.com

আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেস্তাসমূহ এবং কেতাব-সমূহের ওপর, রসূলগণের ওপর, শেষ বিচারদিনের ওপর, তকদীরের ভালোমন্দ আল্লাহর কাছ থেকে একথার ওপর এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ওপর।

তারপর মনে মনে নিজেকে বলুন : **সন্দেহের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে আল্লাহ সত্য, কারণ স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (সঃ)-ই বলেছেন যে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য** ইবলিস অনবরত পেছনে লেগে রয়েছে। **সুতরাং ইবলিসের উপস্থিতি আমার কাছে** আল্লাহর **সত্যতাই প্রমাণ ক'রে দিল।**

তাদের হৃদয়ে সন্দেহ আছে, তাই তারা সন্দেহের দোলায় দোলায়িত।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৪৫)

যাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই তাদের প্রার্থনা হলো মনের নিরর্থক অস্থিরতা।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ১৪)

সত্য এসেছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্গত হয়ো না। (সূরা আলইমরান, আয়াত : ৬০)

বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে–তা শাস্তি হোক অথবা কেয়ামত হোক। (সুতরাং এরূপ অবকাশ আমরা চাই না, চাই বিশ্বাস।)
(সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৭৪)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (তখন অবিশ্বাসও আর থাকবে না।) (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

এবার আনন্দে, আশ্বাসে, এবং ভরসায় একটু মুচকি হাসুন। ইবলিসের এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে সে আপনাকে হারাতে পারে, যদি আপনি আল্লাহর কথা স্মরণ করেন। শেষোক্ত আয়াতে আমরা সেই আশ্বাস পেয়েছি।

মানুষ কত সৌভাগ্যবান! চিন্তা ক'রে দেখুন তো, যে হৃদয়টাকে খোলা রাখে, ইবলিস তাকে ক্ষতি করতে গিয়ে তার উপকারই করে! পাঠক শুনে অবাক হবেন যে আউলিয়াগণ ইবলিসের কার্যবিধিকে পর্যবেক্ষণ ক'রেই আল্লাহর গূঢ় রহস্য জানতে পারেন।

এবার আবার আরো বেশি শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে relax করুন। এবং নিজেকে মনে মনে বলুন : মন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আল্লাহর সত্যতা নির্ভর করে না। আমি হৃদয় খোলা রেখে **তাঁরই বাণীর সাহায্যে** তওবা করছি। তোমার স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ওপর তাঁর বাণীর কার্যকারিতা নির্ভরশীল নয়। উদ্দেশ্য দৃঢ় রাখলে তাঁর বাণীতে যা ফল হবার তা হবেই।

www.pathagar.com

মনকে এই কথাগুলো বলার পর দেখবেন আপনি অনেক হালকা এবং ঝরঝরে হয়ে গেছেন। আপনার বিশ্বাস অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এরপর দুই রাকাত নফল নামাজ প'ড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং আবারও সাতবার ইস্তেগফার পড়ুন।

মনে রাখবেন : মনকে ঘরে ফেরাতে হবে। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি কিভাবে তাকে চিনবেন। কিভাবে জানবেন তার মধ্যে কী রত্নরাজি লুকিয়ে আছে।

এভাবে তওবা করতে থাকলে তওবা আপনার মনের প্রথম স্তরে স্থিত হতে থাকবে। কিন্তু তখন ঘটবে আরেক সমস্যা। ইবলিস আপনার মনের মধ্য দিয়েই মতবাদ ছড়াবে : বুঝলাম আল্লাহ সত্য। কিন্তু তাই ব'লে তাঁকে খুশি করার জন্য সুন্দরের প্রতি তাকানো যাবে না কেন? কী এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য পরস্ত্রীর দিকে তাকানো যাবে না? আল্লাহই তো তাদেরকে বানিয়েছেন। আল্লাহর তৈরি সৌন্দর্যকে এভাবে ঘৃণা করা কি অপরাধ নয়? নিশ্চয়ই এগুলো হুজুরদের বাড়াবাড়ি।

এরূপ প্রশ্ন আরো সূক্ষ্ম। এ মনে এলে মনকে বলুন : আল্লাহ কখনও নারীকে ঘৃণা করতে বলেননি। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন : 'তোমাদের পৃথিবীতে আমার পছন্দনীয় তিনটা জিনিস আছে : সুগন্ধী, নারী এবং প্রার্থনা'। তাছাড়া আমাকে তো নারী থেকে দূরে থাকতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে পরনারী থেকে দূরে থাকতে। আমার নফ্‌স যতই কষ্ট পাক, আমি এতে আনন্দ পাব। নফ্‌স হলো আল্লাহর শত্রু। আমার প্রভুর শত্রুকে আমি সুখে থাকতে দেব, তা কী ক'রে হয়? তাছাড়া **আমার স্ত্রী নয় এমন কোনো নারী আমার ধর্মের বোন। তার দিকে না তাকিয়ে নিজের ইজ্জত হেফাজত করার কাজকে তার জন্য সহজ ক'রে দেয়াও ভাই হিসেবে আমার দায়িত্ব।** আমি তার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে সে হয় বিরক্ত হবে কিংবা ইবলিসের কুমন্ত্রণায় হৃদয়ের গভীরে আনন্দিত বোধ করবে কিংবা অহেতুক অহংকারে একটা পুরুষকে 'পেছনে ঘোরানোর' ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে উভয়েরই মানসিক ভারসাম্যের ক্ষতির কারণ হবে। এর যেকোনো ঘটনার ফলই তার এবং আমার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং আমি তাকাবো না।

এভাবে মনকে কিছুক্ষণ বুঝালে ইবলিস দুর্বল হয়ে যাবে। ইবলিসের ক্ষমতা আসে অন্ধকার থেকে। জ্ঞানের আলোর কাছে অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না।

কিন্তু এরপর ইবলিস ধরবে নতুন ফন্দি। সে আপনার মনে ব্যাখ্যার সৃষ্টি করবে : তাকাতে দোষ নেই; উদ্দেশ্য ভালো থাকলে সৌন্দর্যকে উপভোগ করাতে অপরাধের কিছু নেই। আরে ঐ মহিলা তো আমার বোনের মত, আর উনি তো আমার মায়ের বয়সী। আমার মন ঠিক আছে।

সাবধান!

www.pathagar.com

মন নিজেই বলছে যে মন ঠিক আছে।

একবার এক বুযুর্গ কোনো এক প্রসঙ্গে দম্ভভরে তার কয়েক শিষ্যের সামনে বললেন : আরে, ইবলিস আমার কাছে আসে না।

খানিক পরে তিনি দুঃখিত হয়ে কাতর সুরে বললেন : কথাটা ইবলিসই আমার মুখ দিয়ে বলেছে।

সুতরাং, প্রিয় পাঠক, অধিকাংশ মনের মধ্যে ইবলিস নিজেই ইবলিস-বিরোধী কথা বলে। উদ্দেশ্য, ছোটখাট ব্যাপারে ব্যক্তিকে ধর্ম শিখিয়ে বড় ব্যাপারে ভয়ংকর অধর্মের গহ্বরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া।

এরপরও ইবলিস আসবে—একই কৌশল নিয়ে বারবার কিংবা অভিনব কৌশল নিয়ে। তখন আরো উচ্চতর কৌশলের প্রয়োজন হবে।

www.pathagar.com

চার

ধ্বংসের সৃষ্টি

ধ্বংস মানে মৃত্যু। ধ্বংস মানে ব্যাধি। ধ্বংস মানে অস্থিরতা, হতাশা, অবসন্নতা, আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের অভাব, অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, ভয়। জীবনের উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এদের যে-কোনো একটা বাধাই যথেষ্ট। জীবনের সব সুখ হরণ করার জন্য এদের যে-কোনোটাই সমান শক্তিশালী। এই জাতীয় ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মানে মৃত্যু দ্বারাই আক্রান্ত হওয়া। জীবনে এগুলোর উপস্থিতি মনকে মৃত্যুভয়কাতর ক'রে দেয়। মনে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে—তা থেকে সংসারে, তারপর সমাজে, কৃষ্টি-কালচার-সাহিত্যে, রাষ্ট্রকাঠামোতে, অর্থনীতিতে, বিশ্বব্যবস্থায়।

জীবনের সাথেই বেড়ে উঠতে থাকে মৃত্যু। মৃত্যু আসার আগেও বারবার আসে—জ্বরা-ব্যধি-ভয়-হতাশা আকারে। জীবন মরার আগেই বারবার মরে।

একটা মানুষ একটা জীবন্ত লাশ। সে যদি সাথে তার কফিনটা বয়ে নিয়ে বেড়াত, তাহলে তা তার স্মরণে থাকত। কিন্তু সে ভুলে থাকে যে সে প্রতি মুহূর্তে পিছলে পড়ছে। এই ভুলে থাকার জন্যই সে কিছুটা স্বাভাবিকভাবে সংসারকাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় আরো বেশি। বড় ধরনের ব্যাধি বা শোক বা মৃত্যু যখন দুয়ারে হানা দেয়, তখন সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়।

জাগতিক বা সেকুলার-মাইন্ডের লোকেরা পার্থিবতার মধ্যে তাদের সেই অস্থিরতা এবং ভয়কে লুকিয়ে রেখে জীবন-যাপন করে। কিন্তু তাদের সেই বেঁচে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল।

মৃত্যুকে ভুলে থেকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

জীবনের মধ্যে ডুবে গিয়েও মৃত্যুর আতংক থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

মৃত্যুকে একটা আবশ্যিক প্রাকৃতিক ঘটনা ব'লে মেনে নিয়েও স্বাভাবিক হওয়া যায় না। তথাকথিত নাস্তিকদের নির্ভেজাল চকচকে হাসিমাখা মুখ দেখেই বলা যাবে না যে তারা সুখী। তারা সুখের যে সংজ্ঞাটা জানে, বাস্তবে তার সাক্ষাৎ কোনোদিনও পায়নি। মৃত্যুকে বাদ দিয়ে যে-জীবন, তার প্রতিটি পদে-পদে থাকে বিকৃত, উদ্ভট মেজাজের মৃত্যু।

www.pathagar.com

তাহলে বেঁচে থাকার কি কোনো উপায় নেই?

আছে। বেঁচে তো আছে সবাই। বেঁচে থাকেও। প্রকৃতির নিয়মগুলোর মধ্যে না-মরা পর্যন্ত বেঁচে থাকাও একটা নিয়ম। এই অর্থে বেঁচে আছে সবাই।

তবুও মনের গভীরে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে এ হলো জীবিত থাকা। জীবিত থাকা আর বেঁচে থাকা এক কথা নয়। বেঁচে থাকা মানে অন্য কিছু। **বেঁচে থাকা মানে জীবিত থেকে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা। সেই উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তির পক্ষে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয় সে বেঁচে আছে কি না।**

প্রকৃত বেঁচে থাকা তাকেই বলে যা বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য অর্জন করেছে। প্রকৃত জীবন সেটাই যা মৃত্যুর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

প্রকৃত জীবন সেটাই যা জীবনেরও গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে।

প্রিয় পাঠক! **জীবনকে বায়োলজিক্যালি বা জৈবিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলেই দেখা যাবে যে তার শুরুতে জীবন ছিল না—শুধু ছিল জৈবিকতা বা প্রাণ—এবং শেষেও থাকবে মৃত্যু। সুতরাং বেঁচে থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।**

বেঁচে থাকা একটা প্রক্রিয়ামাত্র। একে আমরা শুরু করিনি। আমরা একে সমাপ্ত করারও যোগ্যতা রাখি না। এ কারণে আমরা যদি আমাদের খামখেয়াল অনুসারে বেঁচে থাকি তাহলে জীবন থেকে যা চাই তা পাই না।

তাহলে জীবনটা আসলে কী?

এই একটা প্রশ্নই কোটি কোটি জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে—যুগে যুগে। ফলে ঘটনা হয়েছে এরূপ যে, জীবনটাকেই মনে হয়েছে জীবনের বোঝাস্বরূপ। এই বোঝা বহন করা বড়ই কষ্টকর। ফলে আমরা চারদিকে দেখি অপমৃত্যু—আত্মহত্যা, ড্রাগ-এডিকশান, ফ্যাশান-নাস্তিকতা, প্রতিমা-পূজা, অগ্নি-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, নফ্‌সের পূজা, শব্দ-পূজা (বা উদ্দেশ্যহীন কবিতাপ্রীতি) অস্থিরতা, বিষণ্নতা, হাহাকার।

তাহলে কি জীবনটার অর্থই ওলটপালট হয়ে গেল না?—পাঠককে হয়তো এই প্রশ্নবাণ এই মুহূর্তে আহত করছে। কিংবা আপনি হয়তো ভাবছেন যে লেখক সাহেব জীবন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তাকে অযথা জটিল করে তুলছেন।

কিন্তু প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন তো, **যে-জীবন নিয়ে একটু ওলট-পালট কথা বললেই তা ওলট-পালট হয়ে যায়, তার সার্থকতা এই অর্থে কতটুকু?**

আপনার মনে আবারও প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে কি জীবন মানে অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা?

না। আমি আগেই বলেছি যে **জীবনও জীবনের উদ্দেশ্য নয়।** জীবন একটা সাদা কাগজ; তাতে আপনি কী লিখলেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনীশক্তি বা জীবিতাবস্থা জীবনের একটা বস্তুগত এবং জৈবিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যমাত্র। আগে জীবন পরে

www.pathagar.com

লক্ষ্য এভাবে বাস্তবতা রচিত নয়। প্রকৃত বাস্তবতা হলো একটা লক্ষ্য। চেতনা যখন দৃশ্য এবং অদৃশ্য অবয়বের প্রকাশ ঘটিয়ে সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে, তখন স্থান-কালের সাথে সেই অবয়বের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকেই বলে জীবন। সুতরাং বেঁচে থাকা মানে হলো জীবনের সেই প্রক্রিয়া যার কিছু ঘটনা আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও ঘটত। এসবকে ঘটিয়ে বা ঘটতে দিয়ে কোনো সার্থকতা অর্জন করা যায় না বা বলা যায় না যে আমি আনন্দিত হয়েছি।

তাহলে এই ঝামেলাটা মানুষের ওপর চাপানো হয়েছিল কেন? কেন আমাকে আমার অনুমতি ছাড়াই জোর ক'রে সৃষ্টি করা হলো এবং তারপর এমন নিয়মের বোঝাও আমার ওপর চাপানো হলো যে আমি যা করতে চাই তা করলে আমি যা পেতে চাই তা পেতে পারি না? কেন?—বিদ্রোহী মন এভাবে প্রশ্ন ক'রে উঠতে চায়। এই প্রশ্ন মনের নিজস্ব। এর জবাব পেতেই হবে। জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য হলো এই প্রশ্নের জবাব খোঁজা এবং জীবনের একটা বিরাট সার্থকতা হলো এর জবাব খুঁজে পাওয়া। অন্য কথায়, জীবনের জন্য কোনো লক্ষ্যই বা কেন দরকার?—এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়াই জীবনের প্রথম লক্ষ্য। মন যখন এটুকু বুঝে ফেলবে তখন দেখা যাবে যে বেঁচে-থাকা একটা সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে যাচ্ছে।

মানুষকে জীবন দেয়া হয়েছিল কেন?

মৃত্যুকে অতিক্রম করার জন্য।

মানুষকে মৃত্যু কেন দেয়া হয়েছিল?

জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হবার জন্য।

আবারও সেই প্রশ্ন : জীবন কেন দেয়া হয়েছিল?

জীবন দেয়া হয়েছিল 'এ জীবন কেন দেয়া হয়েছে?' এই প্রশ্নের জবাব পাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

সে জবাব পাবার পর কী ঘটবে?

মৃত্যু ঘটবে?

তারপর?

তারপর আর কোনো মৃত্যু এসে জীবনকে সংজ্ঞায়িত করবে না।

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন :

> **তোমরা মরার আগে মর, তাহলে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।**

কিভাবে মরতে হবে?

বেঁচে থেকেই!

এবার কি কথাগুলো নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে না?

www.pathagar.com

না। এ জীবনকে কেউ তাঁর নিজের খেয়ালে খেলনার সামগ্রী ক'রে সৃষ্টি করেননি। আমাদের যেন নজরুলের 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে/বিরাট শিশু আনমনে'—মন্তব্যটা শুনে বিভ্রান্তি না লেগে যায় সেজন্য আল্লাহ্ পরম করুণাময় পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন যে তিনি মানুষকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি :

যারা দাঁড়িয়ে বসে, ও শুয়ে আল্লহ্‌কে স্মরণ করে, এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে—হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ **অনর্থক সৃষ্টি করনি** ...
(সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৯১)

আমি আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই **অনর্থক সৃষ্টি করিনি**; যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই ... (সূরা সাদ, আয়াত : ২৭)

তিনি চান না যে সৃষ্টি-মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করুক :

তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরিক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে-কারণে **সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে?**—বল, আল্লাহই সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ, আয়াত : ১৬)

আসলে এত **জটিলতা** কেন আসছে?

কারণ আমরা সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত হতে চাই।

প্যাঁচ খুলতে গেলে উল্টো প্যাঁচ দিতে হয়।

আমরা ভুল ক'রে ভেবে বসি যে আমরা জীবিত ছিলাম এবং তারপর আমাদেরকে জোর ক'রে মৃত্যুর বোঝা বহন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়।

তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মন ভেবে বসে যে জীবন মৃত্যুর দ্বারা সংজ্ঞায়িত, অর্থাৎ জীবনের মতো মৃত্যুও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মৃত্যুকে এভাবে কর্তব্য হিসেবে ধরে নিয়ে বেঁচে থেকে কোনো কার্ল মার্কস বা বার্ট্রান্ড রাসেলও কি তৃপ্তি পেয়েছেন?

পাননি।

কারণ তারা নিজেদেরকে সঠিক প্রশ্নটাই করতে পারেননি। ফলে জবাব যা পেয়েছেন সব ভুল। তা জীবনের কোনোই কাজে আসেনি। তা দিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে বা বদলে যেতে পারে, দর্শন সমৃদ্ধ হতে পারে বা তার পূর্ববর্তী দারিদ্র্য ধরা পড়তে পারে, বড় বড় খেতাব এবং পুরস্কার এবং যুদ্ধ এবং বিপ্লব এবং সরাইখানা এবং বেশ্যালয় এবং গোরস্থান রচিত হতে পারে, কিন্তু তা পৃথিবীর কোনো মানব সন্তানের জীবনের কোনো কাজে আসেনি।

আসল সত্যটা হলো : **জীবনের সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল ধ্বংসের।** আর সেই ধ্বংসযজ্ঞের ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতত্ত্বে আটকে গিয়েছিল জীবন—আল্লাহর চিরশ্বাশ্বত বৈশিষ্ট্যাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয়। এই ধ্বংস সৃষ্টি হয়েছিল তখনই যখন আদি পিতা

www.pathagar.com

আদম (আঃ) এবং আদি মাতা হাওয়া (আঃ) ইবলিসের প্ররোচণায় সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন। নষ্ট হয়েছিল আল্লাহর সাথে তাঁদের ঐক্য। সৃষ্ট হয়েছিল ক্ষুদ্র অস্তিত্ব, নশ্বর মন। ব্যাঙ তার কুয়োর মধ্যে পড়ে সেখানেই চিরকাল আবদ্ধ থাকার অবস্থা সৃষ্টি ক'রে নিল। এবং সে তখন সাগরকে ভাবতে শিখল তার কুয়োর চেয়েও ক্ষুদ্র আকারে।

যত সমস্যা সৃষ্টি হলো এই ভাবনা থেকেই। ফলে এখন মন তার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে পথ খুঁজে পায় না, তখন সে হয় মৃত্যু খোঁজে না হয় মরতে বাধ্য হয়। এর কোনোটাতেই মুক্তি নেই। এমনকি আদম-হাওয়াকে (আঃ) দোষারোপ করাতেও কোনো মুক্তি বা সদুত্তর লুকিয়ে নেই। এখানে এসে রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পাঁচ

মৃত্যুর মধ্যে জীবনের হাতছানি

এখন তাহলে মুক্তি কোথায়?

এখন মুক্তি জীবনের মধ্যে নেই, মৃত্যুর মধ্যে।

এখন মুক্তি মৃত্যুর মধ্যে নেই, মৃত্যুর কিভাবে সৃষ্টি হলো তার রহস্য জানার মধ্যে।

এখন মুক্তি মৃত্যুর রহস্যের মধ্যে নেই, তাকে অতিক্রম করার মধ্যে।

মৃত্যু অতিক্রমের প্রকৃত অর্থ হলো জীবন-মৃত্যু উভয়ের গণ্ডি পার হয়ে সেই শাশ্বত ঘরে ফিরে যাওয়া যার সম্বন্ধে আমরা ভুলে গেছি বিধায় আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে যুগে যুগে নবী-রসুলগণকে (আঃ) পাঠিয়ে বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমরা এখনও জন্মাইনি, এক ধারাবাহিক মৃত্যুর মোহতন্দ্রার মধ্যে অবস্থান করছি। এই রহস্য জানলে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায়।

জীবনের উদ্দেশ্য হলো জীবনের উৎসকে স্মরণ করা।

জীবনের উদ্দেশ্য হলো আবার সেই উৎসের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে শাশ্বত ঘরে ফিরে যাওয়া।

আপনি পরকালে বিশ্বাস করেন বা না করেন, পরকাল আপনাকে টেনে নেবেই।

আপনি বেহেস্তে যেতে চান বা না চান, বেহেস্ত এবং দোযখের মধ্যে আপনাকে একটা বেছে নিতে হবেই।

আপনি মৃত্যুর নিদ্রায় শায়িত থাকতে চাইলেও মৃত্যুর সময়ে আপনি জেনে আতংকিত হবেন যে আপনার আর কোন মৃত্যু হবে না। বিগত জীবনের কাজ অনুসারে অনন্তকাল ফল ভোগ করতে হবে। তখন কঠোরভাবে বলা হবে :

> আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা ক'র না, বহুবার ধ্বংস কামনা করতে থাক।
> (সূরা ফোরকান, আয়াত : ১৪)

মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে। মানুষ ভ্রান্তিবশত ভেবে বসে যে মৃত্যুর সময়ে মুমূর্ষ ব্যক্তি চোখে অন্ধকার দ্যাখে, যেমন হয়ে থাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ার সময়ে।

www.pathagar.com

একদম না।

বরং সত্যটা ঠিক এর উল্টো। মৃত্যুর সময়ে আমাদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে না, চোখের অন্ধকার এবং মায়ার ঘোর কেটে যাবে। সেই শাশ্বত জগতের বিশাল রহস্যের দ্বার খুলে যাবে। এই রহস্য দেখেই সবার মনে পড়বে কে তাকে বানিয়েছিলেন, কেনই বা বানিয়েছিলেন, তার ওপর আদৌ কোনো অবিচার করা হয়েছে কিনা। অসার্থক মন তখন আফসোসে ফেটে পড়বে। হা ক'রে তাকিয়ে থাকবে, যা আমরা প্রত্যেক লাশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি। যাদের কৃতকর্ম খারাপ ছিল, তারা আবার ফেরত আসবে চাইবে পৃথিবীতে :

... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।
(সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

যখন ওদের কারে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠাও, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি।—না এ হবার নয়। এ তো আর একটা উক্তিমাত্র। ওদের সামনে **পর্দা থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।** (সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ৯৯-১০০)

তারা দেখবে যে কোরআনের প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তারা আল্লাহকে বা তার রহস্যকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবে না। এ কোনো বানোয়াট গল্প নয়। মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যারা আল্লাহ্‌র অলি হয়েছেন, তাদেরকে সান্নিধ্য দেয়ার আগে আল্লাহ্ করুণা ক'রে এসব রহস্য চাক্ষুসভাবে দেখিয়ে থাকেন।

সুতরাং ভয় পাবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়লে কোনো লাভ নেই।

আবার এই সত্যকে জানলে ভয় পাবার বদলে আস্থাই বেড়ে যাবার কথা। আমি যখন জানতেই পারলাম যে আমার মৃত্যুই আমার আমিত্বের পরিসমাপ্তি নয়, আমাকে আল্লাহ্ তাঁরই প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যের সম্মানে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবেন, তাহলে আর সময় নষ্ট করা কেন, তাহলে মনটাকে তাঁকে কেন দিয়ে দিচ্ছি না যিনি সকল জীবন-মৃত্যু-ধ্বংস-ক্ষয়ের উর্ধ্বে এবং যিনি এগুলোর স্রষ্টা?

মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর মধ্যেই লুকিয়ে পড়া যায়।

ব্যথা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যথার মধ্যে ঢুকে পড়া যায়।

যিনি তীর ছুড়ছেন তার কাছে আশ্রয় নিলে তো আর তীর বেঁধার ভয় থাকে না।

www.pathagar.com

ছয়

কোথেকে এলাম, কোথায় এলাম?

এতক্ষণে আমরা কোনো আলোচনা সৃষ্টি করতে পারিনি, শুধু নিজেদের উৎস-সন্ধানের লক্ষ্যে মনটাকে কিছুটা লক্ষ্যমুখী করতে পেরেছি। সুতরাং এখন একটু স্পষ্টতর প্রশ্ন করা যাক।

আমরা কোথেকে এসেছি?

কোথায় এসেছি?

উন্নাসিক নাস্তিক বলবেন, আমরা প্রকৃতিরই সন্তান। এখানেই আমরা সৃষ্ট হয়েছি। আবার এখানেই আমরা মাটিতে মিশে যাব। ডাস্ট্ টু ডাস্ট্।

আমার এক নাস্তিক বন্ধু একবার আমাকে এই জবাব দিয়েছিল। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম—তাহলে তুমি এই মাটি, এই ইট, কাঠ, লোহা-লক্কড়, পানি এগুলোর সন্তান? তার মানে তুমি এগুলোর মধ্য থেকে জন্ম নিয়ে কয়েকদিন বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়াচ্ছ এবং তুমি ম'রে যাবে আর এগুলো এখানে থাকবে?

হ্যাঁ, তা তো বটেই—সে নির্ভেজাল জবাব দিল।

তাহলে এই ইট, কাঠ, পাথর এরা তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? তুমি এদের মতোও হতে পারলে না। এরা তোমাকে জন্ম দিয়েছে। এরাই তোমাকে মৃত্যু দেবে। এর পর আর কিছু কি নেই?

সে অবাক হবার ভান ক'রে বলল—এরপর আবার কী? এরপর আবার এসব। বড়জোর পুনর্জন্মটা সত্য হতে পারে।

বললাম—এ কি বন্ধু, তুমি তো আবার ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ছ। পুনর্জন্মবাদ তো হিন্দু ধর্মের এবং বৌদ্ধ ধর্মের কথা।

না—সে বলল—এগুলো ধর্মের ব্যাপার না। এক্ষেত্রে এগুলোই বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক।

এবার আমি হেসে না উঠে পারলাম না। তাকে একটু ভেংচি কেটেই বললাম—আধুনিক? তুমি আধুনিকতার কথা বলছ? অথচ আমি তো নিশ্চিত জ্ঞানে জানি যে ঐ

www.pathagar.com

একটা রিক্সার ওপরে ছেড়া জামা পরে টুপি-মাথায় এক রিক্সাঅলা ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছে, ঐ দ্যাখ, ঐ লোকটাও তোমার চেয়ে ঢের আধুনিক।

সে রাগে গরগর করতে লাগল। কারণ মার্কসবাদী নাস্তিকরা অনেক কিছু সহ্য করলেও এটা সহ্য করতে পারে না যে কেউ তাদেরকে কম-আধুনিক এবং কম-জ্ঞানী বলুক। সে ঠোঁট-মুখ বাঁকিয়ে তার ক্ষোভটা একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কিভাবে?

বললাম—কেন, তুমি এই আধুনিক যুগেও, উচ্চশিক্ষিত লোক হয়েও, মনে করছ যে তুমি এই মাটি থেকেই জন্মেছ এবং এখানেই তোমার পরিসমাপ্তি; অথচ আধুনিকতার কল্পনার ফানুস ওড়াবার সময় তোমরা হরেক-রঙের ঘটনা দিয়ে গল্প সাজাও, যে সব গল্পের নায়কেরা আসে ভিনগ্রহ থেকে; তোমাদের সায়েন্স ফিকশানের নায়ক-নায়িকারা সময়কেও পার হয়ে চ'লে যায় অতীত থেকে ভবিষ্যতে, ভবিষ্যত থেকে উঠে আসে বর্তমানে। এই যদি হয় আধুনিকতা, তাহলে তো তুমি হেরে গেলে ঐ সামান্য রিক্সাঅলার কাছেও। কারণ তার কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান জানা না থাকলেও সে নির্ভেজালভাবে বিশ্বাস করে যে সে এই গ্রহ তো দূরের কথা, এমনকি এই গ্যালাক্সিরও বাসিন্দা নয়! সে এখানে পথভুলে সামান্য ত্রুটির জন্য এসেছিল অসীম দূর থেকে, এবং সে আবার সেখানেই ফেরত যাবে! সে জানে যে শুধু তার দেহটাই তার এখানকার পোশাক। যাবার সময়ে সে ওটাকেই এখানে ফেলে যাবে। কারণ দীর্ঘ আকাশ-ভ্রমণ এবং সময়-ভ্রমণের পথে এই মাটির দেহের পোশাক প'রে থাকা যায় না। সে জানে যে তার এই মাটির পোশাকের মধ্যেও আছে একটা আলোর পোষাক যা শ্বাশ্বত, যা প'রে সে অনন্তভ্রমণে বের হতে পারে। তোমাদের সায়েন্স ফিকশানের নায়ক-নায়িকারা ভিনগ্রহে যেতে হলে নতুন পোশাক প'রে নেয়, অথচ ঐ রিক্সাঅলা জানে যে চিরকালীন আলোর পোশাক তার পরাই আছে। তাহলে কে আধুনিক—তুমি? নাকি ঐ রিক্সাঅলা?

আমার নাস্তিক বন্ধুটা কাচুমাচু করতে লাগল। আমি তার মুখের ওপর বললাম—তোমরা শত-সহস্র বছরের কল্পনা-চিন্তা-তথ্য ব্যবহার ক'রে যে গল্প তৈরি করতে শিখেছ, ঐ রিক্সাঅলা পুরোপুরি নাদান-মূর্খ হয়েও নিজেকেই তার চেয়েও চমৎকার গল্পের নায়ক ভাবে।

আমার নাস্তিক বন্ধুটা চুপসে গেল।

আমি তাকে বললাম—দ্যাখ, আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাব। আমাদের এই আসা-যাওয়াও টামই-মেশিনের চেয়ে আধুনিক কায়দায় ঘটে। রসুল (সঃ) মে'রাজে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে তিনি সময়কে পার হয়ে তার অতীতে এক সময়হীনতার জগতে গিয়েছিলেন।

দ্যাখ বন্ধু, সময়টাও একটা সৃষ্টিমাত্র।

www.pathagar.com

সুতরাং সময়ের কাঠামোতে বাক্য গঠন ক'রে তা দিয়ে সময়ের স্রষ্টাকে নিয়ে প্রশ্ন করো না।

স্থান বা স্পেসও একটা সৃষ্টিমাত্র।

সুতরাং স্থানিক অবয়ব দ্বারা স্থানের স্রষ্টার বিশালতা মাপতে যেয়ো না।

মৃত্যু একটা সৃষ্টিমাত্র। জীবন কোনো সৃষ্টি নয়। জীবন শাশ্বত। হাদিসে আছে যে পরকালে মৃত্যুকেও এক সময়ে মেরে ফেলা হবে। মৃত্যু এবং জীবন উভয়ই সৃষ্টি—যদি জীবনকে সময়-স্থান-কর্মধারার এই দৃশ্যমান সমষ্টি হিসেবে ধরা হয়, যে কথা সূরা 'মুলক'-এর প্রথমেই এবং আরো অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। কিন্তু জীবনেরও যা জীবন, অর্থাৎ প্রাণমূল বা রূহ, তা আল্লাহ্‌রই আদেশ, তা শাশ্বত—শুরুহীন, সমাপ্তিহীন। আমরা মৃত্যুবরণ করি ব'লে সেই মৃত্যুর ছকে ফেলে প্রশ্ন গঠন ক'রে আমরা ব'লে বসি—আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করল?

দ্যাখ বন্ধু, এই প্রশ্নটাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেনে—কে এই প্রশ্নটাকেই উল্টো তাঁর ওপর প্রয়োগ করে তা জানার জন্য।

সব কার্য-কারণ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার ওপর কার্য-কারণের সূত্র প্রয়োগ করতে যেয়ো না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) যথার্থই বলেছিলেন—কার্য-কারণকে অতিক্রম কর, তাহলে কার্য-কারণের স্রষ্টার কাছে পৌঁছে যাবে।

শোনো বন্ধু, তোমাকে একটা মহারহস্যের কথা বলি, যা সব বড় মানের আউলিয়াগণ জানতেন এবং এখনও জানেন। সময়ের রহস্য। বিজ্ঞানীরাও বা দার্শনিকরাও বা কল্পনাবিলাসী সায়েন্স ফিকশানের লেখকরাও কিংবা তাওহীদ জ্ঞানহীন আলেমও আজ পর্যন্ত যা কল্পনা করেননি। তারা মানুষকে সময়ের খাপে বন্দী বন্দুকের গুলির মতো ভাবেন : যে-গুলির সময় শেষ, তার চলা শেষ। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এ বলেননি। তিনি বলেছেন যে সময় হলো একটা গতির অনুভূতি মাত্র, অনুভূতির ধারবাহিকতার আবশ্যিক একমুখিতামাত্র। মানুষ সৃষ্টির ফর্মুলাটা তিনি এমনভাবেই ক'রেছেন যে মানুষই—অর্থাৎ মানুষের গতিবিধি এবং মন এবং কাজই—তার নিজস্ব সময় সৃষ্টি করে। কথাটা একজন 'আলেমের কাছেও বেখাপ্পা লাগতে পারে। তিনি ভাবতে পারেন—এমন উদ্ভট কথা কোরআনে কোথায় বলা হয়েছে? কিন্তু একথা আমরা প্রমাণ করব ইনশাল্লাহ—এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কিছু ভাববার দরকার নেই; আমার সবটুকু আলোচনা গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম সার্থকতম সময়-বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একটা ছোট মজার উদাহরণ দিয়ে এটাই বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সময় যে একেক জনের কাছে একেক রকমের তা বুঝার জন্য শুধু এটুকু খেয়াল করাই যথেষ্ট তুমি বাথরুমের ভেতরে আছ নাকি বাইরে আছ! এ হলো সময়ের আপেক্ষিকতা। কিন্তু সময় যে মানুষেরই সৃষ্টি তা বিজ্ঞান জানে না।

www.pathagar.com

তিনি চমৎকার বলেছিলেন। বাথরুমের বাইরে থেকে যে-ব্যক্তি ভেতরে যাবার জন্য অপেক্ষা করে, তার এক মিনিট আর যে-ব্যক্তি ভেতর থেকে বাইরে বের হবে তার এক মিনিট সমান নয়। **তোমার (মানসিক) ব্যস্ততাই তোমার সময়ানুভূতিকে দীর্ঘ ক'রে দেয়**—যাকে বিজ্ঞানে বলে Time Dilution। একজন সাধারণ নামাজীও নামাজের সময়ে এই রহস্যের মুখোমুখি হন, যদিও তিনি সচেতনভাবে জানেন না ব্যাপারটা আসলে কী। যাদের নামাজ সুদৃঢ় হয়নি, তাদের প্রতি রাকাত নামাকের সময়ে মন থাকে সামনে—কখন পরের রাকাতটা আসবে, কখন নামাজটা শেষ হবে, আর ক'রাকাত আছে? **নামাজ এক মহারহস্য। এতে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের ব্যস্ত এবং অস্থির আমিত্ব থেকে সময় সৃষ্টি হয়ে তা আমাদের আত্ম-সচেতনতাকে আমাদের সচেতনতা থেকে টেনে লম্বা ক'রে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নামাজ যাদের নির্মল হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের কাছে বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যত ব'লে কিছু নেই। তাদের সচেতনতা যেখানে, আত্মসচেতনতাও সেখানে। তারা তাদের নামাজে সময়কে অতিক্রম ক'রে যান।** তারা এমনকি পরবর্তী নিঃশ্বাসকেও বিশ্বাস করেন না। ফলে তাদের জীবনে থাকে না কোনো ভবিষ্যত পরিকল্পনা। ভবিষ্যতের মিছে মায়া তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিতে পারে না। এ এক মহারহস্য! নামাজ। কি বিস্ময়কর উপহার! সাধেই কি আর একে মু'মিনের মে'রাজ বলা হয়েছে?

আরেকটা রহস্যের কথা বলি। টাইম মেশিন। মেশিনটা কাল্পনিক,কারণ তা এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি (তা সম্ভবও নয়)। কিন্তু ধারণাটা মিথ্যা নয়, কারণ তা কাল্পনিক নয়; তার পেছনে পুরোপুরি গাণিতিক ফর্মুলা আছে। বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের মধ্যে একটা ঘটেছিল গণিতে যা তোমরা জান না। সাধারণ মানুষ শুধু দ্যাখে বাইরেরটা, ভেতরেরটা নয়। বিশেষ প্রতিভাবান মানুষদের মধ্যেও অধিকাংশ দ্যাখে শুধু সেটাই যার দ্বারা তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল হবে, যেমন মার্কসবাদীরা। তারা বাকি সত্যগুলো প্রথমত এড়িয়ে যায় এবং পরে স্বভাব তাদের চিন্তাকে এত মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে যে তারা তা আর খুঁজেও পায় না। তারা তখন শুধু দ্যাখে সেই মতবাদই যা তাদের কাজে লাগছে। এবং তারা তাদের মস্তিষ্কের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে তার পক্ষে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি এনে হাজির করার চেষ্টা করে। তোমাদের মতো আঁতেলরা খোঁজ না রাখলেও সত্য কিন্তু সত্যই—তা-ই সব বাস্তবতার ভিত রচনা করে। ১৯৩১ সালে আমেরিকার গণিতবিদ-দার্শনিক কুর্ট গোডেল গাণিতিকভাবে প্রথমে প্রমাণ করেন যে সময়ের অতীতে পৌঁছানো সম্ভব—যদি বিশেষ শর্তপালনকারী কিছু যান্ত্রিক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা যায়। সেই থেকে সারাবিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল টাইম মেশিন নিয়ে। মানুষের যোগ্যতার চেয়ে তার কল্পনাই আগে চলে। সুতরাং সায়েন্স ফিকশান লেখকরা তা নিয়ে রমরমা ব্যবসা চালানোর সাথে সাথে গোটা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল চটকদার গল্প-কাহিনীর প্রতি। মানুষ

www.pathagar.com

এভাবেই যুগে যুগে সত্য থেকে দূরে থাকার সুযোগ ক'রে নিয়েছে। যাহোক, একদল বিজ্ঞানী অবশ্য এ নিয়ে কাজ করতেই থাকলেন। আজ পর্যন্ত টাইম-মেশিনের যে গাণিতিক ধারণাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তার মূল সূত্রটা সাধারণ কথায় এভাবে বলা যায় : আমি হাজার হাজার মাইল বা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের কোনো স্থানে যেতে চাই। তাহলে আমাকে বিশেষভাবে নির্মিত টাইম-মেশিনটিতে প্রবেশ করতে হবে। আমি সুইচটা অন করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখব যে আমার মেশিনটা লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কিভাবে? মেশিনটা কিন্তু বায়ু বা শূন্যতা ভেদ ক'রে চলেনি। তা কোনোভাবে গতিশীল হয়নি!

তাহলে?

এখানেই তো রহস্য। **আমার যাত্রাবিন্দু এবং লক্ষ্যবিন্দুর মাঝামাঝি স্পেস বা শূন্যস্থানটাই সংকুচিত হয়ে গেছে!** বিস্ময়কর আইডিয়া। গাণিতিক প্রমাণে এই পদ্ধতিটাই টিকে আছে।

অথচ শুনে আরো বেশি অবাক হবে যে আটশ' বছর আগে গোঁড়া মুসলিম ধার্মিক এবং আউলিয়া হয়রত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর 'দাকায়েকুল আখবার' বইতে কথাপ্রসঙ্গে কুতুব-আবদালগণ (উচ্চতম পর্যায়ের আউলিয়া) কিভাবে সেকেন্ডের মধ্যে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতেন তা বলতে গিয়ে বলেছেন যে **'তাঁদের জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত ক'রে দেয়া হয়'**। ফর্মুলায় কি মিলে যায়নি? এবং আরো বিস্ময়কর হলো এই যে, টাইম-মেশিন কখনও তৈরি হবে না, অথচ আবদালগণ চিরকালই এই ফর্মুলায় সেকেন্ডের মধ্যে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করবেন।

কিভাবে তাঁরা তা করেন?

নামাজ দ্বারা।

নামাজই হলে ইউনিভার্সাল টাইম মেশিন!

একটা কথা কি ভেবে দেখেছ? রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্‌র আরশে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে আসার সময়ে মুখটা মলিন ক'রে রইলেন। আল্লাহ্ তাঁকে প্রশ্ন করলেন তিনি কেন মুখ ভার করলেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক না? আল্লাহ্-ই হলেন মানবের মূল লক্ষ্য। তাঁকে সান্নিধ্যে পেলে সৃষ্ট-অসৃষ্ট, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু পাওয়া হয়ে যায়। দুঃখ কষ্ট, মৃত্যু সব ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়। অথচ তিনি মুখ-মোবারক মলিন ক'রে রইলেন? আল্লাহ্‌র প্রশ্নের জবাবে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জানালেন যে তিনি তাঁকে দেখে ব্যক্তিগতভাবে সার্থক এবং পূর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর উম্মতদের বা অনুসারীদের কী হবে, তারা কিভাবে এই সৌভাগ্য অর্জন করবে, আদৌ তাদের এই সুযোগ হবে কিনা, তা নিয়েই তিনি চিন্তিত।

তখন আল্লাহ্ পরম করুণাময় রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর অনুসারীদেরকেও মেরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

www.pathagar.com

তা হলো নামাজ!

কোথায় মেরাজ—সশরীরে আরশ ভ্রমণ, আর কোথায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সামান্য সময়ের জন্য বিশেষ নিয়মে ওঠাবসা! এভাবে দুটো ভিন্ন জিনিসকে কেনই বা তুলনা করা হলো? জ্ঞানী নাস্তিকদের বুঝা উচিত যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে এবং তাদের উচিৎ নামাজ নিয়ে চেঁচামেচি না ক'রে সরাসরি নামাজ প'ড়ে দেখা। কেন, **তোমরা পুঁজো দেখতে যাও, গীর্জায় প্রার্থনা শুনতে যাও, হোলি দেখতে যাও—কেউ কি কখনও বন্ধুদেরকে বলেছ : চল, নামাজ হচ্ছে, দেখে আসি?** না। কারণ, ইবলিস সত্যকে পছন্দ করে না এবং সে তোমাদেরকেও দূরে রাখে।

এটাই প্রমাণ করে যে নামাজ সত্য।

মনের খামখেয়ালির উপাসনা করা আর সত্যের উপাসনা করা পুরোপুরি দুই মেরুর জিনিস। এমনকি আল্লাহকে খুশি করার জন্যও ধর্মের মধ্যে ইচ্ছামতো কোনোকিছু ঢুকানো যাবে না!

> তোমরা অনুমান ও নিজেদের স্বভাবের অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, আয়াত : ২৩)

> ... খারাপ এবং ভালো কখনও সমান নয়, এমনকি যদিও খারাপের আধিক্য তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে ... (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১০০)

> তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

> ওরা **আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে** যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন? (সূরা আহক্বাফ, আয়াত : ২৮)

> তারপর তাদের পর অসৎ বংশীয়েরা উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যারা **নামায নষ্ট করেছিল** এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল; ফলত তারা অচিরেই শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

সুতরাং আল্লাহকে **খুশি করার জন্যও** তাঁর বিধানকে পাল্টানো যাবে না। তাঁর আদেশ পালন করাই তো ইবাদত। আল্লাহ অন্যত্র কোরআনে বলেছেন যে সন্ন্যাসবৃত্তি বা বৈরাগ্যসাধনা তিনি খ্রিস্টানদের জন্য বাতলে দেননি, তারাই তাঁকে খুশি করার জন্য তা নিজেরা উদ্ভাবন করেছিল। আর এটা উদ্ভাবন ছিল বলেই তারা এতে অটল থাকতে পারেনি। ইবলিস আল্লাহকে সিজদা করেছিল কিন্তু আদমকে (আঃ) সিজদা করেনি। সে বুঝতে পারেনি যে আল্লাহর আদেশ পালন করাই ইবাদত।

আমার বন্ধু জানতে চাইল—সময়কে যদি মানুষই সৃষ্টি করে তাহলে নিয়তি সত্য হলো কিভাবে? অর্থাৎ একথা সত্য হয় কিভাবে যে কোনো মানুষের জীবনকাল আগে থেকে নির্ধারিত?

www.pathagar.com

বললাম—জীবনকে কি কোরআন হাদীসে কোথাও ঘন্টা-মাস দ্বারা হিসাব করা হয়েছে? মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। **মানুষের তথা গোটা সৃষ্টিজগতের ফর্মুলার মধ্যে সময়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।** অর্থাৎ তা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। তুমি আইনস্টাইনকে সত্য ভেবে আবদালগণকে মিথ্যা ভাববে, তা হয় না। তুমি জীবনকে অন্যভাবে কেন মাপতে চাচ্ছ না? ধর তোমার জীবনের মেয়াদ হলো তোমার হার্টবিট— যেমন তুমি বিশ লক্ষ হার্টবিট পর্যন্ত বাঁচবে। এখন এই হার্টবিট পরিমাণ আয়ুকে তুমি যদি সময়ের স্কেলে টেনে লম্বা ক'রে নাও, তাহলে বেশিদিন বাঁচলে—দিনের হিসাবে। ধর তোমার জীবন মেপে দেয়া হয়েছে মোট তওবার সংখ্যা দ্বারা—অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, তোমাকে ১০টা কবিরা গোনাহ এবং ১ লক্ষ ছগিরা গোনাহ্ করা পর্যন্ত বাঁচতে দেয়া হবে, যদি তুমি তার মধ্যে তওবা না কর। অন্যথায় তোমাকে তার সমপরিমাণ বা equivalent পরিমাণ অঙ্গচালনা পর্যন্ত—হাত-পা-চোখ ইত্যাদির ব্যবহার পর্যন্ত—বাঁচতে দেয়া হবে। তাহলে এই গোনাহ্‌গুলো করতে বা অঙ্গচালনাগুলো করতে তোমার **যে শক্তির প্রয়োজন হবে তা নির্ধারিত।** এই শক্তিটুকু তুমি ইচ্ছামতো ভালো বা মন্দ যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পার। এটাই তোমার সীমা। আল্লাহ কাউকে তার জন্য নির্ধারিত সীমার বাইরে যেতে দেন না :

কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফয়সালা তো হয়েই যেত।
(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে।
(সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা **সংঘটিত করার আগেই** তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। **এ জন্য যে,** তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছ), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—সম্ভবত কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

... তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩০)

আমিই ... লিখে রাখি যা ওরা (মানুষ) **আগে পাঠায়** এবং যা পেছনে রেখে যায়।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১২)

www.pathagar.com

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (এখানে কেয়ামতের 'আসন্নতাকে' মাপা হয়েছে **লক্ষণ** দ্বারা, **সময়** দ্বারা নয়!) (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (**নিজেদের এবং অপরের**) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

আমি কি তোমাদের **দীর্ঘ জীবন** দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে **সম্ভবত** কেয়ামত আসন্ন! তাহলে কি তিনি জানেন না কখন তা সংঘটিত হবে? অবশ্যই তিনি তা জানেন। আসলে কেয়ামত কবে হবে তা **সময় দ্বারা মেপে** হিসাব করা হয়নি; অর্থাৎ এমনটি নয় যে আল্লাহ জোরপূর্বক নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন অমুক দিন কেয়ামত হবেই। আদৌ তা নয়। অধিকাংশ আলেমই একথা জানেন না। কেয়ামত সংঘটিত হবে মানুষের আচরণের সীমালঙ্ঘনের কারণেই। আল্লাহ শুধু এরূপ একটা নিয়ম ঠিক ক'রে দিয়েছেন—"মানুষ যখন সীমালঙ্ঘনের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছাবে তখন মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে"—যার ফলে তিনি মানুষের সীমালঙ্ঘনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপে তাকে ছোট ছোট বিপর্যয়ের মুখোমুখি ক'রে দেন, যেন সে তওবা করার সুযোগ পায়। মহাবিশ্বের সার্বিক ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা রয়েছে বলেই আল্লাহ মানুষের কর্মফলকে তাৎক্ষণিকভাবে তার দিকে ফিরিয়ে দেন না—তাকে সুযোগ দিয়ে থাকেন, আকাশ এবং পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তারা কুকর্মের ফলকে বিশেষ সীমা পর্যন্ত ধারণ ক'রে রেখে বিপর্যয়কে বিলম্বিত করতে পারে। আমরা আরও জানতে পারছি যে মানুষের আয়ুও পরিবর্তিত হয় এবং এরূপ পরিবর্তনও নির্ধারিত বিধি মোতাবেক ঘটে। অন্য কথায়, সকল পরিবর্তন এবং রদবদলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও পূর্বনির্ধারিত বিধান রয়েছে। বিধান দ্বারা বিধান নির্ধারিত হয় এবং কোনো বিশেষ বিপর্যয় সংঘটিত হয় তখনই যখন তা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, বা মানুষের আচরণ বিশেষ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যায়। ফলে কোনোকিছু ঘটতে দেখলে স্পষ্টতই বুঝতে হবে যে সেক্ষেত্রে একটা সীমালঙ্ঘন ঘটেছিল এবং তার আগে বহুবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুযোগও দেয়া হয়েছিল। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে সময় হলো সৃষ্টিফর্মুলার একটা উৎপাদ বা output, তা ফর্মুলার অংশ বা input নয় আদৌ। তা যদি হতো, তাহলে আবদালগণ (উচ্চতম পর্যায়ের আউলিয়াগণ) সময়কে অতিক্রম করতে পারতেন না। কেউ, কিংবা কোনো জাতি, তার নিজস্ব সীমা অতিক্রম করলে সে বা সেই জাতি ধ্বংসের মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা তার ফর্মুলাতেই ঢুকানো ছিল। চাবি শেষ হয়ে গেলে ঘড়ি তো থেমে

www.pathagar.com

যাবেই। সেক্ষেত্রে তাকে বাইরে থেকে কেউ জোরপূর্বক থামাবে না—চাবিই তাকে থামিয়ে দেবে। একটা মিসাইলকে নিক্ষেপ করার সময়ে নিক্ষেপকারী যন্ত্রটা তাকে ধাক্কা দেয়ার সাথে-সাথে তা যে-শক্তিতে বিস্ফোরিত ও নিক্ষিপ্ত হয় তা নির্ধারিত। কিন্তু মিসাইলটা কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তা নির্ভর করবে তাকে কত কোণে (৪৫° কোণে নাকি ৩০° কোণে ...) নিক্ষেপ করা হলো তার ওপর। বলা বাহুল্য, মিসাইলটা সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে ৪৫ ডিগ্রী কোণে শূন্যে নিক্ষেপ করলে। তোমার একটা রেডিও আছে যার ব্যাটারি হলো দুটো। তুমি তাকে সারাক্ষণ চালালে যত দিন ব্যবহার করতে পারবে, মাঝে-মাঝে চালালে তার চেয়ে বেশিদিন ব্যবহার করতে পারবে। জীবনটার ক্ষেত্রেও তাই। জীবনের মোট **জীবনীশক্তি** পূর্বনির্ধারিত। তুমি সেই শক্তিকে অত্যন্ত ভালো কাজে বা অত্যন্ত খারাপ কাজে বা মিশ্র কাজেও লাগাতে পার। কিন্তু তুমি যদি তা ব্যবহার ক'রে মানুষ খুন করার কাজে লেগে যাও এবং খুব দ্রুত শক্তি ক্ষয় ক'রে ফেল, তাহলে তোমার শক্তি যেদিন শেষ হবার কথা, সেদিন হয় তুমি আত্মহত্যা করবে না হয় খুন হবে না হয় ফাঁসিতে ঝুলবে না হয় কোনো দুর্ঘটনায় তোমার মৃত্যু হবে। শুধু তাই নয়, **সীমারও স্তর আছে : ব্যক্তিজীবনের সীমা, জাতীয় জীবনের সীমা ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করলেও আল্লাহ্ তার জাতীয় সীমার দিকে তাকিয়ে তা বৃদ্ধি করতে পারেন।** সক্ষেত্রে 'ব্যক্তি + জাতি' এই সমগ্রের কোনো পরিবর্তন হবে না, সমগ্রের পূর্বনির্ধারণ ঠিকই থাকবে, শুধু একটার ঘাটতি পূরণ করার জন্য অন্যটা ব্যবহৃত হবে। যেমন, তুমি খুব বড় ধরনের খুনী হলে, এবং তোমার জাতিতে যদি এমন জঘন্য পাপী লোকের সংখ্যা বেশি থাকে যাদের খুন হওয়া উচিত, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে খুন করার জন্য তোমার মোট আয়ু বাড়িয়েও দিতে পারেন, যদি তুমি তখনও খুনের নেশায় মশগুল থাক এবং তওবা ক'রে ফিরে না আস।

> ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করেছিল, তখন তার ভাগ্য নির্ণয় কর হলো, ফলত সে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস তাকে গিলে ফেলল, তখন সে ধিক্কারযোগ্য। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে মাছের পেটে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো। (তাঁর কর্মফল তিনি পেলে তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো, কারণ আল্লাহ তাঁকে পরকালে শাস্তি দিতে চান না; কিন্তু আল্লাহর পবিত্রনামের মহিমার বদৌলতে তিনি কর্মফল থেকে রেহাই পেলেন।) (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

> তোমাদের নিটক শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম কেতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, যেন (পরে) কাউকে বলতে না হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য

www.pathagar.com

করেছি এবং আমি ঠাট্টাবিদ্রূপ করতাম। **অথবা কেউ যেন না বলে**—আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (শাস্তি তখনই আসে যখন তা লিখিত হয়ে যায়। তার আগ পর্যন্ত আমল বা ভালো কাজ দ্বারা তা পাল্টানোও যায়।) (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৪-৫৭)

আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (সবাইকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ব'লে প্রত্যেককে একটা সীমার মধ্যে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে—পরীক্ষাস্বরূপ। কিন্তু কেউ ধৈর্য ধারণ করলে উক্ত সীমার পর সবকিছু তার পক্ষেই যাবে। আসলে পরীক্ষা হয় ধৈর্যের। এবং ধৈর্য ধারণ করলেই পরীক্ষায় কৃতকার্যতা আসে। এই সীমাগুলোই পূর্বনির্ধারিত, কোনো সময় বা ঘণ্টা-দিন-মাস-বছর নয়। ইউনুস (আঃ) যে ধৈর্য এবং ক্ষমা প্রার্থনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, সময়ের স্কেলে তার মূল্য ছিল কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ কষ্টভোগ। কিন্তু তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা ও আল্লাহর মহিমা প্রকাশের একাগ্রতা সেই দৈর্ঘ্যকে ছোট ক'রে দিয়েছিল।) (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

... আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে সেখানে চক্রান্ত করার **অবকাশ** দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। (এই **অবকাশই** স্বাধীনতা, তওবা করার সুযোগ, এবং সংশ্লিষ্ট নির্যাতিতের ধৈর্য ও সত্যান্বেষীতার পরীক্ষাকে সার্বিকভাবে সুবিধাজনক করার জন্য। একে আল্লাহ সময় দ্বারা মেপে নির্ধারিত করেননি এর প্রকৃতিকে সময়ের স্কেলে মেপে প্রয়োজন অনুসারে প্রসারিত বা সংকুচিত করা হয়—এরূপ সংকোচন-প্রসারণ মূলত পূর্বনির্ধারিত বিধান অনুসারে ফর্মুলাতেই ঢুকানো আছে।) (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২৩)

কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জনেন। তিনি ... জানেন যা জরায়ুতে আছে; কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (এখানে 'কখন' দ্বারা সময়কে নির্দেশ করা হচ্ছে, কারণ এই সময়টা মাপা রয়েছে কিছু সীমা বা লক্ষণ দ্বারা—বিশেষ বিশেষ আচরণের সীমা অতিক্রম হলে এক-একটি **লক্ষণ** প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কিন্তু মানুষ সার্বিকভাবে তার সীমার ব্যাপারে অজ্ঞ ব'লে কেয়ামতের সময় সম্বন্ধে সে কখনই অনুমান করতে পারবে না। কেয়ামতের সময়ের সাথে গোটা সৃষ্টিকুলের সবগুলো উপ-বাস্তবতার শৃঙ্খলের সবগুলো সীমার সার্বিক মান জড়িত, যা মানুষের পক্ষে হিসাব করা সহজ নয়।)
(সূরা লোকমান, আয়াত : ৩৪)

এই রহস্যময় আয়াতগুলো থেকে আমরা আরও জানতে পারছি যে কর্মফলের ওপর ভিত্তি ক'রে ভাগ্য পুনর্নির্ধারিত হয় এবং তা একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তাকে আর রদ করা যায় না, কারণ তার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক সময় দেয়া হয়েছিল। এজন্য আমাদের জীবনে যাকিছু ঘটে তাকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করাই আমাদের জন্য উৎকৃষ্টতম পন্থা। ধৈর্যধারণ করলে সেই ধৈর্যের শক্তি কর্মফলের প্রতিকূলতাকে এক পর্যায়ে গিয়ে নির্মূল ক'রে দেয়। সুতরাং মনকে সময়মতো ঘরে ফেরাতে হবে।

www.pathagar.com

ভাগ্যের পরিবর্তন হয়—কিন্তু সামগ্রিকতার মান অপরিবর্তনীয়। এই সার্বিক মান (আয়ু/জাগতিক আয়ু) পর্যন্ত আমাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যে স্বাধীনতার মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সীমার বাইরে আমরা যেতে পারি না। এই সীমার পর সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্ নিয়ে নেবেন—আমাদের লাগামহীন পরীক্ষাধীন স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটবে :

> যেদিন আকাশ মেঘাপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই **প্রকৃত কর্তৃত্ব** হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।
> (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

> তারা কি অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না **আল্লাহ্ মেঘের আবরণ নিয়ে এসে উপস্থিত হন,** এবং ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে, এবং সেভাবে বিষয়টা মীমাংসা হয়ে যায়?
> (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১০)

এ হলো আসলে একটা **গতিশীল বা ডাইনামিক ভারসাম্য,** যার সার্বিকতার কোনো পরিবর্তন নেই, ভেতরকার রদবদল হতে পারে। আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরণা লাভ করার জন্য ধৈর্যধারণ ক'রে থাকা। নইলে তিনি সমস্ত স্বাধীনতাকে নিজের কাছে ফেরত নিয়ে তাঁরই কর্তৃত্বকে বহাল করবেন। তখন আর সময় থাকবে না।

> এবং আমি শিষ্যদের মনে আমাকে **বিশ্বাস করার প্রেরণা** সৃষ্টি ক'রে দিলাম ...
> (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১১)

বন্ধু বলল—তাহলে তো একথা সত্য যে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ব্যাটারি দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ—আমি বললাম।

সবাইকে সমান দেয়া হয়নি?

না।

তাহলে এটা অবিচার হয়ে গেল না?

না। কারণ **প্রত্যেককে সেটুকু শক্তি দেয়া হয়েছে যেটুকু আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে তার জন্য যথেষ্ট—কমও না, বেশিও না। কারো ওপর অবিচার করা হয়নি।**

তাহলে ঐ যে রিকসাওয়ালা টুপি মাথায় দিয়ে বসে আছে, ওর ক্ষেত্রে কী বলবে? সে তো লেখাপড়ারও সুযোগ পায়নি, প্রচুর দান-খয়রাত করারও সুযোগ পায়নি। ওর কী হবে?

বললাম, এমনও তো হতে পারে যে তাকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল কিন্তু সে তা অকাজে ব্যয় করেছে। হতেও পারে সে ছোটবেলা থেকেই ঠিক পথে আছে। সেক্ষেত্রে সে তার পরীক্ষায় ১০০র মধ্যে ১০০ই পাবে, যদি তাকে যে-শক্তি দেয়া হয়েছে সে তা

www.pathagar.com

সঠিক কাজে ব্যয় করে। প্রত্যেকের প্রশ্নপত্র আলাদা—প্রত্যেককে নম্বর দেয়ার পদ্ধতিও আলাদা। আল্লাহ তো বলেছেন যে কাউকে তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপানো হয় না।

আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪২)

তাহলে সে গারিব কেন?

ধনী হলেই বা কী হতো? হিসাব বেড়ে যেত। তুমি কি তাহলে ইহকালেই সব চাও। এটাই তো বিশ্বাসহীনতা। সে গরিব না হলে রিকসা চালাত কে? আল্লাহ নিজেই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছেন :

বল—আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ জানে না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ জীবিকার ব্যাপারে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তাহলে কি ওরা আল্লাহরই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে? (সূরা নহল, আয়াত : ৭১)

আমিই ওদের পর্থিব জীবনে ওদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যেন (তারা) একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে ...
(সূরা যুখরোফ, আয়াত : ৩২)

আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ দিয়ে থাকেন।
(সূরা শুরা, আয়াত : ২৭)

কত সুন্দর কথা! দাস-দাসীদেরকে অর্থ দিলে তারাও ধনী হয়ে যাবে এই আকাংকায় যারা দান করা বা উপযুক্ত মজুরি দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে আল্লাহ যথেচিতভাবে তিরস্কার করেছেন। এরূপ উচিত কথা কমুনিজমও কখনও বলতে পারেনি। কমুনিস্টরা কেবল অপরের অর্থ দেখে হিংসা করে এবং মতবাদ ও 'রক্তলাল' বিপ্লবের দ্বারা তা কেড়ে নিয়ে নেতাদের উদর পূর্ণ করতে চায়। আল্লাহ যার যতটুকু দরকার এবং যার যতটুকু প্রাপ্য এবং যাকে যতটুকু দিলে সমাজে অরাজকতা যথাসম্ভব কম থাকবে তাকে ততটুকুই দিয়ে থাকেন। তিনি সীমার ব্যাপারে সচেতন, যদিও মানুষ স্বভাবতই সীমালঙ্ঘন করতে চায়। আল্লাহর লক্ষ্য তাঁর বান্দাদের কর্মফলকে ইহকালে প্রদান ক'রে তাদের জন্য পরকালকে কণ্টকমুক্ত ক'রে রাখা :

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

www.pathagar.com

ইহকাল এবং পরকালকে একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে আল্লাহ্ কোনো বিশেষ মুহূর্তে কাউকে যা কিছু দিয়েছেন, সেই মুহূর্তে তার জন্য তাই সর্বোচ্চ মঙ্গলের, তার মন সে-ব্যাপারে যা-ই বলুক না কেন। মানুষের লাগামহীন কামনা অনুসারে জগৎটা চললে তা তার জন্যেই ক্ষতিকর হতো :

> মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।
>
> (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

> তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

> সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

বস্তুতপক্ষে, মানুষকে তার কর্মফল ছাড়া আর কিছুই আস্বাদন করানো হয় না আর চেষ্টা, উদ্দেশ্য, কাজের ধরণ, যোগ্যতা সবই তো কর্মফলের রচয়িতা, নয় কি? :

> আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং **ওদের কৃতকর্মের ফলে** ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত ৩৬)

এতকিছুর পরও আল্লাহ্ সমাজে অর্থব্যয়ের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহকে সচল রাখার তাগিদ দিয়েছেন, যেন কর্মফল ভোগ করা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহানুভূতির মাধ্যমে সবাই সচ্ছলতা লাভ করতে পারে :

> বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে, এবং যে অভাবগ্রস্ত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা অপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ্ অভাবের পর সচ্ছলতা দান ক'রে থাকেন।
>
> (সূরা তালাক, আয়াত : ৭)

> হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। **আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে তা থেকে ব্যয় কর–মৃত্যু আসার আগে,** নইলে মৃত্যু আসলে সে বলবে–হে প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য সময় দিলে আমি দান করতাম, এবং সৎশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ্ কাউকে সময় দেন না। (সূরা মোনাফেকুন, আয়াত : ৯-১১)

এর পরও স্বাভাবিকভাবেই সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ থাকবে, যার ওপর ভিত্তি ক'রে সৃষ্টি হবে কাজের শ্রেণীভেদ। এতে পৃথিবীর কাজকর্মে সুবিধা হয়। আজ পশ্চিমা বিশ্বে কাজের লোক নেই ব'লে—তারা সবাই ধনী ব'লে—আমাদের মতো গরিব দেশ থেকে তারা শ্রমিক নেয়। তোমার যে ভাইটা একটা ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা

www.pathagar.com

ছিল, সেও তো গত বছর রাজনীতি ছেড়ে ইটালি গেছে। তোমাদের তো পয়সার তেমন অভাব নেই। অথচ তার পরও একজন গরিব যেখানে যেতে পারত সেখানে সে যেতে পেরে তো খুশিই হলো। গরিব না হয়েও সে গরিব সেজেছে। এক্ষেত্রে তুমি কী বলবে?

সে চুপ ক'রে রইল।

আমি ব'লে চললাম : আসলে আমাদের প্রত্যেককে অপরের ওপর হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে—একটা সীমার মধ্যে। এতে উভয় পক্ষেরই পরীক্ষা হয়ে যায়—যে অত্যাচারিত হয় তার এবং যে অত্যাচার করে তারও। কিন্তু অত্যাচারিত যদি ধৈর্য ধারণ করে এবং সহজে পাল্টা অসদ্ব্যবহার না করে, এবং ভালোবাসার পথে অটল থাকে, তাহলে সবকিছুই তার পক্ষে যাবে—হয় অত্যাচারী তওবা ক'রে পথে ফিরে আসবে, না হয় আল্লাহ অন্য কোনো উপায়ে তাকে নিবৃত্ত করবেন, না হয় অত্যাচারিত ব্যক্তির দ্বারাই আল্লাহ তাকে সীমালঙ্ঘনের পর শায়েস্তা করবেন। আমরা স্বাধীনতার সম্মান ভোগ করছি ব'লে এটুকু ধৈর্যের খেসারত আমাদেরকে দিতে হবে, এবং তার বিনিময়ও পাওয়া যবে—ইহকালে ও পরকালে :

> এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা **ধৈর্যশীল**; এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ৩৫)

> আমি আজ তাদেরকে তাদের **ধৈর্যের** কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলাকাম হলো। (সূরা মু'মিমূন, আয়াত : ১১১)

> কেউ **ধৈর্য ধারণ করলে** এবং ক্ষমা ক'রে দিলে তা বীরত্বের কাজ।
> (সূরা শুরা, আয়াত : ৪৩)

> ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ঠ দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল; এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর স্মরণ নেবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ্‌, আয়াত : ৩৪-৩৬)

> যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর **পূর্ণ আস্থা** রাখুক। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

মানুষের শ্রেণীভেদ হলো কাজের শ্রেণীভেদ। ঠিক যেন মিল-কারখানার মতো : সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন কাজ করে এবং কাউকে খারাপ কাউকে ভালো বলা হয় না। যে জুতোর জিহ্বা বানায় তার কাছ থেকে ফিতার হিসাব নেয়া হয় না; যে-ব্যক্তি জুতোর সোল বানায় তার কাছে রঙ-পালিশের হিসাব চাওয়া হয় না। কাজের শ্রেণীভেদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার স্তরভেদ ছাড়া 'অন্য অর্থে' ভালো-মন্দের স্তরভেদ ব'লে কিছু নেই। ইহকালে তো শ্রেণীভেদ খুব কম, পরকালে শ্রেণী থাকবে আরো অনেক বেশি। সেখানেও তা হবে ইহকালের কাজ অনুসারে, যা প্রত্যেককে মেনে নিতেই হবে।

www.pathagar.com

লক্ষ্য কর কিভাবে আমি ওদের একদলকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি; **পরকাল নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।** (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ২১)

তোমরা তো সাম্যবাদে বিশ্বাসী, শ্রমিকসংগ্রামে বিশ্বাসী। তোমাদের নেতারা কি কোনোদিন শ্রমিক ছিল? বরং তোমাদের নেতাদের এত অহংকার যে তারা নিজেদেরকেই মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ব'লে দাবি করে।

বন্ধুটি বলল : যেসব শিশু মারা যায় তাদের আয়ু নির্ধারিত ছিল?

হ্যাঁ। হাদিসে তো বলাই হয়েছে যে শিশুরা বেহেস্তে যাবে। শুধু তাই নয়, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যার দুটো শিশু সন্তান মারা যায়নি, আমি তাকেই আটকুরো বলি,' কারণ তাদের উছিলায় তাদের বাবা-মা বেহেস্তে চ'লে যাবে। এখানেও, প্রকৃত অর্থে, সময় দ্বারা পরিমাপিত আয়ু পূর্বনির্ধারিত নয়। পূর্বনির্ধারিত হলো কিছু শর্ত—যদি এরূপ হয়, তাহলে তার ফল এরূপ হবে, এবং তার পারলৌকিক ফল হবে এরূপ। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে যে যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে ওযু না করে এবং কমপক্ষে বিসমিল্লাহ ব'লে মিলন শুরু না করে, তাহলে ঐ মিলন থেকে যে সন্তান জন্মাবে তার ওপর ইবলিসের প্রভাব দৃঢ় হবে। এই বিধানটাই পূর্বনির্ধারিত। তোমার এইডস থাকলে তোমার সন্তানেরও এইডস হবে—এটাই তো নিয়ম। তখন তোমার সন্তান এইডসে মারা গেলে তুমি কি বলবে যে আল্লাহই তার আয়ুকে ক্ষুদ্র ক'রে পাঠিয়েছিলেন? আসলে আল্লাহ নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন তার মোট জীবনীশক্তি—যা ক্ষয় হতে পারত ৫০০ বার জ্বর হবার মাধ্যমে, তা ক্ষয় হয়ে গেল ১ বার এইডস হয়ে। এইডস হলে যা হবার কথা তা হয়েছে কি না সেটাই দেখবার বিষয়। তুমি অপরাধ করবে, অথচ তোমার অর্থ-সম্পদ সন্তান মান-মর্যাদা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তা কী ক'রে হয়? তুমি তো সে-সবের কারণেই আল্লাহকে ভুলে থাক, এ কারণে তোমার কর্মফল সে-সবের মধ্যে প্রবেশ ক'রেই তোমার কাছে শাস্তি ও পরীক্ষা হয়ে ফিরে আসে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে তিনি মানুষের শাস্তি এবং পরীক্ষাকে তার সন্তান-সন্ততির জীবন-মৃত্যুর মধ্যেও প্রবিষ্ট করেছেন যুগে যুগে। ফেরাউন তৎকালীন ধার্মিকদের কন্যাসন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রেখে পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করত। তা কি আল্লাহ করতেন? আল্লাহ নিজে যা করেন, তার জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে কেন? মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার জন্য যা সে আল্লাহর অবকাশের সুযোগ নিয়ে নিজে করে। কোরআনে বলা হয়েছে যে পরকালে শিশুকেও জিজ্ঞাসা করা হবে কারা তাকে হত্যা করেছিল এবং কেন। তোমার সবকিছু আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত—এবং এই বিধানই পূর্বনির্ধারিত, **সময়-পরিমাপিত আয়ু** নয়। আল্লাহ মানুষের দ্বারাই মানুষকে পরীক্ষা করেন ও শাস্তি দেন। কোরআনে বলা হয়েছে যে ফেরাউন ছিল তার জাতির পরীক্ষাস্বরূপ।

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীস্টান-বৈরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৪০)

www.pathagar.com

তবুও আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল। এ কারণে তিনি তোমার শাস্তির বা পরীক্ষার জন্য সন্তানের 'অকালমৃত্যু'র সুযোগ ক'রে দিলেও সেই সন্তানের প্রতি কোনো অবিচার করবেন না—তাকে তিনি বেহেস্তেই স্থান দেবেন। কারণ তার তো কোনো দোষ ছিল না, সে তার জাতিগত অভিশাপের শিকার। আল্লাহ তার পরীক্ষা, শাস্তি, অভিশাপকে সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে বিস্তৃত ক'রে দেন। এটা ইহকালের ফলশ্রুতি। জাতি খারাপ হওয়ার কারণে ঐ জাতির কোনো ভালোমানুষকেও সে শাস্তির ভাগ নিতে হবে—কারণ সে নিজে ভালো হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে ভালোর পথে আহ্বান করেনি। তবে তার পরকালের বিচার হবে তারই আমলনামা অনুসারে। সে ভালো কাজ করলে বেহেস্তেই যাবে। মানুষের দায়িত্ব এবং অস্তিত্ব সামাজিকভাবে দলীয়—সে একা বাঁচতে পারে না; এ কারণে তার সমাজের যন্ত্রণার ভাগ তাকেও নিতে হবে, যেভাবে সে তার সমাজের সুখের ভাগও পার্থিব নিয়মে পেয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট ক'রেই বলা হয়েছে যে তা দ্বারা তার পরকাল বিঘ্নিত হবে না। মানুষের কর্ম, শাস্তি, পরীক্ষা, অস্তিত্বের এরূপ 'জাতীয়করণ' মানুষেরই মর্যাদা এবং দায়িত্বের ব্যাপ্তির কারণেই প্রতিষ্ঠিত—প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে তার গোষ্ঠী/জাতির আর সব মানুষের প্রতিবিম্ব। কারণ তাদের জন্মগত উৎস এক। আর সার্বিক অস্তিত্বের লড়াইয়ের পরীক্ষা পার্থিব নিয়মে গোটা জাতির জন্যই কার্যকর। আল্লাহ রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত জাতিকে পরীক্ষার এক-একটি 'একক' হিসেবে বিবেচনা করেন :

> প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে; যখন তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন তারা তাকে এক ঘণ্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, কিংবা তারা তা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৪)

> প্রত্যেক যুগের জন্য রয়েছে একটি ধর্মগ্রন্থ (যা আমি অবতীর্ণ করেছি)।
> (সূরা রা'দ, আয়াত :৩৮)

> আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম পদ্ধতি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি, যা তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। তুমি সরল পথেই আছ। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬৭)

> তারপর তাদের পর অসৎ বংশীয়েরা উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যারা নামায নষ্ট করেছিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল; ফলত তারা অচিরেই শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।
> (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৫৯)

> তিনিই 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন; এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও—কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেননি। এবং এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন; ওরা ছিল অতিশয় অত্যাচারী, অবাধ্য। তিনিই লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে শূন্যে উত্তোলন ক'রে নিক্ষেপ করেছিলেন। সর্বগ্রাসী শাস্তি ওকে আচ্ছন্ন করল। ... কেয়ামত আসন্ন। আল্লাহ ছাড়া কেউই তা ঘটাতে সক্ষম নয়। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং

www.pathagar.com

হাসিঠাট্টা করছ? ক্রন্দন করছ? তোমরা তো উদাসীন। অতএব তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁরই উপাসনা কর। (সূরা নাজম, আয়াত : ৫০-৬২)

ওরা কি পৃথিবীকে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত ওদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ওদের চেয়ে শক্তি এবং কীর্তিতে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। (সূরা মুমিন, আয়াত : ২১)

গোটা কোরআন এরূপ আয়াতে ভরপুর। তবে এই যুগে মিলিত হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। মিশ্রিত হয়ে গেছে সব ধরনের রক্ত এবং বৈশিষ্ট্য। ফলে এখন বিশেষ কিছু আচরণ বিশেষ কোনো জাতির লোক ক'রে থাকে এমনটি নয়। এখন স্বভাবের বৈচিত্র্য বেশি। ফলে জাতি-বিশেষের জন্য বিশেষ ধর্মগ্রন্থ বা সতর্ককারী পাঠাবারও দরকার এখন নেই। এখন সব জাতিই 'আন্তর্জাতিক'। একথা আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখও করেছেন :

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম।
(সূরা ফোরকান, আয়াত ৫১)

তিনি তা কেন পাঠাচ্ছেন না, কেন যে মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী, তার প্রতি সুচারুরূপে নির্দেশ করার জন্যই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ একথাটা এভাবে বলেছেন।

আসলে আল্লাহ্ সবকিছু আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছেন এবং *'যদি এরূপ হয়, তাহলে তার ফল এরূপ হবে'—এই চলতি কর্মফলের বিধানও* সেই পূর্বনির্ধারণের একটা বিধি। এই বিধিই কোরআন। এর বাইরে দৃশ্য-অদৃশ্য জগতে কিছু নেই। কোরআনের রহস্য আমি নিজেই জানি খুব কম—যেটুকু জানি তা বর্ণনা করতেও ছাপানো কাগজের দশ হাজার পৃষ্ঠারও বেশি লাগবে। সুতরাং এ ব্যাপারে কথা বাড়াতে চাই না। **মুসলমানের আসল হলো পরকাল।** এটাকে গৌণ ক'রে দেখলে ইহকাল নিয়ে এরকম লক্ষ লক্ষ প্রশ্নও জাগবে। যদিও তোমার যে-কোনো প্রশ্নেরই জবাব আছে, তবুও সব প্রশ্নের জবাব সবাইকে দেয়াও নিষেধ।

তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, সুতরাং **যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না,** তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। এ নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।
(সূরা নহল, আয়াত : ২২-২৩)

পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান তো নিঃশেষিত হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং ওরা অন্ধ। (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৬৬)

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপূর্ণ হও, (তাহলে চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। যেন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে

www.pathagar.com

দেই (তোমরা কিভাবে জীবন লাভ করেছ এবং কিভাবে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হবে)। আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা নিজ নিজ যৌবনে উপনীত হতে পার। তোমাদের মধ্যে (শিশু অবস্থায়) কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা ভুলে যায়।

(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫)

বস্তুত যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে। ওরা কি ওদের সামনে ও পেছনে যে আসমান ও জমিন আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদের সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেব অথবা ওদের ওপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাবে; আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি দাসের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

(সূরা সা-বা, আয়াত : ৮-৯)

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

দেখ বন্ধু, আসল সমস্যা হলো সন্দেহ। আর পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত সন্দেহ যেমন ঘুচবে না, তেমনি মাথা নত ক'রে শরীয়ত অনুসারে না চললেও সব জ্ঞান পাওয়া যাবে না। **নামাজে দাঁড়ালে মনের মধ্যে গাদা-গাদা প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এটাই প্রমাণ করে যে আমাদেরকে জ্ঞানী হতেই হবে। প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে। নামাজের মধ্যকার প্রশ্ন যেমন মনের আত্মচেতনার স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র তুলে ধরে, তেমনি তা মনকে জ্ঞানের লক্ষ্যেও ধাবিত করে।** জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক (ফরজ) ক'রে দেয়া হয়েছে। এই আবশ্যকতারও অবশ্য শ্রেণীভেদ আছে। তুমি কোরআন পড়তে শেখনি বললে পরকালে কোনো লাভ হবে না। অন্য দিকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করেও তো তা শিখতে পারতে। আবার তোমাকে জগতের সমস্ত জ্ঞান অর্জন করারও দরকার হবে না—সে উদ্দেশ্যে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরকে সেখানে পৌঁছে দেয়া হবেই। জীবনের সবকিছু ত্যাগ ক'রে হলেও তারা সেখানে পৌঁছে যাবে। অনেক দরিদ্র অলি আছেন যাদেরকে তুমি এদেশের প্রধানমন্ত্রীও বানাতে পারবে না। অথচ তাঁদের জ্ঞানের সুফল সব ইমানদাররাও পরকালে এবং ইহকালে পাবে। কোনো অবিচার নেই। আউলিয়াদের হৃদয়কে এমন ক'রে দেয়া হয় যে তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যই বেঁচে থাকেন—আমাদের মঙ্গলের জন্যই নামাজ পড়েন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছিলেন যে তিনি বেঁচে ছিলেন কেবল মুমিনদের স্বার্থে। কাউকে কোনো জ্ঞান বা যোগ্যতা দেয়া হয়েছে—এর মানে এটাই যে সে-জ্ঞান এবং যোগ্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। তাতে যার যে ভাগ আছে পরকালে তার কাছে তা ঠিকই পৌঁছে যাবে। মনে রেখ, তুমি না বুঝলে কী হবে, এমনও ব্যক্তি আছেন যাদেরকে এই বণ্টনপ্রক্রিয়া সরাসরি চক্ষুসভাবেই দেখানো হয়। একথা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) নিজেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ব'লে গেছেন। **অদৃশ্যে অবিশ্বাস হলো কোরআনে**

www.pathagar.com

অবিশ্বাস। পবিত্র কোরআনের শুরুতেই সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যেই একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই কোরআন তাদের জন্যেই পথপদর্শক যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।

যাহোক, **চেতনা হলো বাস্তবতার মানসিক প্রতিচ্ছবি। চেতার সাথে আত্মচেতনার দূরত্ব যতটুকু, ব্যক্তি-মনে উক্ত বাস্বতার বা সত্যের তথা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসও ততটুকু। কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনিই পরম বাস্তবতা।**

... আল্লাহ—তিনিই পরম বাস্তবতা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬২)

নামাজের রহস্যময় টাইম-মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই নামাজী এই চেতনা এবং আত্মচেতনার দূরত্বের মধ্যে প'ড়ে যায়। নামাজে মনোযোগ/আত্মচেতনা যত বেশি নিবদ্ধ হয়, এই দূরত্ব তত কমে এবং এভাবে নামাজী পরম বাস্তবতার দিকে এগুতে থাকে।

তার ভাগ্যে মে'রাজ জুটে যায়।

প'ড়েই দ্যাখ না নামাজ, একদিন।

সে বলল—কোটি কোটি লোকই তো পড়ে।

বললাম—সবাইকেই নামাজ ভালোভাবে পড়তে বলা হয়েছে।

সে এবার আগ্রহী হয়ে প্রশ্ন করল—বললে না যে আমরা কোত্থেকে কোথায় এসেছি?

বললাম—তা তো কোরআন-হদিসেই বলা আছে। আমি কথাগুলো বলেও দিয়েছি।

কিন্তু স্পেস-টাইমেরই যখন কোনো কনক্রিট অর্থ নেই, তখন কোথা থেকে কোথায় এলাম তা স্থান বা সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মেপে বললে কি কোনো বিশেষ লাভ হয়?

তার আগ্রহ বেড়েছে দেখে বললাম—হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ অদৃশ্যের বা গয়েবের ভাষায়, এই ভ্রমণ এবং ফেরত ভ্রমণের বিশেষ কিছু দিক বা অর্থ আছে, যার একটা রহস্যময় সত্য আমি তোমাকে বলব। এ এমন এক সত্য যা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না, কিন্তু কারো কাছ থেকে শুনে এর প্রকৃত অর্থের কিছুটা বোঝার জন্য বিশেষ আমল না থাকলেও চলে। এরূপ সত্য স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনই করুণা ক'রে তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে শেখান—কোনো পুস্তক-পুঁথি প'ড়ে বা বাহ্যিক ইল্‌ম অর্জন ক'রে এ জানা যায় না, ইসলামী শিক্ষায় বড় পাশ দিলেও না, যদি না হৃদয়টাকে পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছ কথাটা তোমাকে কতটা গুরুত্বের সাথে শুনতে হবে।

আসলে, স্পেস-টাইমকে আতিক্রম ক'রে বলা যায় যে আমারা সবাই কোনো দূর থেকে দূরে আসিনি, আমরা ...

সে আগ্রহের সাথে তাকিয়ে রইল।

www.pathagar.com

... আমরা ভেতর থেকে বাইরে এসেছি।

সে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে ভাবল। তারপর আবারও আগ্রহের সাথে তাকাল।

ব'লে চললাম : আমাদের জন্মের সময়ে আমাদের চেতনা বা Consciousness-এর একটা ধারা থেমে গিয়েছিল এবং একটা ধারা শুরু হয়েছিল। একে তুমি তোমার আমিত্বের দুটো পর্যায় বলতেও পায়। জন্মে যা শুরু হয়েছিল—এই দেহ, মন, কর্ম, শিক্ষা ... মৃত্যুতে তা শেষ হয়ে যাবে। এবং জন্মের সময়ে যা থেমে গিয়েছিল, মৃত্যুর সময়ে তা আবার শুরু হবে। ফলে গোটা জীবনের বাহ্যিকতাকে আমরা ত্যাগ ক'রে যাব—আমাদের সাথে যাবে, অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে যে-পর্যায় শুরু হবে তার সাথে মিশে যাবে, সেই আমল বা কাজের ফল যা আমরা আজীবন ধ'রে করেছি। আসলে তা সাথে যাবে বলাও ঠিক নয়, তা আগেই পৌঁছে যায়। জন্মের সময়ে আমরা ভেতর থেকে বাইরে এসেছিলাম—অর্থাৎ আল্লাহর শ্বাশ্বত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটা সুষম সমন্বয় এবং একটা অঙ্গীকার যা দেখা ধরা ছোঁয়া যায় না, নিয়ে এসেছিলাম, কারণ সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আল্লাহ প্রকাশ করেছিলেন—এবং মৃত্যুর সময়ে এই প্রকাশ্য দেহ ফেলে রেখে এমনভাবে এখান থেকে চ'লে যাব ঠিক যেন আবার বইরে থেকে ভেতরে চ'লে যাব এবং, মজার ব্যাপার হলো, তখন থেকে এই 'ভেতরটাই' 'বাহির' ব'লে গণ্য হয়ে সমগ্র নতুন বাহ্যিকতায় রূপান্তরিত হবে।

এখান থেকে কী যাবে? ধরা, ছোঁয়া, আস্বাদন করা যায় এমন কিছুই না। যাবে সেই উদ্দেশ্য (নিয়ত), ভালোবাসা, ক্রোধ, হিংসা, ত্যাগ, ধৈর্য ইত্যাদি বিমূর্ত বা abstract বৈশিষ্ট্য যা আমরা আল্লাহর গুণাবলীর উছিলায় সেগুলির সাথেই কর্মের মাধ্যমে মিশিয়ে দিয়েছি। এটা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে মৃত্যুর সময়ে, যদিও তখন আর ছটফট ক'রে কোনো লাভ হবে না।

> ... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।
> (সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

> যখন ওদের কারে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠাও, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি।—না এ হবার নয়। এ তো আর একটা উক্তিমাত্র। ওদের সামনে পর্দা থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ৯৯-১০০)

রহস্যের পর্দা ছিড়ে যাবে, ফলে ধরা পড়বে একদিনের জ্ঞানের দারিদ্র্য, কিন্তু ইমানের পর্দা থাকবে চিরকাল, ফলে বেইমানের শতবার জন্ম হলেও সে ইমান বা বিশ্বাস ফিরে পাবে না কোনোদিন।

জন্ম শুরু হয়েছিল অদৃশ্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা—তা প্রকাশ পেয়েছিল দৃশ্যজগৎ রূপে; আর মৃত্যুতে প্রকাশ্য জগৎ পরিত্যক্ত হয়ে এখান থেকে অবশিষ্ট এবং অক্ষত থাকবে

www.pathagar.com

কিছু অদৃশ্য শক্তি বা পাথেয় যা আল্লাহর গুণাবলীর সাথে মিশে মৃত্যুহীন হয়েছে, এবং সেগুলোর মর্যাদা অনুসারে গ'ড়ে উঠবে নতুন প্রকাশ্য ভুবন। সুতরাং তুমি যদি এখন নামাজ না পড়, ভালো কাজ না কর, দান না কর, ধৈর্য না ধর, তাহলে বাইরে থেকে তুমি কী পাঠালে যা হবে পরবর্তী জীবনের ধারক ও বাহক?

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে **আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে।** (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে; তাহলে তিনি তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং তার জন্য মহাপুরস্কার আছে। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ১১)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান তো নিঃশেষিত হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং ওরা অন্ধ। (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৬৬)

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপূর্ণ হও, (তাহলে চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। যেন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই (তোমরা কিভাবে জীবন লাভ করেছ এবং কিভাবে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হবে)। আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা নিজ নিজ যৌবনে উপনীত হতে পার। তোমাদের মধ্যে (শিশু অবস্থায়) কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা ভুলে যায়। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫)

এই পার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

তাহলে এখন থেকে ভেতরটার দিকে নজর দেয়া চাই। **নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত—এগুলো হলো ভেতরটাকে মজবুত করার উপায়।** এখানে ভোগ-বিলাসিতা যাই করবে, তার কুফল সাথে নিয়ে যেতে হবে অথচ তার উপভোগের শান্তি এখানেই পরিত্যক্ত হবে। আল্লাহ বলেছেন—আল্লাহ জানেন ওরা যা আগে পাঠায় এবং যা পেছনে রেখে যায়। এমন দুর্ভাগ্য তুমি সজ্ঞানে বেছে নেবে? তাহলে পবিত্র কোরআনের বাণী শোনো :

তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত **হিমশীতল বায়ুর মতো, যা যে-জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে।** আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত : ১১৭)

www.pathagar.com

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।
(সূরা শোয়ারা, আয়াত : ১২৯)

নারী, সন্তান, বাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর ও লোভনীয় করা হয়েছে–এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ–তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল রয়েছে।
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে তা থেকে ব্যয় কর–মৃত্যু আসার আগে, নইলে মৃত্যু আসলে সে বলবে–হে প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য সময় দিলে আমি দান করতাম, এবং সৎশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে সময় দেন না। (সূরা মোনাফেকুন, আয়াত : ৯-১১)

দ্যাখ বন্ধু, আগেই বলেছি যে তোমার আমিত্বের আছে দুটো স্তর। নামাজে তোমার আমিত্বের এই দুটো স্তরের মধ্যে জোড়াতালি লাগানোর কাজ ঘাটে। নামাজ যদি তুমি না পড়, তাহলে, এমনকি এই জীবনে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করলেও, মৃত্যুর সময়ে দেখবে যে তুমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছ, কিছুই তোমার আয়ত্তে থাকছে না।

তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ুর মতো, যা যে-জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।
(সূরা আল্-ইমরান, আয়াত : ১১৭)

যেদিন আকাশ মেঘাপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

তখন তোমাকে আল্লাহর কাছে ফেরত যেতে হবে। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্যই তখন হবে তোমার জন্য দোজখ। একই ঘি—মানুষ খেয়ে হজম করে অথচ কুকুরে খেয়ে তা হজম করতে পারে না। আল্লাহর সান্নিধ্যই বেহেস্ত, তাঁর সান্নিধ্যই দোজখ। দোষ তাঁর নয়, তোমার। তুমি এখন একটা মোটা জামা পরেও শীতে কাঁপছ, অথচ সাইবেরিয়া থেকে কোনো লোক এখানে এলে সে খালি গায়েও ঘামবে। তাহলে তুমি দোষ দেবে কাকে? এই আবহাওয়ারূপ বাস্তবতাকে নাকি তোমার দেহকে, যে এই আবহাওয়া থেকে তৃপ্তিটুকু নেয়ার জন্য উপযুক্ত হয়নি?

আল্লাহই পরম বাস্তবতা। পরকালের বাস্তবতা ইহকালের আপেক্ষিক বাস্তবতার মতো অসম্পূর্ণ হবে না। তা হবে পরিপূর্ণ। তাতে কোনো মাত্রাঘাটতি থাকবে না।

www.pathagar.com

এখানকার আপেক্ষিক বাস্তবতায় ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা আছে, কিন্তু সেই বাস্তবতায় ডুয়ালিটি ব'লে কিছু থাকবে না, এবং ফলে থাকবে না কোনো আত্মবিরোধ। ফলে সেই বাস্তবতায় প্রবেশ করা মাত্রই সবকিছু দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে—ভালো, মন্দ। ভালোর কৃতিত্ব ভালোর প্রাপ্য, খারাপের দোষ খারাপকেই বহন করতে হবে। কারণ বাস্তবতায় কোনো ঘাটতি নেই।

সেইদিনই আল্লাহর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে। তিনিই ওদের বিচার করবেন। (তাঁর কর্তৃত্বের শক্তিতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের আমিত্বের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটবে, এবং ফলে সবাই যার যার কাজ অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে যাবে।) (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৬)

(এবং বলা হবে) হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৫৯)

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (যারা পৃথিবীতে তাদের কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছে, ধর্মের মহাজাগতিক, শাশ্বত বিধান মেনে চলেনি, তাদের কাজ দ্বারা পরকালের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতায় কোনো ফাটল বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না ব'লে তারা নিজেরাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে—এমনকি প্রত্যেকে নিজের সাথেই বিরোধিতা করবে, যা কোরআনে বলা হয়েছে।) (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়।
(সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।
(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।
(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

তোমরা অবিশ্বাসী হলে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন—তিনি তাঁর সেবকগণের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৭)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

সেখানে একজন ভালো আমলের ব্যক্তি একটা আঙুর খেয়ে অমৃতের স্বাদ পাবে, অথচ একই আঙুর একজন খারাপ আমলের লোক খেতেই পারবে না—তার গলায় আটকে যাবে, কিংবা সে তা মুখে পুরামাত্রই তা পঁচা-গলা আবর্জনায় রূপান্তরিত হবে। দোষটা আঙুরের নয়, মুখের। ফলত বিভক্ত হয়ে যাবে তাদের আবাসস্থলও। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

www.pathagar.com

তোমার আমিত্ব দুটি মাত্রায় ভাগ হয়ে গেছে বলেই তোমার মানে প্রশ্ন জাগে 'আমি কে?'—অথচ দুই 'আমির' মিলনবিন্দুতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি কোনো সঠিক উত্তরও পেতে পার না। নামাজ এই মিলন বিন্দুতে তেমাকে পৌঁছে দেবে। তোমার ভেতরের 'আমি' আল্লাহকে চেনে। তাঁর সাথে মিলতে পারলেই আল্লাহর সাথে মিলনের পথ খুলে যায়। এ কারণে নামাজ হলো মুমিনের মেরাজ। তুমি কি আকাশ ভ্রমণে যেতে চাও না?

তোমার নামাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার দুই 'আমি'র মধ্যে দূরত্ব রয়ে যাবে, মনে ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা রয়ে যাবে, সন্দেহ রয়ে যাবে—মৃত্যুর সময়ে সে তোমাকে বিকর্ষণ করবে, তখনও তোমার আত্ম-চেতনা তোমার চেতনার সাথে মিলতে পারবে না, এবং তুমি নিজেকেও পবে না আল্লাহকেও পাবে না। মনে রেখ, রসুল (সঃ) বলেছেন :

যে নিজেকে জেনেছে, সে আল্লাকে জেনেছে।

মনে রেখ, দোজখের আগুনে পুড়বে তোমার আত্ম-চেতনা, এবং চেতনাই তার দোজখ। তোমার বেহেস্ত দোজখ তুমিই রচনা ক'রে থাক :

তোমরা অবিশ্বাসী হলে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন—তিনি তাঁর সেবকগণের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৭)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা **নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে।** (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২)

যে কেউ খারাপ কাজ করবে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে, এবং ওদেরকে বলা হবে **তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল** তোমরা ভোগ করছ।
(সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৯০)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে **নিজেদের জন্যে** এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে **নিজেদের জন্য।** (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর **আমার দয়া**—তা তো **প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।** (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

www.pathagar.com

বল—তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭৭)

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা **নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।**
(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? (সূরা রহমান, আয়াত : ৬০)

আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

আল্লাহ্ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যান্য আচরণ করেন না।
(সূরা আনফাল, আয়াত : ৫১)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

তারা **আল্লাহকে** ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী; যারা সৎকাজ করে **তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে সুখসয্যা। কারণ** যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে **আল্লাহ্** তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (সূরা রুম, আয়াত : ৪৪-৪৫)

তারা অন্যদেরকে এ (কোরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং নিজেদেরকেও; কিন্তু তারা **শুধু নিজেদের আত্মাকেই ধ্বংস করে,** কিন্তু তারা তা বোঝে না।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ২৬)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

এখানে তুমি যে আমিত্ব নিয়ে বড়াই করছ, সীমালঙ্ঘন করছ, সেখানে তাই-ই তোমার যন্ত্রণার কারণ হবে।

নামাজ বেহেস্তের চাবি। তোমার চাবি তোমাকেই দেয়া হয়েছে। তুমি তা হারিয়ে ফেললে কে তোমাকে তা ফেরত দেবে? আল্লাহ্ তো তোমাকে তা দিয়েই দিয়েছেন। তুমি তাঁর দোষ দাও কেন? তিনিই তো তোমার বেহেস্ত। তিনি তো সেখানেই তোমাকে ডাকছেন : গোটা কোরআনটাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান। তিনি তো ঘোষণাই করেছেন–কেউ কি আছে যে আমাকে উত্তম ঋণ দেবে, যার উত্তম প্রতিদান আমি দেব পরকালে?

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ্ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৭)

www.pathagar.com

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে; তাহলে তিনি তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং তার জন্য মহাপুরস্কার আছে। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ১১)

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরুস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? (সূরা রহমান, আয়াত : ৬০)

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া এবং উদারতায় ভরপুর, তবুও অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬১)

মনে রাখাবে, মৃত্যুর সময়ে সর্বপ্রথম তোমার দেখা হবে ...

কার সাথে?

বল তো কার সাথে?

কী জানি।

তোমার নিজের সাথে!

প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সময়ে নিজের সাথে দেখা হয়ে যাবে। মানুষের আজীবনের প্রশ্ন—আমি কে? মৃত্যু তাকে এর জবাব দেবে। কিন্তু জবাবটা যদি অনুকূল না হয় তাহলে তা হবে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

আবারও বলছি, তুমি সারাজীবন যে-সব কাজ করেছ, গোপনে বা প্রকাশ্যে, তা তোমার লুকানো সত্তায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে। মৃত্যুর সময়ে এই কর্মফলের সাথে তোমার দেখা হবে। কবরে গিয়েও তোমার কর্মফলের সাথে তোমার দেখা হবে। তুমি গভীর অন্ধকারে কী করেছ তা কেউ না জানলেও তুমি নিজে ভালোভাবেই জান। তখন হিসাবটা খুব কঠিন হবে।

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

তবে তওবা কবুল হলে সবই ক্ষমা, এই শর্তে যে তওবার পর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭১)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন। (সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

... যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব, এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দেব। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৭)

www.pathagar.com

যারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে, তারা আগুনের সঙ্গী হবে তারা তাতে অবস্থান করবে (চিরকাল)। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

তাছাড়া বিচারদিনে ফেরেস্তাদের দ্বারা লিখিত আমলনামা দেখানো হবে। মৃত্যুর সময়ের অবস্থা যদি সহজ না হয়, তাহলে বিচার দিনে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়ানো তো আরো কঠিন হয়ে যাবে।

আমার সেই বন্ধু আর কোনো প্রতিবাদ না ক'রে না উদ্বিগ্নমনে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

সাত

মনের অন্ধকূপ

মাত্র চার-পাঁচ দিন পর আমার বন্ধু একদিন আমাকে কোনো এক বইয়ের মার্কেটে ধ'রে ফেলল। তাকে কিছুটা সময় দিতে হবে। তার কিছু প্রশ্ন আছে। আমরা দু'জনে একটা নির্জন জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। আমি তাকে প্রশ্ন করার উৎসাহ দিলাম।

১. চিন্তার দারিদ্র্য এবং স্বভাবের গোঁড়ামি

তার প্রথম প্রশ্ন : চিন্তা কেন আল্লাহকে পায় না?

চমৎকার প্রশ্ন করেছ—বললাম আমি—প্রশ্নটা যে তোমার মাথায় এসেছে এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি। শোনো তাহলে উত্তর।

আল্লাহ হলেন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা। এই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতায় নেই কোনো মাত্রা-ঘাটতি, নেই কোনো দ্বুয়ালিটি। ফলে তাতে আত্মবিরোধ ব'লে কিছু নেই। সেখানে সবকিছুই সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ সবকিছুই পারেন। কোরআনে তিনি স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন একথা। অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত এবং দার্শনিক প্রশ্ন করে—আল্লাহ কি নিজের চেয়েও বড় কিছু সৃষ্টি করতে পারেন?—এই প্রশ্নটারই কোনো অর্থ নেই। এই প্রশ্নটাই আল্লাহ সৃষ্টি ক'রে মানুষকে উপহার দিয়েছেন, মানুষ তার প্রশ্নের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে কতটুকু সচেতনতা দেখায় তা পরীক্ষা করার জন্য। এই প্রশ্নের স্পষ্ট গাণিতিক এবং যৌক্তিক উত্তর আমি দিয়েছি *'সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!'* এবং *'কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস এবং অলৌকিকের সান্নিধ্যলাভ'* নামক বই দুটোতে। এখনও কথাপ্রসঙ্গে কিছু স্পষ্ট প্রমাণ তোমাকে দেব, ইনশাল্লাহ।

পরম বাস্তবতায় দৃশ্য-অদৃশ্য, আগত-অনাগত, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সব বাস্তবতাই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহাবস্থানপূর্ণ। এই বাস্তবতা যে আগে ছিল বা এখান থেকে দূরে কোথাও আছে বা ভবিষ্যতে কোনোদিন গঠিত হবে, তা নয়। তা চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে; তার শুরু নেই, শেষ নেই। শুরু, শেষ, মৃত্যু এই ধারণাগুলো এই পরম বা Absolute বা ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবতা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩)

এই সৃষ্ট প্রকাশ্য বাস্তবতা ক্ষণকালের জন্য—তার সৃষ্টির ফর্মুলার মধ্যে ধ্বংসের প্রক্রিয়া নিহিত। এই ধ্বংস মানুষেরই কর্মফল এবং পরীক্ষা। এরই মাধ্যমে মানুষ আবার তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে। এরূপ সৃষ্টি-ধ্বংস দ্বারা শ্বাশ্বত বাস্তবতা প্রভাবিত হয় না। এই সৃষ্টি-ধ্বংসের কাজ চলে সুনির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী। মানুষের কর্মফলকে তার কাছে পাঠাবার আগেও শ্বাশ্বত বিধান অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ হয় পরিবর্তনশীল ভাগ্যনামায়। ফলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের ওপর যা পতিত হয় তা আসে আল্লাহর তরফ থেকে। মানুষ হলো ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতারূপ কুয়োর ক্ষুদ্র ব্যাঙ—তার লাফ কুয়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই আয়াতগুলো থেকে সেই ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতার অস্তিত্ব, তার সীমা এবং পরিণামের স্বরূপ জানা যাবে :

কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত।
(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে।
(সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। **এ জন্য যে**, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—**সম্ভবত** কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

... তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩০)

আমিই ... লিখে রাখি যা ওরা (মানুষ) **আগে পাঠায়** এবং যা পেছনে রেখে যায়।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১২)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (**নিজেদের এবং অপরের**) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

... আল্লাহ—তিনিই পরম বাস্তবতা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬২)

তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতি (ভারসাম্য)। (সূরা, রুম, আয়াত : ২৫)

কিভাবে সৃষ্ট হয়েছে?

সুন্দর প্রশ্ন। আমরা একটু আগেই বলেছি যে পরম বাস্তবতারই বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেনশান হলো দৃশ্য বাস্তবতা, অদৃশ্য বাস্তবতা, বর্তমান বাস্তবতা, ভবিষ্যত বাস্তবতা, জ্ঞাত বাস্তবতা, অজ্ঞাত বাস্তবতা ইত্যাদি। খেয়াল কর, এই বিভিন্ন মাত্রাবদ্ধ বাস্তবতার প্রত্যেকের **নিজস্ব শুরু এবং শেষ আছে।**

আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। (সূরা তালাক, আয়াত : ৩)

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্যস্তরে আরোহন করবে।(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১৯)

ধর কোনো একটা ঘটনাকে অদৃশ্য বাস্তবতা থেকে কোনো এক মুহূর্তে দৃশ্য বাস্তবতায় প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। তুমি মনে করলে যে সেখানে ঘটনাটা শুরু হয়েছে বা তার জন্ম হয়েছে। কারণ তুমি দৃশ্য বাস্তবতায় অবস্থান করছ। তোমার দৃশ্য বাস্তবতার ভাষা এবং যুক্তি অনুযায়ী তোমার কথা ঠিক আছ। কিন্তু তুমি নিজেও কিন্তু কেবলমাত্র দৃশ্য বাস্তবতার সৃষ্টি নও, তোমার অস্তিত্ব অদৃশ্য বাস্তবতাতেও বর্তমান, যা তুমি এই মুহূর্তে দেখছ না। ফলে তুমি যদি শুধু এটুকুই ভেবে ব'সে থাক যে ঘটনাটা এই মাত্র শুরু হলো, তাহলে তোমার যুক্তিতে মাত্রাঘাটতি রয়ে গেল, কারণ তুমি শুধু দৃশ্য বাস্তবতার মাত্রা দ্বারা তোমার যুক্তিকে যাচাই করেছ, অদৃশ্য মাত্রাকে হিসাবে নাওনি। এভাবে ঘটনাটা যখন শেষ হলো তখন তুমি ভাবলে যে তা সমাপ্ত বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু আসলে তার যে-নির্যাসটুকু অদৃশ্য বাস্তবতায় পৌঁছে যাবার কথা তা সেখানে পৌঁছে গিয়ে সেই নির্যাস বা essence আকারে রয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক যেন এমন যে, তুমি একটা আপেল খেলে, তোমার পাকস্থলী তার নির্যাসটুকু শোষণ ক'রে নিল, তার অশোষিত অংশ তুমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে ফেলে দিলে, দেহে শোষিত অংশ তোমাকে শক্তি দিল, সেই শক্তি দিয়ে তুমি অনেক কাজ করলে যার খারাপ বা ভালো ফল পৃথিবীতে রয়ে গেল, কিছু শক্তি তোমার দেহ থেকে নির্গত হয়ে প্রকৃতির শক্তিশৃঙ্খলে মিশে গেল ... ইত্যাদি। তুমি যদি আপেলটা খাবার দুই ঘণ্টা পর

www.pathagar.com

বলতে যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাহলে তা হতো বোকামি। তখন আমি বলতাম যে তুমি শুধু তোমার খাওয়ার এবং পেটের বাস্তবতার মাত্রাকে হিসাবে এনেছ, অন্যান্য অদৃশ্য মাত্রাকে হিসাবে আননি। একইভাবে, তুমি তোমার চিন্তা ও যুক্তি দ্বারা শুধু সেই পর্যন্তই পৌঁছাতে পার যেখানে সেই যুক্তি শুরু হয়েছিল। সেই পর্যন্ত চিন্তার সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। তবে তারপর আরো এগোতে হলে চিন্তাকেও অতিক্রম করতে হবে। তখন চোখ খুলে যাবে। কেবল তখনই সর্বপ্রথম প্রমাণিতভাবে জানা যাবে যে আল্লাহকে চিন্তা দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। কেন তা যায় না সে ব্যাখ্যাও তখন পাওয়া যাবে।

ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না।
(সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১০)

পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান তো নিঃশেষিত হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং ওরা অন্ধ। (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৬৬)

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ যে বাস্তবতায় যখন অবস্থান করে, তখন অন্য কোনো বাস্তবতার কথা সচরাচর স্মরণ করে না কেন? এর জবাব পেলেই আমরা এক শ্বাশ্বত সত্যে পৌঁছে যাব।

মানুষ এমন একটা সৃষ্টি যার সাথে দৃশ্য-অদৃশ্য, আগত-অনাগত সব মাত্রার বাস্তবতাই জড়িত। তার দেহ (এবং মনের কিছু অংশ) সংশ্লিষ্ট দৃশ্য এবং অতীত-বর্তমান মাত্রার সাথে; মনের এক বিরাট অংশ এবং রূহ সংশ্লিষ্ট অদৃশ্য দৃশ্য, আগত, অনাগত সব বাস্তবতার সাথে। ফলে মানুষের চেতনার বয়েছে বিভিন্ন স্তর— পূর্বচেতন, অবচেতন, চেতন। কিন্তু এই সবগুলো স্তরের সামগ্রিকতাকে আমরা বলছি চেতনা। তাহলে এই চেতনাতেই রয়েছে গোটা দৃশ্য-অদৃশ্য ... বাস্তবতা। কিন্তু মানুষের আত্ম-চেতনা বা self-consciousness, অর্থাৎ চেতনার সেই বিন্দুটা যা সেই চেতনার ওপর বৃত্তের মতো ঘুরে এসে আবার আপতিত হয়েছে, যা মূলত স্বাধীন ইচ্ছার খাপে ঢুকানো চেতনারই একটা প্রতিবিম্বমাত্র, তা প্রাথমিক স্তরে সক্রিয় থাকে প্রকাশিত বর্তমান মাত্রার মধ্যে। এই আত্মচেতনার আলো চেতনার যতটুকু জায়গায় আলো ফ্যালে, আমরা আমাদের চেতনাকে বা আমিত্বকে বা জ্ঞানকে ততটুকু ব'লে ধ'রে নেই। এই ধ'রে নেয়ার কাজটা ঘটে মস্তিষ্কে। যেহেতু আমাদের ধরে নেয়া না-নেয়ার ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, সেহেতু একথা সত্য যে আমাদের দেহ-মন ক্রিয়ারত থাকছে এমন কিছু মাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেগুলোকে আমাদের আত্মচেতনা এখনও খুঁজে পায়নি। এ কারণে আমাদের অনুভূতি, ইচ্ছা, স্বভাব, পছন্দ, অপছন্দ সবকিছু সামগ্রিক মাত্রার সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও আমাদের চেতনা তাদের কেবল দৃশ্য এবং বর্তমান মাত্রার প্রতিবিম্বটুকুকে খুঁজে পায় এবং তাদের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কেবল ভোগ-লালসা ক্ষুদ্র আমিত্ব ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেয়।

www.pathagar.com

সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। অর্থাৎ মানুষ এ ব্যাপারে বুঝতে না পারলেও তা জানবে তার আয়ু নামক ক্ষুদ্র সময়-ভ্রমণের প্রান্তে গিয়ে।

(সূরা আছর, আয়াত : ১-২)

তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

(সূরা শোয়ারা, আয়াত : ১২৯)

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ুর মতো, যা যে-জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

(সূরা আল্-ইমরান, আয়াত : ১১৭)

যারা নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে।

(সূরা আন্‌আম, আয়াত : ২০)

নারী, সন্তান, বাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট **সুন্দর** ও **লোভনীয়** করা হয়েছে–এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ–তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল রয়েছে।

(সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪)

আমাদের গোটা অস্তিত্ব—বা দেহ-মন রূহ—পরম বাস্তবতার সবগুলো মাত্রার সাথে জড়িত। কিন্তু আমাদের আত্মচেতনা জড়িত কেবল বর্তমান দৃশ্য মাত্রার সাথে। এই আত্মচেতনার পরিধির মধ্যে আমাদের চিন্তন (thinking) কাজ ঘটে। **ফলে আমরা আমাদের চিন্তার চরম সীমায় পৌঁছেও দেখি যে আমরা এখনও দৃশ্য বাস্তবতার বাইরে যেতে পারিনি।** পঞ্চেন্দ্রিয়, হৃদয় এসব দৃশ্য বাস্তবতার ফর্মুলা থেকে অদৃশ্যের সংযোগে সৃষ্ট হয়েছে। এদের মাধ্যমে দৃশ্য বাস্তবতাকে অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু এদেরকে অতিক্রম করার মাধ্যমে এদের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করা যায়, এবং তখন দৃশ্য বাস্তবতারও অতীতে পৌঁছানো যায়। কিভাবে এই ক্ষণস্থায়ী মানস-কাঠামোকে অতিক্রম করা যায়? তাদেরকে অতিক্রম করা যায় তাদের মাধ্যমে তাদের স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমে।

আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে নির্গত করেছেন— তোমরা কিছুই জানতে না। তিনিই তোমাদের কান, চোখ, ও **অন্তঃকরণসমূহ** দান করেছেন, **যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।**

(সূরা নহল, আয়াত : ৭৮)

ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না।

(সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১০)

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের স্বভাব, অনুভূতি এগুলোর সাথে সব মাত্রা জড়িত ব'লে এগুলো চিন্তাকেও অতিক্রম ক'রে যায়। চিন্তায় কোনো কাজ আমাদের কাছে ভালো মনে হতে পারে, অথচ স্বভাবের গোঁয়ার্তুমির কারণে আমাদের দ্বারা তা করা আদৌ সম্ভব না-ও হতে পারে, তা যে একটা ভালো কাজ একথা জানা সত্ত্বেও। **এভাবে স্বভাবের কাছে যুক্তি হেরে যায়।** কিন্তু যারা অহংকারী তারা তা বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝলেও **তাদের যুক্তিকে তারা তাদের স্বভাবের পক্ষে ব্যবহার করে** এবং এভাবে তারা বর্তমানমুখী ভোগবাদী স্বার্থপর নাস্তিক বা মোফেক হয়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে।

নামাজে আমরা আত্মচেতনা এবং স্বভাবের এই পার্থক্যের মধ্যে প'ড়ে যাই ব'লে মনকে কন্ট্রোল করতে পারি না।

> নিশ্চয়ই নামাজ অতি কঠিন কাজ, কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা বিনীত।
>
> (সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৫)

কিন্তু সুন্দরভাবে বেশি বেশি নামাজ পড়তে থাকলে আত্ম-চেতনার আংশিকতা বা খণ্ডত্ব বিলুপ্ত হয় এবং তা চেতনার সাথে মিশে ধীরে ধীরে অন্যান্য মাত্রার মাধ্যমে সামগ্রিক মাত্রায় পৌঁছে যেতে থাকে। এই পর্যায়ে প্রেমিক বান্দা আল্লাহর বন্ধু বা অলি হয়ে যান। তাকে প্রথমে দেয়া হয় আল্লাহর রহস্যের জ্ঞান বা মারেফত, ঠিক যেভাবে পরকালে এবং এমনকি মৃত্যুর সময়েও মানুষকে জানানো হবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য, যখন সে হা ক'রে তাকিয়ে দেখবে :

> ... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা **স্পষ্ট দেখছ**।
>
> (সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

তাকে এমন সম্মানও দেয়া হয় যেন তার সব বা অধিকাংশ ভালো দোয়াই কবুল হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় অলৌকিক হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, আল্লাহর সান্নিধ্যের জ্ঞান অর্জন করা এবং দোয়া কবুলের সম্মান পাওয়া। প্রকাশ্যভাবে কেরামতি দেখাতে পারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক কাজ নয়—এই ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ সাধনাও করা যায়; কিন্তু প্রকৃত প্রেমিকের কাছে সবচেয়ে বড় কাম্য হলো আল্লাহর সান্নিধ্য।

আল্লাহ হলেন পরম বাস্তবতা। ফলে আমরা চিন্তা দ্বারা তাকে বুঝতে পারি না, দৃষ্টি দ্বারা তাকে দেখাতে পারি না, কর্ণ দ্বারা তাঁকে শ্রবন করতে পারি না—কারণ এগুলোর উদ্ভব হয়েছিল কেবল বর্তমান প্রকাশ্য বাস্তবতায়, এবং এগুলো শাসিত হয় সংকীর্ণতাপূর্ণ আত্মচেতনার দ্বারা। তিনি বলেছেন–কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সব দৃষ্টির খবর রাখেন।

অবশ্য আত্মচেতনা যখন বিলুপ্ত হয়ে মহাবাস্তবতায় বিলীন হয়ে যায়, তখন জ্ঞান দৃষ্টি শ্রুতি সব ব্যাপ্ত হয়ে দৃশ্য থেকে অদৃশ্যেও পৌঁছে যায়। তখন আল্লাহকে দেখা যায় অন্তরের চোখে।

www.pathagar.com

হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনায় সাধনা কর, তবে তার দর্শন লাভ করবে। (সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ৬)

কিন্তু তখন কেউ যদি বলে যে সে বাইরের চোখে আল্লাহকে দেখেছে, তাহলে বুঝতে হবে সে মিথ্যে বলেছে, কিংবা সে যদি সত্য বলে,তাহলে বুঝতে হবে যে সে যা দেখেছে তা আল্লাহ নন।

যে-আল্লাহকে ইহকালে বাইরে চোখে দেখা যায়, তিনি আল্লাহ নন, তিনি আল্লাহর সম্বন্ধে মানব মনের ইহকাল-নির্ভর মাত্রার প্রতিবিম্ব। এর সাথে ইবলিস এবং কুফরি জড়িত আছে। স্বয়ং মুসা (আঃ)ও আল্লাহকে দ্যাখেননি, তিনি দেখেছিলেন সেই জায়গাটা মাত্র যেখানে তিনি তাঁর নূরের তাজাল্লিকে প্রকাশ করেছিলেন, যা পবিত্র বিধায় তাঁকে সেখানে জুতো খুলে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল :

যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছাল, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে ডেকে বলা হলো—হে মূসা! আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক; ... (সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ৩০)

অতঃপর যখন সে আগুনের কাছে আসল, তখন তাকে আহ্বান ক'রে বলা হলো–হে মুসা! আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতা খুলে ফেল, কারণ, তুমি পবিত্র 'তোয়া' উপত্যাকায় রয়েছ। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১-১২)

আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন—হে মূসা, **তুমি আমাকে কখনও দেখবে না;** ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও—যদি তা স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে। কিন্তু যখনই আল্লাহ তাঁর নূরের তাজাল্লি প্রকাশ করলেন, তখন পাহাড় ধ্ব'সে/স'রে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল—মূসা (আঃ) তাঁকে দেখতে পারলেন না, বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে গেলেন। তাই আবারও বলি, চিন্তা দ্বারা আল্লাহকে বুঝা যায় না, কারণ চিন্তার শুরু হয়েছে প্রকাশিত বাস্তবতার শুরু-বিন্দুতে এবং শেষ হয়েছে তার সমাপ্তি বিন্দুতে। অন্য কথায়, চিন্তা বাস্তবতার সব মাত্রায় পৌঁছায় না। এ কারণে চিন্তা দিয়ে কোনো 'সর্বশক্তিমান' সত্তার একটা *ধারণাও* সৃষ্টি করা যায় না, কারণ তখন চিন্তা তার দুই প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে দুটো পরস্পর বিরোধী বিন্দুতে স্থিত হয়। আমরা যখন এই পরস্পর বিরোধী বিন্দুদ্বয়কে একত্রে যৌক্তিকভাবে মিলাতে চাই, তখন একটা আত্মবিরোধের সৃষ্টি হয়। অথচ আমরা সেই আত্মবিরোধের ওপর নির্ভর ক'রে ব'লে বসি যে আল্লাহ মিথ্যা!

আত্মবিরোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে আল্লাহ সত্য!

সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একটা আত্মবিরোধই দরকার! অথচ তোমরা আত্মবিরোধের ধুয়ো তুলেই সত্য থেকে দূরে রইলে! কি দুর্ভাগ্য!

'আল্লাহ কি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন!' 'তিনি কি নিজের চেয়েও বড় কিছু সৃষ্টি করতে পারেন?' -এসব প্রশ্নের জবাবে আত্মবিরোধই চ'লে আসে। যদি বলি—হ্যাঁ,

www.pathagar.com

পারেন—তাহলে তিনি আল্লাহ নন, কারণ সেক্ষেত্রে তো তিনি ধ্বংসের অধীন হয়ে গেলেন বা তাঁর চেয়েও বড় কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল; আবার যদি বলি—না, পারেন না—তাহলেও তিনি আল্লাহ নন, কারণ তখন তিনি আর সর্বশক্তিমান থাকলেন না, তাঁর ক্ষমতা ক্ষুদ্র এবং সীমিত হয়ে গেল। এভাবে দেখা গেল যে একই জিনিসকে *একই সাথে সত্য এবং মিথ্যা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। একেই বলেই আত্মবিরোধ।* এর অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে প্রকাশ্য বাস্তবতার চিন্তাকাঠামোর যুক্তিকে ব্যবহার করলে চেষ্টা ক'রেও কোনো সর্বশক্তিমানের *ধারণাই* গঠন করা যায় না, বাস্তবে কোনো সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব থাক বা না-থাক।

এই আত্মবিরোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে মানব-যুক্তি সীমিত মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ; তা দুই প্রান্তের দুই মাত্রায় গিয়ে থেমে যায়। তার সংজ্ঞাটাই নির্ধারিত হয়েছে মাত্রার মধ্যে ফেলে। এই আত্মবিরোধ আছে ব'লে আমাদের যুক্তি সরলরৈখিক এবং জগতের সবকিছুতে আমরা একটা সরলরৈখিক শৃঙ্খলা খুঁজে পাই। নইলে আমাদের জন্য বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আমাদর চিন্তায় শৃঙ্খলা না থাকলে তা তার জাগতিক কার্যকারিতা হারাত।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন যে, কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না যে জগতের কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন; আবার কেউ এ কথাও প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি নেই। সুতরাং বিষয়টা গুরুত্বহীন।

রাসেল গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম যুক্তিবিদ এবং দার্শনিক হয়েও মূর্খের মতো একটা কথা বলেছেন। তার এই কথাটা আবার বর্তমানের অন্যান্য পণ্ডিত এবং মার্কসবাদী অহংকারী ছিচ্‌কে পণ্ডিতদের মুখে বেশি শোনা যায়। অথচ ভেবে দ্যাখ, রাসেল যে কথাটা বলেছেন সেটাই একটা আত্মবিরোধ। সৃষ্টিকর্তা থাকুন বা না থাকুন, গাণিতিক-বা যৌক্তিকভাবে তাঁর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁকে ধ'রে নিলাম 'X' : এখন আমরা প্রমাণ করব যে হয় X = 1 বা X = সত্য, না হয় X = 0 বা X = মিথ্যা। দুটো জবাব একসাথে পাওয়া মানেই আত্মবিরোধ অর্থাৎ X = 0 এবং 1, X = সত্য এবং মিথ্যা—এরূপ জবাব পেলে বলতে হব যে X-এর সমাধান ঠিক হয়নি। রাসেল বলেছিলেন যে 'X = 0 এবং 1' এ কথাই ঠিক : অন্য কথায়, 'সৃষ্টিকর্তাকে প্রমাণ করা যায় এবং যায় না—এটাই সত্য কথা'। আরো স্পষ্টভাবে : 'একথা সত্য যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় এবং যায় না'। তাহলে কি তিনিই শেষমেষ সেই আত্মবিরোধের ফাঁদে আটকে গেলেন না যাতে তিনি সৃষ্টিকর্তাকেই আটকাতে চেয়েছিলেন? মূর্খ রাসেল! তিনি এখন বেঁচে থাকলে তাঁকে হয় বিশ্বাসী হতে হতো, না-হয় তাঁকে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হতো; তাঁর রক্তের ইহুদিত্ব তাঁর যুক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

এটাই মানব মনের অন্ধকূপ—চিন্তা এবং স্বভাবের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান।

www.pathagar.com

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সঃ) বলেছেন যে **উদ্দেশ্য** দ্বারা কাজকে বিচার করা হবে (ইন্নামাল্ আ'মালু বান্ নিয়াত)। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন—আল্লাহর কাছে কোরবানীর মাংস বা রক্ত পৌছায় না, তাঁর কাছে পৌঁছায় উৎসার্গকারীর **বিশুদ্ধ চিত্ত** (সূরা হজ্, আয়াত : ৩৭) সুতরাং যা কিছু দেখা যায় তা থেকে **যা কিছু দেখা-ধরা-ছোঁয়া যায় না** তাই-ই নির্যাস আকারে আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। আমাদের জন্মও শুরু হয়েছিল আল্লাহর **বৈশিষ্ট্য** দ্বারা; আমরা আল্লাহর সাথে যে **প্রতিজ্ঞা** করেছিলাম—ধর্মের বিধানকে মেনে নিয়ে রসুলের (সঃ) কাছে বা আল্লাহর আমরা যে প্রতিজ্ঞা করি, তাও এই প্রতিজ্ঞার অংশ—তা অনুসারে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা রসদ বা রিযিক তিনি আমাদেরকে দান করেন—আমরা এসেছিলাম এই **অনুমতি** নিয়ে। ফলে আমাদের স্বভাব হলো মূলত আল্লাহরই স্বভাব। তা অনুসরণ না করলে ব্যক্তি নিজেই নিজের শত্রুতা করে :

> আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
> (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

> তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে (অর্থাৎ তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল)। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৭)

মানবের এই অকলুষিত স্বভাবই আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুষমভাবে ধারণ করে :

> তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। **আল্লাহর স্বভাবের অনুসরণ কর, যে-স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন;** আল্লাহর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—এটাই সরল চিরস্থায়ী দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই **অভিমুখী** হও; তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর ... (সূরা রুম, আয়াত : ৩০-৩১)

ফলে তার অকলুষিত স্বভাবধর্মে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার সামগ্রিক প্রতিবিম্ব। এখানে স্থিত হতে পারলেই আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মানবের স্বভাবের যে-অংশ তার এই আত্মবিরোধপ্রবণ যুক্তির ছকের মধ্যে বাঁধা পড়েছে, তা কলুষিত, তার সব কাজের জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খণ্ডিত এই স্বভাব থেকে আল্লাহর স্বভাবধর্মে পৌঁছতে হলে প্রথমে আল্লাহতে আস্থা রাখতে হবে। পরে পরম ধৈর্যের সাথে রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে, এমনকি আল্লাহকে খুশি করার জন্যও তাঁর কোনো ধর্মাচরণকে পরিবর্তিত না ক'রে, প্রজ্ঞাবানের মতো ক্ষমা এবং মহানুভবতার পথ ধ'রে দৃঢ় চরিত্র নিয়ে এগোতে হবে। অন্ধের মতো পথ চললে গন্তব্য হারিয়ে যাবে—অন্ধকারে :

> যারা অন্ধ এবং যারা দেখে, তারা সমান নয় : তারাও সমান নয়, যারা বিশ্বাস করে এবং ভালো কাজ ক'রে, এবং যারা মন্দ কাজ ক'রে। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৫৮)

www.pathagar.com

তোমরা অনুমান ও নিজেদের স্বভাবের অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, আয়াত : ২৩)

... খারাপ এবং ভালো কখনও সমান নয়, এমনকি যদিও খারাপের আধিক্য তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে ... (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১০০)

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

ওরা **আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে** যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন? (সূরা আহক্বাফ, আয়াত : ২৮)

এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল; এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ৩৫)

আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলাকাম হলো। (সূরা মু'মিমূন, আয়াত : ১১১)

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা ক'রে দিলে তা বীরত্বের কাজ।
(সূরা শুরা, আয়াত : ৪৩)

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুক। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

এভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বভাবধর্মে স্থিত হয়ে কোনো ব্যক্তি যে কাজ করেন, তা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী হয়, এবং ফলে তা আল্লাহই করেন, এবং ফলে ব্যক্তি সব পাপের উর্ধ্বে গিয়ে বেহেস্তের উপযুক্ত হয়, যে কারণে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য বেহেস্তে প্রবেশ করবে না, আল্লাহর করুণা ছাড়া। এই হাদীসটাকে অনেক আলেম এবং লেখকও ভুলভাবে ব্যখ্যা করেছেন, এর ভেতরকার তাৎপর্য না বুঝে। কিন্তু মূলত এর মধ্যে কোনো অবিচারই নেই। রসুলুল্লাহ (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ), আপনিও নন?—জবাবে তিনি বলেছিলেন—আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। এই রহস্য জানলেই বুঝা যায় কেন একথা বলা হয়েছে যে নবীগণ (আঃ) এবং আল্লাহর উচ্চ পর্যায়ের অলিগন আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এক পা-ও সামনে বাড়াতেন না। মূর্খেরা প্রশ্ন করে—আল্লাহ কি তাঁদেরকে দিনে হাজার হাজার বার অনুমতি এবং আদেশ প্রদান করেন নাকি? তারা ভেবেও দেখে না যে তাঁরা তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন, যার ফলে তাঁদের কোনো কাজকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার দরকার নেই, **তাঁদের ইচ্ছাই আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত**।

নামাজে আমরা আমাদের চিন্তা এবং স্বভাবের, অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের (কাল্‌ব্ বা হার্ট) মধকার ব্যবধানের, মধ্যে পুড়ে যাই : দৃশ্য এবং অদৃশ্য বাস্তবতার মিলনস্থলের

www.pathagar.com

মাত্রাবিন্যাসের মধ্যে আটকে যাই। এবং ভালোভাবে নামাজ পড়লে ধীরে ধীরে এই দূরত্ব ক'মে আসে, অর্থাৎ দুই পর্যায়ের মাত্রার মিলনবিন্দুতে পৌঁছে প্রকাশিত মাত্রাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। এভাবেই কারো কারো কপালে জুটে যায় মেরাজ। তরপর তিনি যা দ্যাখেন তা দ্যাখেন, যা জানেন তা জানেন, যা শোনেন তা শোনেন। তাঁর সমস্ত সন্দেহ ঘুচে যায়। তার হৃদয়ে আর প্রশ্ন জাগে না। কারণ সব প্রশ্নের জবাবই তিনি এখন পেয়ে গেছেন। **সঠিক জবাব পাওয়ার পর প্রশ্ন তার অস্তিত্ব হারায়। ধ্বংস হয়ে যায় সব ডুয়ালিটি। চিন্তা প্রলম্বিত হয়ে মিশে যায় শ্বাশ্বত বাস্তবতায়। তখন আর চিন্তা ও বাস্তবতার মধ্যে কোনো যৌক্তিক আত্মবিরোধের পার্থক্য থাকে না। এরূপ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যান। তার দেহের মৃত্যু ঘটলেও তিনি মৃত্যুর অতীতে চ'লে যান। মৃত্যু হলো দৃশ্য মাত্রাকে ত্যাগ ক'রে অদৃশ্য মাত্রায় চ'লে যাওয়া, যাতে দৃশ্য মাত্রায় যাকিছুর সৃষ্টি হয়েছিল তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার নির্যাস বা আমল চ'লে যায় অদৃশ্য, অনন্ত মাত্রার দখলে, যেখানে মানুষের আমিত্ব বা আত্ম-সচেতনতা বা মুক্ত-ইচ্ছা বা স্বাধীনতা একেবারেই ক্ষমতাহীন। কিন্তু তার আমিত্ব সেখানেও ফলপ্রসূভাবে সক্রিয় যিনি মৃত্যুর আগেই তার আমিত্বকে ত্যাগ করতে পেরেছেন এবং রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে চলেছেন। যিনি তার মুক্ত-ইচ্ছা বা স্বাধীনতাকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কাছে পরাধীন ক'রে দিয়ে আল্লাহর সাথে একাত্ম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পরে আল্লাহর সান্নিধ্যে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। নিজেকে সঁপে দেয়ার উৎকৃষ্টতম উপায়ই হলো রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে চলা।**

তুমি কি তোমার বাবার দিকে তাকিয়ে কখনও নিজেকে প্রশ্ন করেছ—এই লোকটা আসলেই কি আমার বাবা?—না, করনি। কারণ তোমার মস্তিষ্ক যেমন জানে যে তিনি তোমার বাবা, তেমনি তোমার স্বভাব—হৃদয়, রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা—এরাও জানে যে তিনি তোমার বাবা। ফলত তোমার রক্ত-মাংস যা মেনে নিয়েছে তোমার মস্তিষ্কও তা মেনে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু তোমাকে যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলা হয় যে ইনিই তোমার আসল বাবা, এবং এমনকি তোমার মাও যদি একথা বলেন এবং উপযুক্ত প্রমাণ তোমাকে দেন, এবং বলেন যে তোমার বর্তমান বাবার সাথে তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল তখন যখন তুমি ছিলে তার গর্ভে, যখন তোমার প্রকৃত বাবার সাথে তোমার মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবুও প্রথমত তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে; তোমার মস্তিষ্ক এই কঠোর সত্য মেনে নিলেও তোমার মন তা মানবে না, যেহেতু তোমার বর্তমান বাবার সাথে তোমার গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

নামাজে আমরা এই মস্তিষ্ক এবং মনের/অনুভূতির/স্বভাবের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে প'ড়ে যাই। সিজদা-রুকুতে এই দুয়ের মিলন ঘটে। এবং এই দুয়ের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মস্তিষ্কে আর কোনো প্রশ্ন জাগে না। আর কোনো সন্দেহ থাকে

www.pathagar.com

না। আমাদের প্রশ্নের তীব্রতাই আমাদের সন্দেহকে শক্তি যোগায়। আমাদের সন্দেহের শূন্যতাই প্রশ্ন সৃষ্টি করে। আল্লাহর সত্যতার বিষয়ে প্রশ্ন আসে সেই মনে যা ঐক্যহীনতার কারণে শতধাবিভক্ত। সন্দেহ হলো অজ্ঞতা। বিশ্বাস হলো জ্ঞান—পরিপূর্ণ জ্ঞান যা মস্তিষ্ক এবং অনুভূতি উভয় ডাইমেনশনে একাকার হয়ে মিশে গেছে, আর কোনো ভারসাম্যহীনতা বা অস্থিরতা নেই।

মনে রাখবে, যুক্তি বাস্তবতাকে সৃষ্টি করে না, বাস্তবতা থেকেই যুক্তির সৃষ্টি হয়। সব বাস্তবতা শুরু হয়েছিল আল্লাহর যুক্তি থেকে; তাঁর ইচ্ছাই তাঁর যুক্তি এবং তাঁর যুক্তিই আমাদের বাস্তবতা। আমাদের যুক্তির উৎস হলো আমাদের বাস্তবতা। এ কারণে নারীর যুক্তি তার স্বভাবের/অনুভূতির/শরীর মনের গাঠনিক উপাদানের পক্ষে যায়, এবং পুরুষের যুক্তি যায় পুরুষের পক্ষে। কত তরুণ আছে যারা ভাবে : আহ, কত সুন্দর একটা মেয়ে। সে কি নিজের সৌন্দর্য নিয়ে অবাক হয় না?—কিন্তু অবাক হবার স্বভাব দেয়া হয়েছে পুরুষকে। নারী তার সৌন্দর্যকে তুচ্ছ মনে করে, যদি না কোনো পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়। নারীর এই নির্ভরশীলতা থেকে তার যুক্তি গঠিত হয়। পুরুষের যুক্তি গঠিত হয় তার ক্ষুধা থেকে। নারী যদি নিজের সৌন্দর্য নিয়ে পাগল হবার মতো মন ধারণ করত, তাহলে সে আর নিজেকে অপরের হাতে তুলে দিতে চাইত না : পুরুষ হতো বঞ্চিত। কিন্তু সৃষ্টি ফর্মুলায় কোনো ভুল নেই। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ (সঃ), তুমি সৃষ্টিজগতের দিকে তাকিয়ে দেখ কোনো দুর্বলতা বা খুঁত বা অসম্পূর্ণ তা খুঁজে পাও কিনা; কিন্তু তুমি তা পাবে না—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।' ভারতবর্ষের গৌতম বুদ্ধও ঠিক একই উক্তি করেছিল—আমি দেখলাম সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত নেই; সবই পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত, সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনেক তরুণ ভাবে : কি নিষ্ঠুর মেয়েটা! আমরা ওর দিকে পাগলের মতো তাকিয়ে থাকি অথচ ও একবারও আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। তরুণরা কত বড় ভুল করে! তারা বোঝে না যে তারা তার দিকে তাকিয়ে যে-আনন্দ পাচ্ছে, মেয়েটা তাদের দিকে না-তাকিয়েই সেই আনন্দ পাচ্ছে। সে তাদেরকে তার দিকে তাকানোর সুযোগ ক'রে দেয়ার জন্যই চোখ নিচু ক'রে অথচ বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। তরুণরা বোঝে না যে এক্ষেত্রে তারা যতটুকু অপরাধ করছে মেয়েটাও ততটুকু অপরাধ করছে। তাদের ভুল এখানেই যে তারা তাদের যুক্তিকে আরোপ করছে মেয়েটার বাস্তবতার ওপর।

আমাদের যুক্তির আলোই আমাদেরকে অন্ধ ক'রে দেয়। আমরা আমাদের জ্ঞানের আলোর সংকীর্ণতার অন্ধকারেই আটকা প'ড়ে থাকি। আমরা আমাদের জ্ঞানের আলোর কারণেই বুঝতে ব্যর্থ হই যে আমরা অন্ধকারে আছি। এই আলোর ফাঁদ দিয়েই আল্লাহ আমাদেরকে বেঁধে রেখে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে রয়েছে সত্তর হাজার আলোর পর্দা। এই পর্দা হলো বিভিন্ন স্তরের আমিত্বের বা আত্মচেতনার বা অহংকারী জ্ঞানের আলোর পর্দা। এই পর্দা ছিড়তে হলে নিজেকে সংযত করতে হবে।

www.pathagar.com

নামাজে আমাদের এই আমিত্বের খোলস ভেঙ্গে যেতে থাকে। এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মনের অবস্থা এমন হয় যে মন তখন স্বাভাবিকভাবেই পাপকে বিকর্ষণ করে। তাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কোরআনে তাও বলেছেন :

নিশ্চয়ই নামাজ পাপ কাজকে দূরে রাখে।

আর আমিত্বকে ধ্বংস করা সবচেয়ে কঠিন ব'লে নামাজ বড়ই কঠিন। কোরআনেই তা বলা হয়েছে :

নিশ্চয়ই নামাজ অতি কঠিন কাজ, কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা বিনীত (অর্থাৎ নিরহংকার)। (সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৫)

আর কঠিন ব'লেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেখা যায় কোনোমতে দায়-সারাভাবে ওঠাবসা ক'রে চ'লে যায়। এরূপ নামাজ সম্বন্ধে হাদিসে বলা হয়েছে যে পরকালে তাতে ময়লা-আবর্জনা মাখিয়ে তা নামাজীর মুখর ওপর ছুড়ে মারা হবে।

নামাজ অতি কঠিন কাজ, কারণ আমিত্বের বোঝা বহন ক'রে তার দায়িত্ব যথাযতভাবে বহন করাও কঠিন। এই দায়িত্বের প্রসঙ্গেই পবিত্র কোরআনে একটা রহস্যময় আয়াত রয়েছে।

আমি তো আসমান, জমিন, ও পর্বতমালার ওপর এই দায়িত্ব/আমানত অর্পণ করেছিলাম, ওরা ভয়ে তা বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল—মানুষ তো নিজের ওপর জুলুম ক'রে থাকে,এবং সে অতিশয় অজ্ঞ। (সূরা আহযাব, আয়াত :৭২)

হযরত আলী (রাঃ) নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : এখন আমি সেই দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি যে দায়িত্ব দিতে চাওয়া হয়েছিল পর্বতকে, আকাশকে, কিন্তু তারা তা ভয়ে গ্রহণ করেনি, কিন্তু আমি করেছি। দ্যাখ বন্ধু, আমি যদি অমুসলিম হতাম, এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন তখনও তা আমাকে দিতেন, তাহলে আমি এই একটা আয়াত প'ড়েই মুসলমান হয়ে যেতাম।

সুতরাং নামাজে মন বসতে না চাইলে—প্রথমত মন না বসাই স্বাভাবিক—এটা বড় কঠিন কাজ। কঠিন কাজকে কি সহজে দায়সারাভাবে সম্পন্ন করা যায়? নামাজ যদি সহজ হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তা পড়তাম না। আল্লাহকে যদি সহজে পাওয়া যেত তহলে সেরূপ আল্লাহর উপাসনা আমি করতাম না। আল্লাহকে যদি চর্মচক্ষুতে দেখা যেত এবং বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যেত, তাহলে সেরূপ আল্লাহতে আমার তৃষ্ণা মিটত না, কারণ দেখার বা জানার পর আমি তাঁকে আমার জ্ঞান দ্বারা মেপে ফেলতাম এবং তাঁকে তুচ্ছ ভেবে এমন এক আল্লাহকে খুঁজতাম যিনি আমার জ্ঞানেরও অতীত, আমার চিন্তার চেয়েও বড়। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন—আল্লাহকে যে পুরোপুরি বুঝা যায় না, প্রমাণ সহকারে এই সত্য জানাই আল্লাহকে জানা। কি চমৎকার কথা! কূর্ট গোডেল

www.pathagar.com

কি গাণিতিকভাবে একথাই প্রমাণ করেননি? যে-কোনো ভালো এনসাইক্লোপিড়িয়াতে Godel এনট্রিতে যা লেখা আছে তা ভালো ক'রে প'ড়ে নিলেই এই সত্যকে আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে।

এ পর্যন্ত শুনে আমার বন্ধু প্রশ্ন করল : কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আমার জানা দরকার। আল্লাহ্ আগে থেকেই আমাদের ভবিষ্যত জানেন কিভাবে? অর্থাৎ তকদীর বা ভাগ্য নির্ধারিত হলো কিভাবে? আমি এখনও একটা কাজ করিনি। কিন্তু যা করিনি তার ফল তিনি কিভাবে জানলেন?

বললাম : রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—যখন আমার সাহাবাদের এবং তকদীরের প্রসঙ্গে কথা উঠবে, তখন নীরব থাকবে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস মজবুত হলে আমার জন্য চুপ ক'রে থাকা সহজ হতো। আমি তো এখনও বিশ্বাসকে মজবুত করারই সুযোগ পেলাম না।

এক্ষেত্রে তোমাকে ভেবে দেখতে হবে আল্লাহর সত্যতার এবং রসুল (সঃ) এর নবুয়তির ব্যাপারে তোমার আস্থা এসেছে কি-না; অর্থাৎ যা জেনেছ তা তোমার ইমান আনার জন্য যথেষ্ট কিনা।

তা যথেষ্ট।

তাহলে বাকিটাও এই বিশ্বাসের সম্মানেই বিশ্বাস ক'রে নাও।

তবুও মনে হয় তোমার কাছ থেকে জবাবটা পাওয়া যাবে।

ঠিক তা নয়। **আল্লাহর রহস্য সব জানি মনে করা মানেই তাঁকে ছোট ক'রে দেখা। তিনি ব্যবস্থাটা এমন ক'রে রেখেছেন যেন তাঁর অনুগত বান্দাগণ তাঁর কিছু কিছু রহস্য না-জেনেই আনন্দিত হন।** এই যুক্তিটাকেই তোমার প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে বলা যায় যে, তিনি যদি এমন কোনো আল্লাহ্ হতেন যিনি আমাদের ভবিষ্যত জানেন না, তাহলে তেমন অসম্পূর্ণ আল্লাহকে তো আমরা পছন্দই করতাম না। তুমি কেন মনে রাখছ না যে তোমার প্রশ্নের যুক্তিটা এসেছে একটা খণ্ড বাস্তবতা থেকে, অথচ সেই প্রশ্নকেই তুমি চাপিয়ে দিচ্ছ সেই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার ওপর **যার খণ্ডত্বের অনুভূতির ওপর** তোমার এবং তোমার যুক্তির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। **তুমি যে ভাষায় প্রশ্ন করছ, জবাব আশা করছ সেই ভাষার আদলেই। ফলত তুমিই আত্মবিরোধের ফাঁদে আটকা প'ড়ে যাচ্ছ।** তোমার প্রশ্নের ভাষা দিয়েই যদি তোমার জবাব পঠিত হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে প্রশ্নটাই তুমি করতে না, কারণ তখন জবাবটা তুমি নিজে জানতে এবং সে জবাব তোমাকে দেয়া হলেও তুমি বলতে—'আমারও ছিল মনে/কেমনে বেটা পারিল সেটা জানতে—?' সে জবাব তোমার কোনো কাজে আসত না। কারণ তাতে তোমার জ্ঞানের রাজ্যে নতুন কোনো মাত্রা যুক্ত হতো না। মানব মনে তখনই প্রশ্ন জাগে যখন তার মন একটা খণ্ডিত বাস্তবতা এবং একটা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার দূরত্বের শূন্যতাকে অনুভব করে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে খণ্ডিত বাস্তবতা থেকে, যার

www.pathagar.com

জবাব রয়েছে বৃহত্তর বাস্তবতার মধ্যে। এবং এরূপ সঠিক জবাব সে যখনই পেয়ে যায়, তখনই তার চেতনা খণ্ড বাস্তবতাটা থেকে বৃহত্তর বাস্তবতাতে উন্নীত হয়। এটাই হলো প্রশ্নের ফিলোসাফি—একে যে অস্বীকার করবে সে আসলে একে বোঝেনি। আর, কারো নির্বুদ্ধিতার দায়ভার তার নয় যিনি বুদ্ধিমান। এক বিখ্যাত কবি এই কথাটা বলেছিলেন : তোমার চেয়ে আমি বেশি বুঝি, তা কি আমার দোষ?

২. সৃষ্টির সময় বনাম সময়ের সৃষ্টি

ব'লে চললাম—তবুও তোমাকে রহস্যের একটা বিশেষ মাত্রার কথা বলি। তোমার ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা তুমিও জান।

আমি জানি?

হ্যাঁ। তোমার দেহ-মনের মধ্যেই প্রতিনিয়ত ঘটছে তোমার ভবিষ্যত কাজকে নিয়ন্ত্রণ ও তা অনুসারে তোমার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার কাজ। এসব ঘটছে তোমার গোটা দেহমনের ক্রিয়াকাণ্ডের ফর্মুলার মধ্যে। **মানুষ এক মহারহস্য। সে নিজেই একটা সৃষ্টি আবার নিজেই একটা ফর্মুলা।** তার ক্রিয়াকাণ্ড মুক্ত-ইচ্ছা ইত্যাদি দ্বারা পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ, দেশ, এমনকি জলবায়ু-আকাশও প্রভাবিত হয়। পবিত্র কোরআনে তা বলা হয়েছে, ফলে সে নিজেই তার পরিবেশ সৃষ্টির ফর্মুলা। আবার সে পরিবেশকে যেভাবে পাল্টে দেয়, পরিবেশও তার ওপর সেভাবে প্রভাব ফ্যালে। বিজ্ঞান 'গয়া থিওরি' সহ অন্যান্য সিস্টেমস্ থিওরি দ্বারা একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন শুধু সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

> আল্লাহ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

> মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

> তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং (পরিমাপের জন্য) ভারসাম্য স্থাপিত করেছেন, যেন তোমরা পরিমাপে বৃদ্ধি না কর (ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর)। ন্যায্য ওজনের মাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিয়ো না। (সূরা রহমান, আয়াত : ৭-৯)

> আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রতিশ্রুতি। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতোই সত্য।
>
> (সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২)

> ... তিনি জানেন—যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও ভূমি থেকে নির্গত হয়, এবং আকাশ থেকে যা বর্ষিত হয়, এবং আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় ... (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৪)

www.pathagar.com

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (সূরা ফাবির, আয়াত : ৪৫)

পরিবেশই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ফর্মুলা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আল্লাহ এমনভাবে বাস্তবতাকে সৃষ্টি করেছেন যে প্রত্যেকটা মাত্রার বাস্তবতার ভারসাম্যের একটা নিয়ম আছে বা অন্যান্য মাত্রার বাস্তবতার সাথে সহাবস্থানের জন্য প্রত্যেকের একটা উর্ধ্বসীমা ও একটা নিম্নসীমা আছে। তারা সেই সব সীমাকে অতিক্রম করলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে :

... আল্লাহ তার কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর যে করুণা বর্ষণ করেছেন তা কখনও পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মনকে পরিবর্তন না করে ...
(সূরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

কিন্তু মানুষ তার খামখেয়াল অনুসারে জীবন-যাপন করলে তার জীবনাচরণ এরূপ সব খণ্ড বাস্তবতার সীমা এবং ভারসাম্যের নিয়মের অধীন থাকতে পারে না, কারণ এরূপ অধিকাংশ বাস্তবতাই অদৃশ্যে বা গায়েবে ক্রিয়াশীল, যা বিজ্ঞান দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের ভাগ্য মীমাংসিত হয়ে যেত (তারা ধ্বংস হয়ে যেত)। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদেরকে নিজ অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই।

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।
(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

বল, 'সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে'; যে বিশ্বাস করতে চায়, করুক, এবং সে তা অস্বীকার করতে চায়, করুক। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯)

এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুবিচারে পূর্ণাঙ্গ। কেউই তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১১৪-১১৫)

এজন্য সবচেয়ে 'বিজ্ঞানসম্মত' পদ্ধতিতে জীবন-যাপন ক'রেও দেখা যায় যে সেই জীবনাচরণই ভারসাম্য নষ্টের কারণ হয়েছে। পরিবেশের এই ভারসাম্য মানব মনের আবেগ-ইচ্ছা-শক্তি-স্পৃহা-অস্থিরতা-আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে

www.pathagar.com

এবং এভাবে বাইরের ভারসাম্য বদলালে মনের ভেতরের ভারসাম্য বদলায়, ভেতরের ভারসাম্য বদলালে বাইরের ভারসাম্য বদলায়। মনের এই মুহূর্তের সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ আমি এখন কী কাজ করব—নির্ভর করে তার এই মুহূর্তের ভারসাম্যের ওপর। আসলে চিন্তা, যুক্তি যা-ই বলুন না কেন, কোনো মুহূর্তে ইচ্ছা বা choice হলো ঐ মুহূর্তের 'মেধা-মন' এর ভারসাম্য। একটু চিন্তা করলেই তা বুঝা যায়। আমাদেরকে অধিকাংশ সময়ে তাই-ই করতে হয় যার পক্ষে হয় আমাদের মন না হয় মেধা সায় দেয়নি। ফলে সেরূপ কাজ করার সময়েও আমরা আফসোস করি। কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে প্রত্যেকটা সুচিন্তিত স্বাভাবিক এবং ভালো কাজই ঐ মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে উত্তম, কারণ তা ঘটেছে ভারসাম্যবিন্দুতে। এবং এরূপ কাজ যে ফল সৃষ্টি করবে তার দায়ভার আল্লাহর ওপর চাপিয়ে বিদ্রোহ-চেঁচামেচি করলে ফল হবে আরো খারাপ, কারণ কর্ম আমার ফলও আমার। এজন্য কেউ তার ভুল বুঝতে পারলে এবং তওবা করলে তার মনের ভেতরকার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়, তবে তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালো কাজগুলো সঙ্গে সঙ্গেই করা সম্ভব না-ও হতে পারে, কেননা তার মনের ভারসাম্য আবার নির্ভর করছে আকাশ-পৃথিবী তথা পরিবেশের ভারসাম্যের ওপর, যা জড়-জগতের ভারসাম্য ব'লে বিশেষ নিয়মের অধীন এবং ধীরে ধীরে বদলায়। এ কারণে অভ্যাসকে হঠাৎ পাল্টানো যায় না। এ কারণেই আল্লাহ মানুষকে ভালো পথে থেকে বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। কারণ কোনো ব্যক্তির সাথে ক্রিয়াশীল সব মানুষ-জন্তু-বস্তুর আচরণ দ্বারা তার ভারসাম্য প্রভাবিত হচ্ছে। সে যদি ধৈর্য ধারণ ক'রে সঠিক আচরণগুলো করে, তাহলে ধৈর্যের একটা সীমার পর সবকিছু তার কাছে নতি স্বীকার করবে। কোরআনে একথাই বলা হয়েছে :

> আমি তাদের ভোগান্তিকে/দুঃখ-কষ্টকে সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলাম।
> (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯৫)

> আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

> ওদেরকে দুবার (পৃথিবীতে এবং পরকালে) পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল, এবং ওরা ভালো'র দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে, এবং আমি ওদের যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ওরা ব্যয় করে। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ৫৪)

এ কারণেই রসুল (সঃ) বলেছেন যে কেউ যখন তওবা করে, এবং তওবা করতেই থাকে, তখন তার রিযিক আসে এমন সব জায়গা থেকে যা সে জানে না। জানবে কিভাবে? তা আসবে এমন ভারসাম্য থেকে যা ভবিষ্যতে ঘটবে, এবং ফলে ব্যক্তির বর্তমানের ভারসাম্যের অন্তর্ভুক্ত নয় ব'লে সে সে-ব্যাপারে সচেতনও নয়।

এখন জানা দরকার কী সেই 'সঠিক আচরণগুলো' যে-পথে চললে গোটা সৃষ্টিজগৎ ব্যক্তির অধীন হয়ে যায়। এই আচরণগুলো হলো রসুল (সঃ) এর শরীয়ত বা সুন্নাহ—অর্থাৎ তিনি যে-পথে চলতেন, যে-আচরণ করতেন, যে-ভাবে চলতে বলতেন। তাঁর

www.pathagar.com

প্রত্যেকটা আচরণের সাথে গোটা সৃষ্টিজগতের কাঙ্খিত শ্রেষ্ঠতম ইতিবাচক ভারসাম্যের অনুকূল সম্পর্ক রয়েছে। তাই কেউ তাঁর পন্থায় দাড়ি রাখাকে যতই হাস্যকর ভাবুক, তাঁর কথামতো বহুবিবাহের বেলায় যতই নাক সিঁটকাক—যিনি জানেন কী সেই আচরণের রহস্য, তিনি এই ভেবে কৃতজ্ঞ হন যে এই পথ জানার সুযোগ তার হয়েছে। তাঁর আচরণবিধি অনুসারে চলা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর মারেফত বা গোপন জ্ঞান অর্জনের চেয়েও তার অগ্রাধিকার। কারণ আল্লাহর মারেফত অন্যান্য ধর্ম অনুসরণ করলেও পাওয়া যেতে পারে, যার প্রমাণ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। খোদ ইসলামেই একদল ভণ্ড মারেফতপন্থী আছে যারা শরীয়ত ত্যাগ করেছে। তারাও কিছু রহস্য জানে—শুনে শুনে। কিন্তু সে সব জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক থেকেই যাবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের দুইটা অর্থ আছে—একটা গোপন, একটা প্রকাশ্য; তোমরা উভয়টাই গ্রহণ কর। সুতরাং এর একটাকে যে বাদ দেবে, সে মুসলমান নয়। সঠিকভাবে শরীয়ত অনুসারে চললে মারফত এমনিতেই এসে যায়। এটাই শরীয়তের রহস্য। সব পূর্ববর্তী ধর্মের আচরণবিধি পরম করুণাময় আল্লাহই সেই সব যুগের প্রয়োজন বা সঠিক ভারসাম্য অনুসারে তাঁর নবীদের (আঃ) মাধ্যমে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই পরম দয়াময়ই দিয়েছেন রসুল (সঃ) এর সুন্নাহ। তা অনুসরণ না করলে সঠিক দৃশ্য এবং অদৃশ্য বাস্তবতার সাথে তোমার দূরত্ব রয়েই যাবে। রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে চলার অঙ্গীকারই আমরা আমাদের প্রভুর কাছে ক'রে পৃথিবীতে এসেছিলাম, যদিও এখন আমরা তা ভুলে গেছি। সেই পথ পবিত্র হবার, আল্লাহকে স্মরণ করার, কোরআনের রহস্য বোঝার, খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার, নিজের প্রতি সুবিচার করার, তথা আল্লাহর স্বভাবধর্মে স্থিত হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। সেই পথে না চললে বিশ্বাস মজবুত থাকবে না, এবং তখন নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

যারা নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। (অর্থাৎ তারা ধ্বংস হবে না, তারা ধ্বংসপ্রাপ্তই।) (সূরা আন্‌আম, আয়াত : ২০)

আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়? (এই অঙ্গীকার হলো আল্লাহর পথে চলার অঙ্গীকার। তা পূরণ না করলে ব্যক্তি স্রষ্টার একত্ব এবং সামাগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে।) (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না। (সুতরাং সব দোষ বান্দার।) (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (আর আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়াই তাঁর সাথে মিলিত হওয়া।) (সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

www.pathagar.com

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (ফলে সৃষ্ট হয়েছে তাদের একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব।) (সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী; যারা সৎকাজ করে **তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে** সুখসয্যা। **কারণ** যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (অর্থাৎ বিশ্বাসীর কাজ মানে আল্লাহরই কাজ, কিন্তু অবিশ্বাসীর কৃতঘ্নতা হলো স্ববিরোধিতা।) (সূরা রুম, আয়াত : ৪৪-৪৫)

তারা অন্যদেরকে এ (কোরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং নিজেদেরকেও; কিন্তু তারা তো **শুধু নিজেদের আত্মাকেই ধ্বংস করে**, কিন্তু তারা তা বোঝে না।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ২৬)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (ফলে মানুষ নিজেই শতভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।) (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

ওরা **আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে** যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন? (অর্থাৎ আল্লাহকে খুশি করার জন্যও তাঁর আদেশ অমান্য করা যাবে না।) (সূরা আহক্বাফ, আয়াত : ৮)

তাদের খারাপ কাজ তাদেরকে আনন্দ দেয়। (এ কারণে তারা বুঝতে পারে না যে তারা খারাপ কাজ করছে।) (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৭)

তারাই বিশ্বাসী যারা **আল্লাহ ও তাঁর রসূলের** প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ পোষণ করে না ... (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৫)

তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে (অর্থাৎ তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল)। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৭)

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে **ধর্মে** প্রতিষ্ঠিত কর। **আল্লাহর স্বভাবের** অনুসরণ কর, যে-স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—এটাই সরল চিরস্থায়ী দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই **অভিমুখী** হও; তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর ... (সূরা রুম, আয়াত : ৩০-৩১)

... কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। (অন্য উপায়ে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষের উদ্ভাবিত পথকে ইবলিস সহজেই এলোমেলো ক'রে দিতে পারে।)
(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৩০)

যারা **আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য** করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম। (রসুলের (সঃ) আনুগত্য না ক'রে আল্লাহর আনুগত্য করা অসম্ভব এবং হাস্যকর।) (সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

কাজেই রসুল (সঃ) এর কিছু আচরণবিধি দেখে তুমি যতই হাস না কেন, ওটাই সত্য। কোরআনে তোমাদের এই ঠাট্টার প্রসঙ্গটাও বাদ দেয়া হয়নি। আল্লাহ বলেছেন—হে মুহাম্মদ, তুমি তো অবাক হচ্ছ, আর ওরা ঠাট্টা করছে।

www.pathagar.com

তুমি তো অবাক হচ্ছ, আর ওরা করছে ঠাট্টা। (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১২)

একথাই প্রামাণ করে যে রসুলের (সঃ) সুন্নাহ দেখলে উবলিসের হাসিই পায়। এবং নির্বোধ মনের এই হাসি-ঠাট্টাই প্রমাণ করে যে তাঁর সুন্নাহ সত্য। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসংখ্য পথের মধ্যে সব পথেই ইবলিস ব'সে আছে, কেবল তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত পথ ছাড়া।

কাজেই তোমার হাসি পেলেই প্রমাণ হয়ে গেল যে তাঁর পথই আসল পথ। সে পথে না চললে তেমাকেই ক্ষতির ক্ষত বইতে হবে।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। রসুলুল্লাহ (সঃ) কুকুর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এও বলেছেন—কুকুর যদি একটা উম্মত (বা জীবগোষ্ঠী) না হতো, তাহলে আমি সব কুকুরকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিতাম। তাঁর এই কথা থেকেই প্রমাণিত হয় যে কুকুরকে তিনি একটা প্রাণীর মর্যাদা অবশ্যই দিয়েছেন, কিন্তু দৃশ্য বা অদৃশ্য উপায়ে তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় ব'লে তিনি কথাটা বলেছিলেন। তিনি যদি কুকুরকে ধ্বংস করার আদেশ দিতেন, তবে পৃথিবীর অন্য কোনো আদেশ পালিত না হলেও মহামানব মুহাম্মদ (সঃ) এর আদেশ পালন না হয়ে পারার কোনো উপায় নেই ব'লে তা পালিত হতো। কিন্তু এত বড় কঠোর একটা কথা বলার পরও তিনি আদেশটা দেননি। এর মানে এই যে তার এই কথার মধ্যে বিরাট এক রহস্য লুকিয়ে আছে, যা অদৃশ্য জগতের সাথে জড়িত। তিনি এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই কথাটা বলেছিলেন। এরূপ রহস্য আল্লাহ করুণা ক'রে তাঁর কিছু বুযুর্গ ব্যক্তিকে জানান। যাহোক, আজ কুকুর নিয়ে কি সবচেয়ে বেশি মাতামতি হচ্ছে না? কুকুরের পেছনে মাসে লক্ষ টাকা খরচ, কুকুরের সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়ানো এমনকি বিদেশ ভ্রমণ করা, কুকুরের সাথে রাতে নিদ্রাযাপন, কুকুরকে স্ত্রী/স্বামীর চেয়েও বেশি সঙ্গ দেয়া এবং আপন ভাবা, কুকুর পোষার নেশায় উন্মত হয়ে থাকা—এসব কি প্রমাণ করে না যে তিনি যা বলেছিলেন তা প্রশ্নাতীতভাবে সত্য? তিনি যা যা নিষেধ করেছেন সে-সব আচরণই তো বেশি বাড়াবাড়ি পাচ্ছে, নয় কি? এমন তো নয় যে তিনি কোনো কাজ করতে আদেশ বা নিষেধ করেছেন ব'লে তা জেনেই সচেতনভাবে সবাই তার বিরোধিতা ক'রে থাকে। তুমি যদি একদল লোককে কোনো নির্জন দ্বীপে ছোটবেলা থেকেই বড় হয়ে ওঠার সুযোগ দাও, এবং তাদেরকে যদি রসুল (সঃ) এর আদেশ-নিষেধের কথা কিছুই না জানাও, তাহলে দেখবে যে তাদের মধ্যে তাদেরই সমাজের জন্য ক্ষতিকর লোকগুলো তাই-ই করবে বা সেসব কাজেরই আদেশ করবে যা রসুল (সঃ) এর আচরণবিধির ঠিক বিপরীত দিকে যাবে। এটাই প্রমাণ করে যে তিনি যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন একমাত্র তাই-ই আসল সত্য। কারণ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গোটা সৃষ্টিজগতে যে বিবর্তন হয়েছে তা অনুসারে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান মানোভাব আচরণ স্বাস্থ্য সবকিছু বদলেছে এবং এরূপ পরিবর্তন যেভাবেই ঘটুক না কেন, তার প্রত্যেকটা যুগের জন্য

www.pathagar.com

রয়েছে বিশেষ সর্বিক ভারসাম্যবিন্দু, যা অনুসারে সে-সব যুগের নবী-রসুল (আঃ) গণের আচরণবিধি নির্ধারিত হয়েছে—এমনকি যুগোপযোগী ধর্মগ্রন্থও অবতীর্ণ হয়েছে :

প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে; যখন তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন তারা তাকে এক ঘণ্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, কিংবা তারা তা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৪)

প্রত্যেক যুগের জন্য রয়েছে একটি ধর্মগ্রন্থ (যা আমি অবতীর্ণ করেছি)।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৮)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

আল্লাহ যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং তাঁরই কাছে আছে কেতাবের মূল। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৯)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম পদ্ধতি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি, যা তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। তুমি **সরল পথেই** আছ। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬৭)

(এ কোরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ১৯৫-৯৬)

বিশ্বজগতের জন্য এ (কোরআন) **উপদেশমাত্র**। এর সংবাদের সত্যতা কিছুকাল পরে তোমরা অবশ্যই জানবে। (সূরা সাদ, আয়াত : ৮৭-৮৮)

তবে কি ওরা এই বাণীর ব্যাপারে চিন্তা করে না? না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? (সূরা মোমেনুন, আয়াত : ৬৮)

বুঝাই যাচ্ছে যে এ সবই আল্লাহরই পরিকল্পনা মাত্র—নিয়ম তাঁরই; নিয়ম বদলের নিয়মও তাঁর। এখানে বলা হয়েছে যে যুগে যুগে মানবজাতির জন্য যত ধর্ম পাঠানো হয়েছে তা পবিত্র কোরআনের প্রেরণকর্তা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। অর্থাৎ তিনিই স্পষ্ট ক'রে বলছেন যে তিনিই যুগে যুগে নিয়ম পাল্টেছেন। এটা তাঁরই পূর্বপরিকল্পনায় ছিল, যে-কারণে তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে কোরআনের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং কোরআনেও সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এও বলছেন যে তাঁর বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে এই কথাটার অর্থ কী? এখানেই লুকিয়ে রয়েছে আসল রহস্য যা আল্লাহর স্বভাবধর্মে স্থিত পূর্ণাঙ্গ হৃদয় ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারে না। ব্যাপারটা হলো এই : বিভিন্ন যুগে বিশ্বজগতের সার্বিক অবস্থা ছিল বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু আল্লাহর স্বভাবধর্ম তথা পরকালের বাস্তবতা চিরকাল একই রকমের। ফলে ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রেক্ষাপট থেকে আল্লাহর স্বভাবের দিকে অগ্রসর হতে হলে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ-পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল। অন্য কথায়,

www.pathagar.com

যুগ অনুসারে আচরণবিধিগুলো এমন ছিল যেন স্ব স্ব যুগ তার স্ব স্ব আচরণপদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন বেহেস্তের শ্বাশ্বত বাস্তবতায় উন্নীত হতে পারে। ধরা যাক t_1, t_2, t_3, ..., t_z বছর আগের যুগের ধর্মীয় আচরণবিধিগুলো ছিল যথাক্রমে s_1, s_2, s_3, ..., s_z, এবং পরকালের বাস্তবতায় মনের অবস্থা হলো U। তাহলে, t এর প্রেক্ষাপটে s এর পারলৌকিক রূপান্তর (transformation) হবে এরূপ :

$$t_1 \oplus s_1 = U$$

$$t_2 \oplus s_2 = U$$

$$t_3 \oplus s_3 = U$$

$$t_z \oplus s_z = U$$

এখানে $\oplus$ দ্বারা t এবং s এর মিলিত ক্রিয়াকে নির্দেশ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে প্রতিক্ষেত্রেই একই ফল পাওয়া যাচ্ছে — U, এবং এটাই তো কাম্য। এক্ষেত্রে t এর সাপেক্ষে s এর পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিধানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মৌলিক নিয়মটা হলো — $s \oplus t = U$। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন যে তাঁর নিয়ম ($s \oplus t = U$) এবং স্বভাবধর্মের (U) কোনো পরিবর্তন নেই।

লক্ষ্যের (U) যেন কোনো পরিবর্তন না হয় সেজন্য আল্লাহ্ জাগতিক সূচকগুলোর বা প্যারামিটারগুলোর পরিবর্তন ঘটান। এর কারণ হলো—মানুষকে প্রদত্ত স্বাধীনতার ক্ষতিপূরণ হিসেবে (মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ব'লেই তো সে ভুল ক'রে নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে আনে) তিনি তাকে কিছু ছাড় দিয়েছেন। এর ফলেই তিনি মানুষের ভাগ্য পর্যন্ত পরিবর্তন করেন, আয়ুকে নতুনভাবে নির্ধারণ করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তাঁর সার্বিক নিয়ম কখনও পরিবর্তিত হয় না। এই আসল কেরামতিটাই তিনি নিজের হাতে ধ'রে রেখেছেন। নিয়মের যত আপাত-পরিবর্তন হয়, তার বিধান তিনি ঠিক ক'রে রেখেছেন। নিয়ম বদলের সুযোগ তিনি রেখেছেন এই প্রশ্নটা করার জন্য— 'আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না?' (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)। কিভাবে তিনি নিয়ম বদলান, কিভাবে তিনি তারই নির্ধারিত ভাগ্যালিপির পরিবর্তন করেন, তার কিছু সার্বিক চিত্র এই আয়াতগুলো থেকে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। বিষয়টা জটিল ব'লে আয়াতগুলোকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো :

> কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত। (অর্থাৎ ওরা যে কাজ করেছে তা ওদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মূল কেতাবে (উম্মুল কিতা) কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশের প্রতিজ্ঞা আগে থেকেই রয়েছে ব'লে প্রাথমিক বিচারে সেটাই কার্যকর থাকবে, বর্তমানের সীমালঙ্ঘন নয়। ধ্বংস যদি এখন ঘটে তাহলে তো কেয়ামতের প্রতিজ্ঞার বরখেলাপ হয়ে গেল। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।) (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

www.pathagar.com

ওদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। (সূরা শুরা, আয়াত : ১৪)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (এরূপ শাস্তি পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়ার জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়। কিন্তু শাস্তি ছোট হোক আর বড়ই হোক, তা সংঘটিত করার আগে তা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়—পরবর্তী আয়াতদ্বয় দ্রঃ। এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে ছোট শাস্তির কথাই আগে লিপিবদ্ধ হয়। বড় শাস্তি একবার লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে তো তা সংঘটিত হয়ে যেত, তখন 'পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া' কথাটার কোনো অর্থই থাকত না।—পরবর্তী তৃতীয় উদ্ধৃতি দ্রঃ। অবশ্য এমনও হতে পারে যে শাস্তি একবার লেখা হলেও তা প্রেরিত হবার আগ পর্যন্ত তওবা করার সুযোগ থাকে। আল্লাহই একমাত্র জ্ঞাতা।)

(সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (আয়ু লিখিত ছিল বা আছে কেতাবে। আবার তা পরিবর্তিত হলেও তা হয় কেতাব অনুসারে। তাহলে স্থির এবং অপরিবর্তনীয় কেতাব কোনটা? আসলে এই দ্বিতীয় ইঙ্গিতের কেতাবই হলো মূল কেতাব বা উম্মুল কেতাব—বিধান পরিবর্তনের বিধান তাতেই লেখা আছে এবং তা অপরিবর্তনীয়।) (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

তোমাদের নিটক শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম কেতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, যেন (পরে) কাউকে বলতে না হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টাবিদ্রূপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে—আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৪-৫৭)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (অর্থাৎ কৃত পাপের তুলনায় দ্রুত মৃত্যু/ধ্বংস দেয়া হয়নি—মূল কেতাব অনুসারে বারবার অবকাশ দেয়া হয়েছে—যার কারণে জীবনকে অবশ্যই দীর্ঘ বলতে হবে। অবকাশ মানেই আল্লাহর করুণা।) (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—সম্ভবত কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং

www.pathagar.com

জানে যে তা সত্য। (স্বয়ং আল্লাহই বলছেন **'সম্ভবত'**। তাহলে কি তিনি নিজেই জানেন না কখন তা ঘটবে? অবশ্যই জানেন। আসলে মূল কেতাবে লিকিত আছে—'পাপের পরিমাণ এই স্তরে উঠলে সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য পুরোপুরি বিঘ্নিত হবে, ফলে কেয়ামত হবে'—এরূপ কোনো বিধান। অর্থাৎ কেয়ামতের জন্য সময় নির্ধারিত ক'রে রাখা হয়নি, পাপের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে, যার ফলে তার আসন্নতাকে মাপা যায় কেবল **লক্ষণ/উপসর্গ** দ্বারা। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ। সেই লক্ষণগুলো রসুল (সঃ) বলেই গেছেন। সময়টাকে আল্লাহ আমাদের কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত ক'রে দিয়েছেন ব'লে তিনি সময়ের হিসাবটা আমাদেরকে ব'লে দেননি। আমরা যদি বেশি বেশি পাপ ক'রে দ্রুত আমাদের সময়কে ক্ষয় ক'রে ফেলি, তাহলে তা তো শীঘ্রই আসবে। নির্ধারিত দিন (সময়ের মাপে) কেবল আল্লাহই জানেন। তা প্রকাশ করলে তো আর পরীক্ষা অর্থপূর্ণ হতো না—সবকিছু ফয়সালা হয়ে যেত।)(সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (এখানে কেয়ামতের 'আসন্নতাকে' মাপা হয়েছে **লক্ষণ** দ্বারা, **সময়** দ্বারা নয়!) (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

... তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩০)

আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৮৩)

আমিই ... লিখে রাখি যা ওরা (মানুষ) **আগে পাঠায়** এবং যা পেছনে রেখে যায়।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১২)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (**নিজেদের এবং অপরের**) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

আল্লাহ্‌ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্যস্তরে আরোহন করবে।(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১৯)

সরলপথের নির্দেশ আল্লাহর দায়িত্ব, এবং তার মধ্যে বক্র কুপথও আছে।
(সূরা নহল, আয়াত : ৯)

... আল্লাহ—তিনিই পরম বাস্তবতা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬২)

বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। (অর্থাৎ কত রূপান্তরের মধ্যদিয়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন।)
(সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২০)

গোটা সৃষ্টিজগতের সর্বকালের সার্বিক ভারসাম্য স্থিত হয়েছে যে বিন্দুতে, সেই বিন্দুটা ক্রিয়াশীল একটা হৃদয়ের মধ্যে, যে-হৃদয়ের ধারকের নাম হযরত মুহাম্মদ

www.pathagar.com

মুস্তাফা (সঃ)। তিনিই হলেন সকল সৃষ্টিকূলের কেন্দ্রবিন্দু। তার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শোনো তাহলে :

- শেষ যুগে একই স্থানে বারবার ভূমিকম্প হবে ভূমিকম্পের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষের রূপ পরিবর্তন হবে (যেমন, হরমোন থেরাপি, কসমেটিক সার্জারী, হিউম্যান ক্লোনিং এর মাধ্যমে।
- নতুন নতুন ওষুধ এবং রোগের আবির্ভাব ঘটবে।
- সমাজের অধিপতি হবে নিষ্ঠুর এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।
- ইল্‌ম (জ্ঞান) বাড়বে কিন্তু 'আমল (তদনুযায়ী কাজ করা) কমবে।
- মানুষের লজ্জা ক'মে যাবে। মানুষ রিপুর পূজা করবে।
- ধর্ম নিয়ে ব্যবসা হবে।
- ইসলামের তথাকথিত ধার্মিকেরা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।
- আরববাসীগণ তথা পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত ধনবান হবে।
- মানুষ বড় বড় ভবন বানাবার প্রতিযোগিতা চালাবে।

ইত্যাদি।

এগুলো কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ফলেনি? একটু ভেবে দ্যাখ।

প্রশ্ন হলো : তিনি এসব ভবিষ্যত তথ্য আগে থেকে জানলেন কিভাবে? জবাব হলো : আল্লাহ-ই তাঁকে জানিয়েছেন। তাঁকে গোটা সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রস্থানে স্থাপন করা হয়েছে—তাঁর এই কেন্দ্রিকতাই তাঁর সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং অধিকার। যিনি কেন্দ্র, তাঁকে প্রশ্নও করার প্রয়োজন হয় না তিনি কিভাবে তাঁরই শাখা-প্রশাখার জ্ঞান রাখেন : **তাঁর চেতনা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তরের ব্যবধান ছিল না।**

যাহোক, তোমার ভবিষ্যত তুমি নিজেও জান। কিন্তু তুমি সচেতন নও যে তুমি তা জান।

সে কেমন?

হ্যাঁ। আমরা তো আগেই জেনেছি যে মানুষের মনোবৃত্তি কর্মধারা জৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড এগুলো থেকেই সময়ের সৃষ্টি হয়। মানুষের কর্মফলকে সময় বয়ে নিয়ে তা তার দিকে ধাবিত হয় ভবিষ্যত থেকে বর্তমানের দিকে। সময় তাকে বর্তমানে এসে তাই-ই উপহার দেয় যা সে অতীতে করেছিল। ব্যাপারটা একটা বৃত্তের মতো, যেখানে তুমি স্থির হয়ে আছ এবং সময় তোমা থেকেই সৃষ্ট হয়ে ভবিষ্যত হয়ে তোমার বর্তমানে এসে তোমার সাথে দেখা করছে।

www.pathagar.com

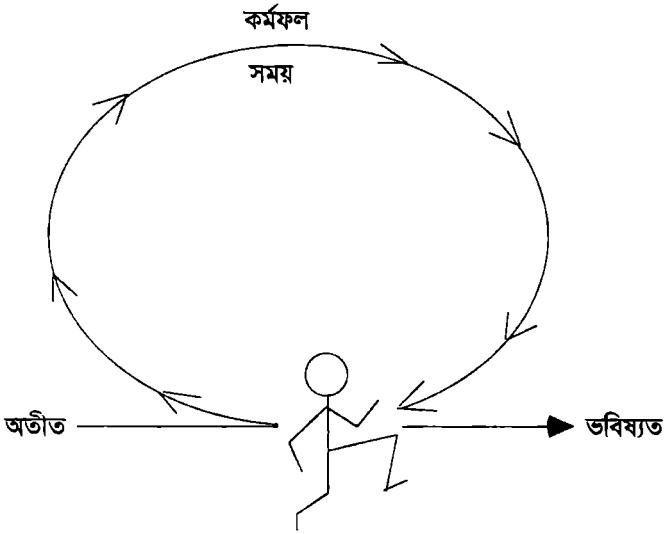

বিজ্ঞানও এখন তাই বলে। কোরআনেও একথা বলা হয়েছে :

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে বা তোমাদের মনোজগতে এমন কোনো দুঃখ-দুর্দশায় কারণ ঘটে না যা ঘটানোর আগে আমি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখিনি; আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ।

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত ২২-২৩)

সময়ের ফর্মুলায় আটকানো জীবনকে কোরআনে স্বপ্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে অবস্থান করার সময়ে তাকে দীর্ঘ মনে হয়, অথচ ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে তা ছিল সামান্য দশ মিনিট ঘুমের মধ্যে এক ঝলকের কিছু দৃশ্য। আল্লাহ বলেছেন যে জীবনটাও দীর্ঘ, যদি তাকে ভেতর থকে মাপা হয়, কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত, যদি তাকে পরকালের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে মাপা হয় :

www.pathagar.com

ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে—তোমরা পৃথিবীতে **মাত্র** দশদিন অবস্থান করেছিলে। ওরা কী বলবে তা আমি ভালো জানি। ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলবে—তোমরা **মাত্র একদিন** অবস্থান করেছিলে।

(সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১০৩-১০৪)

... তারা বলবে কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে? বল–তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবারের মতো সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর ওরা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে—তা কবে? বল—হবে। **সম্ভবত** শ্রীঘ্রই। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দেবে, এবং তোমরা মনে করবে–তোমরা **অল্পকালই** অবস্থান করেছিলে। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৫১)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের কাছে **শয়তান ছেড়ে রেখেছি**–ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দেবার জন্য। সুতরাং ওদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি ক'র না, আমি তো **গণনা করছি**–ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। (আল্লাহ্ নিজেই গণনা করেছেন—একথার **অর্থ কী?** এর অর্থ হলো—নির্ধারিত রয়েছে মোট জীবনীশক্তি; ওরা পাপের দ্বারা তা দ্রুত ক্ষয় ক'রে আয়ুকে সময়ের নগদ টাকায় ভাঙিয়ে কত দ্রুত ফতুর হচ্ছে এবং ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে—তার প্রতি নির্দেশ করার জন্য আল্লাহ এভাবে কথা বলেছেন। সঞ্চয়পত্র ভাঙালে যেমন নগদ টাকা পাওয়া যায়—এবং একেক মেয়াদে ভাঙালে একেক পরিমাণের টাকা পাওয়া যায়, তেমনি মোট নির্ধারিত জীবনীশক্তি ভাঙালেও সময় পাওয়া যায়—তাকে পাপ দ্বারা ভাঙালে তার বিনিময় ক'মেই যেতে পারে।) (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৮৩-৮৪)

প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে; যখন তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন তারা তাকে এক ঘণ্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, কিংবা তারা তা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৪)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (এখানে কেয়ামতের 'আসন্নতাকে' মাপা হয়েছে **লক্ষণ** দ্বারা, **সময়** দ্বারা নয়!) (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—**সম্ভবত** কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ্, আয়াত : ১৭-১৮)

তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩)

আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের ভাগ্য মীমাংসিত হয়ে যেত (তারা ধ্বংস হয়ে যেত)। সুতরাং

www.pathagar.com

যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদেরকে নিজ অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই। (অর্থাৎ কোনো ঘটনাকে ত্বরান্বিত করা-না-করারও একটা অর্থ আছে, কারণ তা সম্ভব। ত্বরান্বিত করা মানেই হলো সময়ের মাপে কোনো ঘটনাকে দূর ভবিষ্যৎ থেকে আরো কাছে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আনা।)

আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, যেন প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে। (একেক আসমানের সময়-মাপ একেক রকমের : বিজ্ঞানও তাই বলে, হাদীসে এবং কোরআনেও তাই বলা হয়েছে। মানুষ যে কাজ করে তার জন্য তাকে কতটুকু সময় বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে হবে তা আসমানের সৃষ্টিফর্মুলার সাথে ঠিক করা আছে। এভাবে মানুষ যে-কাজ করে, আসমান থেকে তা অনুসারে তার জন্য মূল কেতাবের বিধান অনযায়ী পুনঃপুন সময় সৃষ্ট এবং নির্ধারিত হয়।)

(সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রতিশ্রুতি। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতোই সত্য।

(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২)

তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে এবং একটা সময় নির্ধারিত না হলে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো। (অর্থাৎ পূর্বঘোষণা অনুসারে অবকাশ বা সময় দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের আমল বা কাজ এর বিচারে তাদের শাস্তির সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মকে আর চলতে দেয়ার সময় শেষ হয়েছে। তারা তাদের সময়কে ফুরিয়ে ফেলেছে—এখন তারা ভোগ করছে আল্লাহর দেয়া অবকাশ বা অতিরিক্ত সুযোগ। এ সুযোগ তিনি তাদেরকে দিয়েছেন তাঁর পূর্বঘোষণাকে বহাল রাখার জন্য। লক্ষ্য করতে হবে; সময়কে স্থির ধ'রে 'তার গতিকে কম বা বেশি ত্বরান্বিত করার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন' এভাবে বিবেচনা করলেও সব হিসাব মিলে যায়! তার মানে হলো এই যে আল্লাহ একটা স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছেন, তা হলো—সবকিছু নির্ধারিত এবং স্থিরীকৃত—তোমরা শুধু তাকে আগুপিছু করতে পার, মূল বিধান বাদে। অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।) (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১২৯)

প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেই দেয়া হয়েছে যে মানুষের আজকের কাজ দ্বারা তার আগামীদিনের প্রাপ্য এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্ট হয়ে তা ভবিষ্যৎ থেকে তার বর্তমানের দিকে ছুটে আসছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ আয়াত একথাকে সমর্থন করছে। এতে বলা হচ্ছে যে মানুষের গতদিনের কাজ আল্লাহর অনুমতি লাভ ক'রে ফলশ্রুতি নিয়ে তার আজকের সময় এবং ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে আজ যা ঘটেছে তার জন্য তার দুঃখ পাবার বা অহংকার করারও কিছু নেই—তা তো ঘটবে ব'লে নির্ধারিত হয়ে গেছে; তাকে রদ করার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ স্পষ্টভাবেই পূর্বনির্ধারণের কথা বলছেন, আবার তা অনুসারেই তিনি নির্ধারিত ঘটনার সময়কে সামনে বা পেছনে সরিয়ে দেয়ার কথাও বলছেন। তিনি এও বলছেন যে পরকালে সবার মনে হবে যে তারা অল্পকালই ঘুমিয়েছিল—সবচেয়ে কম সময় ঘুমিয়ে থাকার কথা বলবে তারা যারা সৎকাজ করে—একথাও কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করাই হচ্ছে যে সময় এক-

www.pathagar.com

এক জনের জন্য এক-এক রকমের। এবং প্রত্যেকের মৃত্যু হলো তার নিজস্ব সময়ের শেষপ্রান্ত। প্রত্যেকের মৃত্যু মানেই তার জন্য কেয়ামত—ঠিক সার্বিক কেয়ামতের মতো। অর্থাৎ কেউ ম'রে গেলেও পৃথিবীর সময় ঠিকঠাক থাকে—মৃতের কাছে একথার কোনো অর্থ নেই। সে তখন সবারই সময়ের শেষ দেখে ফ্যালে। কিন্তু তা পৃথিবীর কাউকে জানাতে পারে না, স্বপ্নযোগে কিছু করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া। অর্থাৎ সময় একটা অনুভূতিমাত্র। কারণ মানুষের কাজ থেকেই সময়ের অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কঠোর সাধনা ক'রে যারা অসীমের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তারা পার্থিব সময়ের সীমাকেই, অর্থাৎ সময়-নামক আঠালো মায়াকেই, অতিক্রম ক'রে যান।

সময় কখনও অতীতে পৌঁছায় না। সময়ের সাথে জীবনধারা এবং গতি জড়িত। অতীত রয়েছে কেবল চিত্রে—অর্থাৎ স্মৃতিতে, যা সময়ের রং মাখলেও সময়কে অতিক্রম করেছে। সময় সর্বদাই কিছু পরিবর্তন আনে। আমরা সময়কে চিনি বা চিহ্নিত করি এই পরিবর্তন দ্বারাই। তোমার দেশের আবহাওয়া এবং সব মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে যদি দশ বছর ধ'রে কোনো পরিবর্তন না আসত, তাহলে তুমি ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনোভাবেই সেই দশ বছরকে মাপতে পারতে না। যেহেতু তখন তুমি কোথাও কোনো পরিবর্তন দেখতে পেতে না। তুমি সময়কে অনুভব করতে না।

অতীত ব'লে কোনো স্থান বা রাজ্য নেই। সব স্থান বা স্পেসই বর্তমানের। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে কেবল আমাদের আত্মচেতনায়, যার সম্প্রসারণের সাথে সাথে সময়ের বাস্তবতাও পাল্টে যায়।

কোনো স্পেস বা স্থান ছাড়া সময় ব'লে কিছু থাকতে পারে না। ফলে অতীত শুধু স্মৃতিমাত্র—তা কোনো অস্তিত্ব বা বাস্তবতা নয়।

বর্তমানকে যদি একটা প্যাঁচানো কাগজের চাকা বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে অতীত হলো তার বিভিন্ন স্তর বা ভাঁজ মাত্র। অন্য কথায়, অতীত হলো বর্তমানের একটা স্তরমাত্র। বর্তমানও ভবিষ্যতের একটা স্তরমাত্র, যার সাথে আমাদের আত্মসচেতনতা আঠার মতো গেলে আছে। আল্লাহর বুযুর্গগণ জীবনের এক মুহূর্তের জন্যে হলেও এই শাশ্বত সময়হীন বাস্তবতার সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অবশ্য একথা সত্য যে সবাইকে বাস্তবতার সব স্তরের জ্ঞান দেয়া হয় না। এমনকি তুমি নিজেও এমন কিছু ঘটনার স্বপ্ন দেখতে পার যা তোমার জীবনে ভবিষ্যতে ঘটবে। এবং এরূপ ঘটনা সবার জীবনেই ঘটে।

আমাদের স্বপ্নের লীলাভূমি হলো আমাদের চেতনা—আসলে চেতনা আর বাস্তবতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য সৃষ্টি করে আমাদের আত্মচেতনা, যার জ্ঞানের পরিধিটুকুই তার কাছে সত্য, বাকি সব তার কাছে মিথ্যা।

ফলে অনেক সময়ে স্বপ্নে আমরা তাই দেখি যা ভবিষ্যতের জন্য ঘটে গেছে, যদিও আমাদের আত্মচেতনা তার সাথে এখনও মিলিত হয়নি। স্বপ্নের বাস্তবতার

www.pathagar.com

লজিক এমন যা জাগরণের বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না। অথচ যতক্ষণ আমরা স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ আমাদের মনেই হয় না যে যা ঘটছে তা অযৌক্তিক। স্বপ্নের ঘটনাকে আমরা অযৌক্তিক বলি কেবল জাগরণের যুক্তি-বিচার প্রয়োগ ক'রেই। আসলে আমাদের দৃশ্য জগতের চেয়ে স্বপ্নের জগতের মাত্রা একটা বেশি। ফলে যে-ঘটনা দৃশ্যজগতে আত্মবিরোধের সমতুল্য ব'লে এখানে ঘটতে পারে না, স্বপ্নরাজ্যের যুক্তিতে তা সম্ভব এবং আত্মবিরুদ্ধ নয় এবং সেখানে তা ঘটেও।

বাস্তবতা থেকে যুক্তির সৃষ্টি হয়, যুক্তি বাস্তবাতাকে সৃষ্টি করে না। তুমি যখন স্বপ্নে বিচরণ কর,তখন দূর থেকে কোনো ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ কর না, তুমি নিজেও সেই ঘটনার অংশ হিসেবে নিজেকে খুঁজে পাও। অর্থাৎ স্বপ্ন কোনো কল্পনা বা মনের অনুভূতিজাত যুক্তির কাহিনীসুলভ বর্ণনা নয়—তা নিজেই একটা বাস্তবতা। তাতে তুমি রয়েছ, ছিলে, থাকবে। তোমার অস্তিত্ব চলছে ভবিষ্যত থেকে বর্তমানের দিকে; তোমার আত্মসচেতনতা তাকিয়ে আছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। কোনো ঘটনাকে মানুষ সেভাবেই দ্যাখে যেভাবে তা তার আত্মচেতনার আয়নায় বিম্বিত হয়। তুমি যদি ভবিষ্যতের দিকে পেছনে ফিরে অতীতমুখী হয়ে তোমার আত্মচেতনাকে ক্রিয়াশীল করতে পারতে, তাহলে দেখতে যে তুমি বাইরে থেকে আবার ভেতরে ঢুকে গেছ—এবং তুমি সব 'বাহিরকে' অতিক্রম করতে এবং এমন রাজ্যে পৌঁছে যেতে যেখান থেকে সময় সৃষ্টি হয় এবং সেখানেই তা আবার ফেরত যায়। তুমি যদি দূর থেকে সময়ের তীরকে দেখতে পেতে, তাহলে তাকে অতিক্রম করতে পারতে—আর কোনো যন্ত্রপাতিরই দরকার হতো না। কিন্তু সময়ের তীর তোমার আত্মচেতনার মধ্য দিয়েই ক্রিয়াশীল। তার তীরের মধ্য দিয়েই তুমি বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে আছ। এ কারণে তার চশমার মধ্য দিয়েই তোমাকে তাকাতে হয়—তুমি তার চশমার রং-এর বাইরের কোনো রং দেখতেও পার না। তার 'বাহির' ব'লে কিছু আছে কি-না তাও তুমি ধারণা করতে পার না; কারণ তুমি যার মধ্যে আছ সে তার ভেতরটাকে তোমার 'বাহির' ব'লে সংজ্ঞায়িত করবে। অর্থাৎ তুমি সময়ের হাতে বন্দী; কেননা সময় তোমার থেকেই সৃষ্ট হয়। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুই তার জন্য কেয়ামত স্বরূপ হবে—সে মৃত্যুর সময়ে তার সময়-ভ্রমণের প্রান্তে গিয়ে হাজির হবে।

> সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। (অর্থাৎ মানুষ এ ব্যাপারে বুঝতে না পারলেও তা জানবে তার আয়ু নামক ক্ষুদ্র সময়-ভ্রমণের প্রান্তে গিয়ে।)
>
> (সূরা আছর, আয়াত : ১-২)

> আসমান ও জমিনের অদৃশ্য-জ্ঞান আল্লাহরই—এবং সেই মুহূর্তের (কেয়ামতের) ব্যাপার তো চোখের পলকের মতো, এবং তার চেয়েও নিকটবর্তী। (সূরা নহল, আয়াত :৭৭)

সময়ের ফর্মুলায় আটকানো জীবনকে কোরআনে স্বপ্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে অবস্থান করার সময়ে তাকে দীর্ঘ মনে হয়, অথচ ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমরা

www.pathagar.com

বুঝতে পারি যে তা ছিল সামান্য দশ মিনিট ঘুমের মধ্যে এক ঝলকের কিছু দৃশ্য। আল্লাহ্ বলেছেন যে জীবনটাও দীর্ঘ, যদি তাকে ভেতর থকে মাপা হয়, কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত, যদি তাকে পরকালের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে মাপা হয়।

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

জীবনের ভেতরকার স্কেলের মাপে তার দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বড়, কিন্তু শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গোটা সৃষ্টিজগতের বয়সকে মাপলেও তাকে তুচ্ছ মনে হবে—ঠিক যেন স্বপ্ন!

ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে—তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। ওরা কী বলবে তা আমি ভালো জানি। ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলবে—তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।
(সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১০৩-১০৪)

আবার গোটা সৃষ্টিকুলের কেয়ামতও হবে সার্বিকভাবে—যার চিত্রও হবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কেয়ামতের অনুরূপ। **কেয়ামতের সময়ে ঘটবে কী? প্রত্যেকের আত্মচেতনা বাইরে থেকে আবার ভেতরে ঢুকে যাবে। আর তখনই জানা যাবে যে এই বাইরের জগৎ ছিল মায়া—এর সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গুড়িয়ে যাবে :**

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, এবং এটাই তার **স্বভাবগত কর্তব্য** (অর্থাৎ তার কর্মপদ্ধতির ফর্মুলার মধ্যে প্রবিষ্ট নিয়ম)। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত ক'রে সমতল করা হবে। এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। (সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১-৪)

যখন সূর্যকে সংকুচিত করা হবে। যখন নক্ষত্র খ'সে পড়বে। পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে। সমুদ্র যখন স্ফীত হবে ... . যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে—সে কী নিয়ে এসেছে। আমি ভ্রাম্যমাণ গ্রহনক্ষত্রের শপথ করি, যা গতিশীল ও স্থিতিবান। (এবং শপথ) রজনীর যখন তা গত হয়। এবং উষার, যখন তার আবির্ভাব হয়। নিশ্চয় এ কোরআন এক সম্মানিত রসূলের ওপর অবতারিত আল্লাহ্‌র বাণী।
(সূরা তাক্‌ভীর, আয়াত : ১-১৯)

স্পেস বা শূন্যতাও ফেটে যাবে। শূন্যতাও যে একটা সৃষ্টি,তাও যে ফেটে যেতে পারে, তা বিজ্ঞানও জানত না—কিছুদিন আগে আইনস্টাইনই প্রথমে একথা তত্ত্বীয়ভাবে বলেছিলেন। অবশ্য তিনি বললে কী হবে, প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরাই বুঝতে পারেননি তিনি কী বলেছিলেন। কিন্তু পবিত্র কোরআনে সেই চোদ্দশ' বছর আগেই আল্লাহ্ ব'লে দিয়েছেন যে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংসের সময়ে শূন্যতা ফেটে যাবে। ফলে বোঝা যাবে যে এতদিন যা ছিল সবই মরিচিকা, মায়া। কোরআনেও তাই বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

মানুষ বলবে—একী হলো? ... কারণ ওদেরকে ওদের কর্মফল দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে। (সূরা যিলযাল, আয়াত : ১-৮)

এই দেখা বড়ই কঠোর। যাদের তওবা আল্লাহ্ কবুল ক'রে নেন, তাদেরকে তাদের জীবদ্দশাতেই এই কর্মফলের কদর্যতা দেখিয়ে তাদের মধ্যে নিজের অতীতের প্রতি ঘৃণাপ্রবণ করা হয়। যে সব পাপ ক্ষমা হয়নি, তা দেখানো হয় মৃত্যুর সময়ে। হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহঃ)-কে প্রাণদণ্ড দেবার সময়ে তিনি আফসোস ক'রে বলেছিলেন—'একদিন এক যুবতীর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছিলাম, আজ তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হলো।' তাঁকে সেই পাপ দেখানো হয়েছিল। মৃত্যুর সময়ে মানুষ দেখবে যে তার কাছে গোটা বাস্তবতা চুরমার হয়ে গেছে—সে অন্য এক বাস্তবতায় পৌঁছে যাচ্ছে।

... তোমরা এই জগতের ক্ষুণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

এই পার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।
(সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

সেদিন প্রকৃত বাস্তবতা নিকটবর্তী হবে। এ কারণে বাস্তবতার ছায়া বিলুপ্ত হতে থাকবে। আসলের দৌরাত্মে নকল নিশ্চিহ্ন হবে :

তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।
(সূরা শোয়ারা, আয়াত : ১২৯)

কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত।
(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

তারা কি অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আল্লাহ মেঘের আবরণ নিয়ে এসে উপস্থিত হন, এবং ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে, এবং সেভাবে বিষয়টা মীমাংসা হয়ে যায়?
(সূরা বাকারা, আয়াত : ২১০)

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, এবং এটাই তার স্বভাবগত কর্তব্য। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত ক'রে সমতল করা হবে। এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।
(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১-৪)

যখন সূর্যকে সংকুচিত করা হবে। যখন নক্ষত্র খ'সে পড়বে। পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে। সমুদ্র যখন স্ফীত হবে ... . যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে—সে কী নিয়ে এসেছে। আমি ভ্রাম্যমাণ গ্রহনক্ষত্রের শপথ করি, যা গতিশীল ও

www.pathagar.com

স্থিতিবান। (এবং শপথ) রজনীর যখন তা গত হয়। এবং উষার, যখন তার আবির্ভাব হয়। নিশ্চয় এ কোরআন এক সম্মানিত রসূলের ওপর অবতারিত আল্লাহর বাণী।

(সূরা তাক্‌ভীর, আয়াত : ১-১৯)

যেদিন আকাশ মেঘাপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।

(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

সেইদিনই আল্লাহর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে। তিনিই ওদের বিচার করবেন।

(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৬)

তখনকার যে-বাস্তবতা হবে তার গঠনকাঠামো হবে এমন যে তাতে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির আত্মচেতনা তার কেন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে ক্রিয়াশীল থাকবে। ফলে যার জীবনের আচরণ এবং কাজকর্ম গোটা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার সার্বিক ভারসাম্যের সাথে মিলে যায়, অর্থাৎ রসুল (সঃ)-এর বা স্ব-স্ব যুগের নবী-রসুলের (আঃ) আচরণের অনুগামী হয়, সে এভাবে বাস্তবতার কেন্দ্রের সাথে নিজেকে একাত্ম হিসেবে খুঁজে পায়—এবং ফলে সে গোটা সৃষ্টিজগৎকে দেখতে পায় নিজের মধ্যে—অর্থাৎ তারই আমিত্বের সাথে প্রবল মমতার টানে বাঁধা। অন্য কথায়, সব বেহেস্তবাসীর মন হবে একটা, কারণ তাদের সবার আমিত্বের একটাই কেন্দ্র হবে :

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (অর্থাৎ সব জীবজন্তুর অস্তিত্বই মানুষের মনের সাথে বাঁধা।)

(সূরা ফাতির, আয়াত : ৪৫)

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

(আমি) তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪৩)

আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব—তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে। (সূরা আল্‌-হিজর, আয়াত :৪৭)

কিন্তু বর্তমানের আপেক্ষিক-মাত্রার মধ্যে আমরা প্রত্যেকের আমিত্ব নিয়ে ব্যস্ত। এখানে বাস্তবতা আমাদের সেবায় নিয়েজিত ব'লে আমরা সবাই বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বার্থপরের মতো সুযোগ-গ্রহণে ব্যস্ত :

অতঃপর আমি বললাম হে আদম! (ইবলিস) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের ক'রে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি বেহেস্তে ক্ষুধার্ত হবে না ও বস্ত্রহীন (বা নগ্ন) হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না, এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।,অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল–হে আদম! আমি কি তোমাকে ব'লে দেব অনন্ত জীবন-দায়ী বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা তার ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের

www.pathagar.com

কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং তারা উদ্যানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। তিনি বললেন–তোমরা **একে অপরের শত্রুরূপে** একই সাথে **বেহেস্ত থেকে নেমে যাও**। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৭–১২৩)

তখন শয়তান তাদেরকে বেহেস্তের বাগান থেকে নামিয়ে ছাড়ল, এবং তাদেরকে আনন্দময় অবস্থা থেকে বের ক'রে আনল যাতে তারা অবস্থান করছিল। আমি বললাম। "নেমে যাও সবাই, **একে-অপরের মধ্যে শত্রুতা নিয়ে**। কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী হবে তোমাদের আবাসভূমি এবং রুজি-রোজগারের স্থান।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৬)

সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। (অর্থাৎ মানুষ এ ব্যাপারে বুঝতে না পারলেও তা জানবে তার আয়ু নামক ক্ষুদ্র সময়-ভ্রমণের প্রান্তে গিয়ে।)
(সূরা আছর, আয়াত : ১-২)

মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। (বিতর্কই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে।)
(সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫৪)

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (কামনা-বাসনার উপাসনা করার কারণেই প্রত্যেকে যার যার স্বার্থের কথা ভাবে, বিচ্ছিন্নতাবাদীর মতো আচরণ করে।) (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

কিন্তু পরকালের পরম (Absolute) বাস্তবতা যাবতীয় আত্মচেতনাকে দুভাগে ভাগ ক'রে ফেলবে। আল্লাহর আদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা ঘটে যাবে—কারণ পরম বাস্তবতা কষ্ঠিপাথরের মতো, তা কোনটা সোনা কোনটা লোহা তা যাচাই করবে; এই যাচাইয়ের প্রক্রিয়াই আসল থেকে নকলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে। অন্যভাবে বিচার ক'রে দেখ, **পরকালের বাস্তবতায় আল্লাহর ঐক্য বা তাওহীদ পূর্ণভাবে এবং দৃশ্যমানরূপে প্রকাশিত হবে। এই একত্বকে স্বীকারকারী আত্মা তাঁর সাথে পূর্ণাঙ্গ সহাবস্থানে থাকবে এবং তাঁকে অস্বীকারকারী বা অংশীদারী আত্মা তাঁকে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করতে না পেরে নিজেই নিজেকে শতধা করবে, অত্যাচার করবে, দোষারোপ করবে :**

আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা ক'র না, বহুবার ধ্বংস কামনা করতে থাক।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ১৪)

আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে **আগেই যে অঙ্গীকার** গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে (অর্থাৎ তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল)। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৭)

www.pathagar.com

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর স্বভাবের অনুসরণ কর, যে-স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—এটাই সরল চিরস্থায়ী দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই অভিমুখী হও; তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর ... (সূরা রুম, আয়াত : ৩০-৩১)

সেদিন (বিচারের দিন) অত্যাচারী নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে–হায়! আমি যদি রসুলের (সাঃ) সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়! দুর্ভোগ আমার! আমি যদি (অমুক) শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার নিকট কোরআন পৌঁছাবার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করে।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৭-২৯)

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

(এবং বলা হবে) হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৫৯)

কেন্দ্রের সাথে নিজেদের আমিত্বকে যারা মেলায়নি কেন্দ্র তাদেরকে বিকর্ষণ করবে—এবং সে দোষ কেন্দ্রের নয়, তাদেরই। তারা নিজেরাও কেন্দ্রকে দোষ দেবে না, তারা দোষারোপ করবে নিজেদেরকেই।

আল্লাহর অলিগণ জীবদ্দশাতেই তাঁদের আমিত্বের ক্ষুদ্রত্বকে ধ্বংস ক'রে কেন্দ্রের সাথে নিজেদের আত্মসচেনতাকে একাত্ব ক'রে দেন বা একই সরলরেখায় অবস্থান করেন, এবং ফলে তারা জীবদ্দশাতেই তাই জেনে যান যা মানুষ জানবে মৃত্যুর পরে; তারা হয়ে যান সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী; তারা সাক্ষ্য দেন : আশ্-শাহদু আল্-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু অশ্-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ–রসুলুহু। তারা শুনেও সাক্ষ্য দেন, দেখেও সাক্ষ্য দেন। **তারা মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যান। তারা এমন অবস্থায় চ'লে যান যেখানে তাদের আত্মচেতনাও আর লোপ পায় না এবং ফলে তাদের আমিত্বের কোনো মৃত্যু হয় না—মৃত্যু হয় শুধু দেহের। তারা তাদের গোটা আমিত্বকে দেহের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছেন ব'লে তারা মৃত্যুর আগেই মুক্তি লাভ করেছেন।**

কিছু মানুষ ভুলবশত মনে ক'রে বসে যে মৃত্যুর সময়ে সবাই-ই মুক্ত হয়ে যাবে এবং বেহেস্তে চ'লে যাবে। পরকালে দোজখ বলে কিছু নেই, দোজখ হলো ইহকালটাই।

তারা ভ্রান্ত! হাত-পায়ে বেড়ি লাগানো কয়েদিকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেও সে মুক্তি পেয়েছে বলা যায় না। তেমনি যে-আত্মা পথ দ্যাখেনি এবং পরম বাস্তবতাতে বসবাসের উপযুক্ত হয়নি, সে মৃত্যুর সময়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছাড়া পাবে, মুক্তি পাবে না। মুক্তি হলো আমিত্বের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং কেন্দ্রের সাথে ধর্মীয় আচরণ যেমন নামাজের মাধ্যমে নিজেকে একই সমতলে বা সরললেখায় স্থাপন

www.pathagar.com

করানো। তা ঘটতে হবে জীবদ্দশাতেই। তা না হলে আমরাই আমাদের এখানকার দোজখকে পরকালে নিয়ে যাব এবং তাতে হাত-পা গুটিয়ে নিজেরই পাপের জ্বালানির তীব্র শিখায় জ্ব'লে-পু'ড়ে ছাই হতে থাকব।

একথা ঠিক যে আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে দোজখের মধ্যেই পাঠিয়েছেন, যেন আমরা সব জ্বালা-পোড়ার কাজ এখানেই সাঙ্গ ক'রে যাই। অথচ আমরা আমাদের দোজখকেই পরকালের জন্য রেখে দিয়ে বেহেস্তটাকে এখানে ভোগ করতে ব্যস্ত।

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

মানুষ নিজের ওপরেই জুলুম ক'রে থাকে। আল্লাহ কারো ওপর জুলুম করেন না। আমরা ভবিষ্যতের জন্য যা সঞ্চয় করি, ভবিষ্যতে তাই-ই ভোগ করি।

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

আমরা যদি আমাদের সৃষ্ট দোজখকে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখি, তহালে ভবিষ্যতে আমাদেরকে সেখানেই বসবাস করতে হবে।

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

নামাজ হলো বেহেস্তের চাবি। তুমি যদি তা হারিয়ে ফেল, তাহলে তোমাকে কেউই বেহেস্তের দরজা খুলে দেবে না।

আমার সেই বন্ধু সেদিনের মতো বিদায় নিল।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম সে মুসলমান হয়ে গেছে। তাকে শুধু এটুকুই বললাম—ভেতরে যে তুমি মহৎ ছিলে, তোমার ভেতরে যে সত্যিকারের একটা ভালোমানুষ লুকিয়ে ছিল, তুমি তার প্রমাণ দিলে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

www.pathagar.com

আট

দুঃখ-কষ্ট রোগ-ব্যধির কারণ : কোরানিক ব্যাখ্যা

কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানী, কি ধার্মিক, কি রোগী, কি ডাক্তার—আমরা সবাই ধ'রে নেই যে জীবন থাকলে দুঃখ-কষ্ট থাকবে; দেহ-মন থাকলে রোগ-ব্যাধি থাকবে।

কিন্তু কেন থাকবে?

কেন-র জবাব না জানার কারণে আমরা সবকিছুর ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে আল্লাহকে দোষারোপ করি। এটা খোদাদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহলে কি দুঃখকষ্ট তিনি দেন না?

সুন্দর প্রশ্ন। সুতরাং সুন্দর জবাব দরকার। অনেকে শুধু প্রশ্নটা ক'রেই হুংকার দিয়ে চ'লে যায়। ভাবখানা এমন যেন তাদের প্রশ্নের ধরণটাই তাদের জবাব এবং ফলে তারা অন্য কোনো জবাবের আশা করে না।

জবাব হলো : যদি এই বিশ্বাস থেকেই থাকে যে দুঃখকষ্ট আল্লাহ দিচ্ছেন, তাহলে তো চোখ বুঁজে আনন্দের সাথেই মেনে নেয়া উচিত যে এই মুহূর্তে আমার জন্যে এই দুঃখকষ্টই সবচেয়ে মঙ্গলজনক। সেভাবে সবকিছুকে মেনে নিচ্ছেন না কেন?

আসলে আমরা এতই মোনাফেকি চরিত্রের যে সব ভালো কাজের সুনাম আমরা নিজেরা ভোগ ক'রে সব খারাপ কাজের দোষ আল্লাহর ওপর চাপাই কিংবা অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করি :

> আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

> মানুষের প্রতি দয়া দেখালে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। বল [হে মুহাম্মদ (সঃ)]—তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরাআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং এ তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত আছ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী বিশ্বজগতে প্রকাশ করব এবং (প্রকাশ করব) ওদের নিজেদের (মনোজগতের) মধ্যেও, ফলে ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই (কোরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সব

www.pathagar.com

বিষয়ে জ্ঞাত? জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে : জেনে রাখ, আল্লাহ সব কিছুকে ঘিরে আছেন।

(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ৫১-৫৪)

আল্লাহ বলেছেন যে ভালো-খারাপ কোনোকিছুই তাঁর অনুমতি ছাড়া ঘটে না; কিন্তু তিনি ভালো কাজের আদেশ করেন এবং খারাপ কাজের নিষেধ করেন; কেউ নাছোড় হয়ে খারাপ কাজ করতে চাইলে তিনি অবশেষ তাতে অনুমতি দেন। কোরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে সব ভালো আল্লাহ থেকে এবং সব খারাপ মানুষ থেকে :

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।

(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।

(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের ভাগ্য মীমাংসিত হয়ে যেত (তারা নিজেদের কর্মফল দ্বারাই ধ্বংস হয়ে যেত)। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদেরকে নিজ অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই।

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

কিন্তু সবকিছুর ফল আসে তাঁর কাছ থেকে :

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

কিন্তু তার দোষ তাঁর নয়। তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না :

তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

www.pathagar.com

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।

(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪২)

আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ দিয়ে থাকেন।

(সূরা শুরা, আয়াত : ২৭)

বুঝাই যাচ্ছে যে আল্লাহ্ এমন কোনো সুযোগ রাখেননি যাতে মানুষ তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সকল দুঃখের কারণ হলো তার নিজের পরিচয় সম্বন্ধে তার অজ্ঞতা। যে নিজেকে জানেনি, সে তো কষ্ট পাবেই, অসন্তুষ্ট থাকবেই। কারণ সে আল্লাহকে জানার উপযুক্ত হয়নি।

দুঃখ-কষ্ট দুই ধরনের ঃ মানসিক এবং দৈহিক।

মনোকষ্ট, অর্থকষ্ট, দৈহিক কষ্ট সবকিছু থেকেই মানসিক কষ্ট অনুভূত হ'তে পারে। কিন্তু কোরানিক সত্য হলো এই যে : **মনোকষ্ট ব'লে কিছু নেই; মনের অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা, এবং মায়াচ্ছন্নতাই মনের যাবতীয় কষ্টের কারণ। মনোকষ্ট হলো মন সম্বন্ধে মনের ভুল ধারণা। মনোকষ্ট ব'লে বাস্তবতাতে কিছু নেই, তা আছে কেবল মনে। সুতরাং মন ঠিক হয়ে গেলে তার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটবে।**

এই সত্য কোরআনের। এবং এটাই আসল সত্য :

... আমি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তারা যা করছে তা শোভনীয় করেছি। (অর্থাৎ তারা খারাপকে ভালো মনে করছে—এ হলো তাদের মনেরই ধারণামাত্র।)

(সূরা আন'আম, আয়াত : ১২২)

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (অর্থাৎ তারা যখন সত্যকে জানবে তখন তাদের অসম্পূর্ণ ধারণার বিলুপ্তি ঘটবে।) (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

আমি তাদের ভোগান্তিকে/দুঃখ-কষ্টকে সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলাম। (অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের দ্বারা তাদের মনের কালিমা ধুয়ে গিয়েছিল এবং তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মনে এবং আর্থিক দিকে আল্লাহর করুণা লাভ করল।) (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯৫)

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত বিশ্রামের প্রশান্তি পায়। (তখন চিত্ত সকল ভ্রান্তিকে অতিক্রম ক'রে সঠিক ভারসাম্যে স্থিত হয়।) (সূরা রা'দ, আয়াত :)

একথার সত্যতার প্রমাণ কী?

হ্যাঁ, আমরা স্পষ্ট প্রমাণের দিকে যাব।

দেহের কষ্ট বা রোগ-ব্যধি ইত্যাদির কোরানিক রহস্য হলো ঃ **আল্লাহ্ যখন কাউকে ভালোবসেন বা কারো ওপর রহমত বর্ষণ করেন বা কাউকে ক্ষমা করেন, তখন তার দেহ রোগাক্রান্ত হয়।**

www.pathagar.com

শুনে পাঠকের মনে হতে পারে—এ কি উদ্ভট কথা! হ্যাঁ, এটাই সত্য। এর স্পষ্ট প্রমাণও আমরা দেখব। নিচের আয়াতগুলোর সম্মিলিত মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন। (ফলে সবকিছুই তার **প্রকৃতি** এবং **পরিমাপ** অনুযায়ী নিজে একটি বিশেষ অবস্থায় থাকতে চায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তু বা সিস্টেমের সংস্পর্শে একটি বিশেষ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতে চায়। এবং একারণে ঐ বস্তু বা সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বস্তুর প্রকৃতির বা পরিমাপের ওপর হস্তক্ষেপ করলে গোটা ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত বা মোচড়কে ভারসাম্যের নিজস্ব স্থিতিশক্তি নস্যাৎ ক'রে দিয়ে বিলুপ্ত ক'রে আবারও ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু সংঘটিত মোচড় বা বিশৃঙ্খলাটুকুর কারণে মূল্য ভারসাম্য থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে নতুন আপাত-ভারসাম্য বা ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য গঠিত হয়। এই দূরত্বই মূল ভারসাম্যের বিকৃতির পরিমাণকে (যেমন কোনো রোগব্যাধি) নির্দেশ করে।) (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না। (তাঁর আচরণ মানেই তাঁর বিধান। তাঁর বিধান সুনির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। ফলে তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক বিশুদ্ধতা ও যান্ত্রিকতা রয়েছে, খামখেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতা নেই। মানুষ যা করে, এই বিধান অনুযায়ী তার ফলশ্রুতি তৈরি হয়। এ কারণে মানুষের সব অমঙ্গলের দায়ভার তার নিজের। আল্লাহ কোনো অমঙ্গল সৃষ্টি করেননি—তিনি সৃষ্টি করেছেন বিধান বা নিয়ম—তথা প্রকৃতিজগতের মূল স্বভাবধর্ম; এই স্বভাবধর্ম অনুযায়ী প্রকৃতি মানুষের ক্রিয়ার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।) (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (এই শাস্তি হলো মানুষেরই কর্মফল—যা মানুষের প্রাপ্য বটে। কিন্তু আল্লাহ করুণা ক'রে মানুষকে তারই কর্মফলের ছোট আঘাতগুলো দ্বারা হুঁশিয়ার ক'রে দেন, যেন সে পথে ফিরে আসে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত—বরং তার সাথে দয়া ও করুণা মিশ্রিত।) (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সীমালঙ্ঘন মানেই বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপকে লঙ্ঘন করা। যার প্রতি বস্তু তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেই। আল্লাহ কখনোই তাঁর নিয়মের লঙ্ঘনকে উৎসাহিত বা বরদাস্ত করবেন না, কারণ তার জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য সবার ক্ষতি হবে। পরবর্তী আয়াতেই এই সত্যের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।) (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (নিজেদের এবং অপরের) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (মানুষ সীমালঙ্ঘন করলেই—তার শাস্তি

www.pathagar.com

হোক বা না হোক—তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যেহেতু মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, এবং ফলে সে অবিবেচকের মতো সীমালঙ্ঘন ক'রে ফেলতে পারে, সেহেতু অন্যদেরকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। এরূপ ধৈর্যধারণকারী তার বিনিময়ে পুরস্কৃত হবে—হয় তার মাধ্যমে সে তার কর্মফল ভোগ করবে, না হয় তার প্রশিক্ষণ হবে, না হয় সে পূণ্য অর্জন করবে। যে পরকালের সনদপত্র পেতে চায় তাকে ইহকালে পরীক্ষা দিতেই হবে।) (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

... আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। (এই অবকাশের উৎস হলো মানুষের choice এর স্বাধীনতা। ফলে অবকাশ ভোগকারী এবং যারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তারা সবার জন্যই তা পরীক্ষাস্বরূপ। মানুষের স্বাধীনতাই তার পরীক্ষা—আল্লাহ দেখতে চান কে তা কিছাবে ভোগ করতে চায়। একটা সীমার পর তার কর্মফলই তার কাছে ফিরে এসে তাকে হুঁশিয়ারি দেয় এবং পরে ধ্বংস করে।) (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২৩)

সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। (এই ক্ষতির সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ই হলো মানুষের কুকর্মের সৃষ্টি। সময়ই তার ক্ষতির প্রমাণ। আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করলে সেই বিধান অনুযায়ীই সময় প্রতিকূল হয়ে যায়। সে দোষ সময়ের নয়, মানুষের। সময় বরং মানুষের কুকর্মের সাক্ষী—শুধু তাই নয়, সময়ই তার কর্মের ফলশ্রুতি। এ কারণে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে সময়কে গাল দেয়া যাবে না।—তা তো আল্লাহর বিধানেরই অনুগামী। পরবর্তী আয়াতটি দ্রঃ।)

(সূরা আছর, আয়াত : ১-২)

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।

(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (এটাও প্রমাণ করে যে আল্লাহর বিধান বিশুদ্ধভাবে গাণিতিক এবং তিনি মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।) (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (এই প্রক্রিয়াটা অত্যন্তভাবে গাণিতিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। এখানেই ব'লে দেয়া হয়েছে যে মানুষের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি বিপর্যয়কে তাঁরই কর্মফল অনুযায়ী আল্লাহ তাঁর পূর্বনির্ধারিত বিধান বা আদেশবলে সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে 'যদি এরূপ ঘটে তাহলে তার ফল হবে এরূপ'—বিজ্ঞানের এই কার্য-কারণ সূত্র বা Cause and Effect Relationship-টা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সকল বিজ্ঞান-দর্শনই তাঁর।)

(সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

www.pathagar.com

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (কারণ স্বেচ্ছাচারীর মতো আচরণ কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না; কার্য-কারণ সূত্রের সক্রিয়তার কারণেই তা বিশৃঙ্খল ফলশ্রুতির সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানসম্মত বিধানের এটাই দাবি যে তা কেউ লঙ্ঘন করলে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। একথা সত্য না হলে উক্ত বিধানই হতো অবৈজ্ঞানিক। এই আয়াতও প্রমাণ দিচ্ছে যে সব কার্য-কারণ বিধি এবং বিজ্ঞান তাঁরই। এই আয়াতও প্রমাণ করে যে রোগ-ব্যাধি বিপর্যয় এগুলোর জন্য মানুষই দায়ী।)

(সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং ওদের **কৃতকর্মের ফলে** ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (অনুগ্রহ আল্লাহর—ফলে ভালো কাজের ফলশ্রুতির কৃতিত্ব মানুষের নয়, আল্লাহর। কারণ এরূপ ফল সৃষ্টি হয় যে বিধান অনুসারে তা আল্লাহরই। এরূপ সুফলদায়ী বিধানকেই আল্লাহ তাঁর করুণা নামে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু খারাপ কাজের দোষ আল্লাহর নয়, মানুষের। খারাপ কাজ সম্পর্কিত বিধানও আল্লাহর—অর্থাৎ 'এরূপ খারাপ কাজ করলে এরূপ খারাপ ফলশ্রুতির সৃষ্টি হবে'—এই বিধানও তাঁর; তবে একথা ব'লে তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না যে, 'এরূপ বিধান তো তিনি না রাখলেও পারতেন', কারণ এরূপ বিধানই মানুষের অস্তিত্বের শর্ত। ফলে একথা আবারও প্রমাণিত হচ্ছে যে মানুষের রোগ-ব্যাধি-বিপর্যয়ের কারণগুলো বিজ্ঞানসম্মত, কারণ বিজ্ঞান আল্লারই।) (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের ভাগ্য মীমাংসিত হয়ে যেত (তারা ধ্বংস হয়ে যেত)। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদেরকে নিজ অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই। (এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে সব উপায়ে নিজের কল্যাণ কামনা করাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং তার মধ্যে অকল্যাণই নিহিত। প্রকৃত কল্যাণ হলো আল্লাহর সার্বিক বিধানকে একত্রে মেনে চলার মধ্যে—কারণ এই বিধানগুলোই অস্তিত্বের নির্মাণ-সূত্র এবং ধারক। আল্লাহ জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন শুধু 'কুন্' বা 'হও' বলার মাধ্যমে। আসলে তাঁর এই উচ্চারণ হলো তাঁর বিধানেরই প্রকাশমাত্র। ফলত তাঁর বিধানই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সূত্রগুলোকে আবিষ্কার করা হয়, সেগুলো হলো তাঁর কিছু বিধানমাত্র। আল্লাহ মানুষকে বলেছেন তথ্য-পর্যবেক্ষণ গবেষণা ক'রে তাঁর এই বিধানাবলী সম্বন্ধে জানতে—'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর তিনি কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।)

আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (তার মানে এই নয় যে আল্লাহ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে শাস্তি দেন। তিনি তো বলেছেনই যে তিনি বান্দর সাথে অন্যায় আচরণ করেন না এবং তাঁর বিধানের কোনো পরিবর্তন নেই। আসলে শাস্তি হলো মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। মন্দ কাজ করলে প্রকৃতির সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যার ফলে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলার বা শাস্তির। এই শাস্তি যদি মানুষের আচরণকে শুধরাতে পারে, তাহলে ভারসাম্য আবারও পুনস্থিত হয়। অর্থাৎ ভারসাম্য পুনস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির অস্তিত্ব থাকবে—এটাই বিজ্ঞানসম্মত। বরং আল্লাহ যদি এমন বিধান করতেন যে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফলে উদ্ভূত শাস্তি ভোগ

www.pathagar.com

করা লাগত না এবং একই সাথে তার দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এমনিতেই ভারসাম্যে ফিরে আসত, তাহলে মানুষ শুধু খারাপ কাজ ক'রে যেতেই থাকত, সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে হুঁশিয়ার হতে পারত না, এবং ফলে নেমে আসত বৃহত্তর বিপর্যয়, কিংবা একজনের কর্মফলকে ভোগ করতে হতো অন্যকে—তার প্রতিক্রিয়া নষ্ট করার জন্য, যা হতো অন্যায়, কিংবা তার সমস্ত কর্মফল তারই অজান্তে পরকালে পৌঁছে যেত এবং তা হতো মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। প্রশ্ন উঠতে পারে—বিধান কি এমন হতে পারত না যে খারাপ কাজের কোনো খারাপ ফলই সৃষ্টি হবে না?—এরূপ প্রশ্নই বোকামিপূর্ণ। তা যদি হতো, তাহলে সৃষ্টিতত্ত্বকে আর বিজ্ঞান বলা হতো না, কারণ তখন কার্য-কারণ ব'লে কিছু থাকত না। কার্য-কারণই হলো অস্তিত্বের নির্ণায়ক। মানুষের পরীক্ষা চলছে তারই ভিত্তিতে। তবে আশার কথা এই যে সকল কার্য-কারণকে অতিক্রম করা যাবে পরকালে। আল্লাহ্ বলেছেন যে সেখানে মানুষকে তাই-ই করতে দেয়া হবে যা তার মন চাইবে। আবারও প্রশ্ন উঠতে পারে—তখন যদি কার্য-কারণ না থাকে, তাহলে সেই বাস্তবতা টিকবে কিভাবে?—সুন্দর প্রশ্ন। আসলে তখন মন বস্তুর অধীন থাকবে না, বস্তুই হবে মনের অধীন। মনই হবে সব কার্য-কারণের উৎস। কারণ সেই মনের ওপর আল্লাহর সম্মতি থাকবে। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহই সকল কার্য-কারণের স্রষ্টা। পরকালের বাস্তবতা আল্লাহর আদেশে আমাদেরই আমল দ্বারা সৃষ্ট—৩য়, ১০ম, এবং ১২শ আয়াত দ্রঃ—ফলে তা হবে মনের অধীন।—আসল সত্য কথা হলো, দিব্যদৃষ্টিধারীগণ জানেন যে পরকালে **মনটাই হবে বাস্তবতা!** ফলে সেখানে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে, যা করতে চাইবে, তাই করতে পারবে—কোনো বিরোধিতা। সেখানে কারো কাজ দ্বারা অন্য কেউও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ সবার মন/আত্মা হবে এক—আল্লাহর তাওহীদ বা ঐক্যে লীন—সে ঐক্যের থাকবে বিভিন্ন স্তর, যার ফলে মানুষের থাকবে শ্রেণীভেদ—কারণ পৃথিবীতে সবাই নিজেকে সমান মাত্রায় আল্লাহর তাওহীদে একাকার ক'রে দেয়নি, নিজের কামনা-বাসনাকেও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছে; তবুও সার্বিক ঐক্য থাকবেই, কারণ আল্লাহ্ এক এবং তাঁর তাওহীদ। অনন্য। এ এক রহস্যময় ব্যাপার, যা সবাইকে বোঝানোও যায় না—শুধু বুদ্ধি দিয়ে এ বোঝা যায় না।) (সূরা দোখান, আয়াত : ১৫)

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে **আগামীকালের জন্য আগে/সামনে কী পাঠিয়েছে**। (অর্থাৎ মানুষের সকল আগামীকাল বা ভবিষ্যৎ গঠিত হয় তার বর্তমানের কাজ দ্বারা। এই বিচারে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ সময়ও তার বর্তমানের কাজ দ্বারা সৃষ্ট হয়ে তার দিকে ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানের দিকে ছুটে আসে। ভাগ্যের পূর্বনির্ধারণ বলতে যা বুঝায়, তা ভিন্ন জিনিস, যা তার কর্মফলের সাথেই ক্রিয়া করে। ব্যাপারটা সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ব'লে এখানে আলোচ্য নয়।) (সূরা হাশর, আয়াত : ১৮)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। **এ জন্য যে**, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (আমাদের জীবনে তাই ঘটে যা একবার লিখিত হয়ে যায়। আর তাই-

www.pathagar.com

ই লিখিত হয়ে যায়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার ভারসাম্যে স্থিত হয়ে যায় বা সংশ্লিষ্ট সীমা লঙ্ঘনের পর নতুন বিকৃতিতে স্থিত হয়। সাময়িক বা স্থায়ী স্থিতি তথা ভারসাম্য ছাড়া কোনো প্রক্রিয়া কোনো ফল উৎপাদন করে না। আমাদের কর্মকাণ্ড, গতিবিধি, চিন্তা-পরিকল্পনা এসব প্রক্রিয়ামাত্র। এরা তখনই ফল উৎপাদন করে বা তখনই এসব প্রক্রিয়া থেকে কোনো কাজ উৎপাদিত হয় যখন আল্লাহর সৃষ্টি-পরিচালনা-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ বিধান অনুসারে তাতে কোনো অস্থায়ী বা স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্ট হয়। সুতরাং যা একবার ঘটে গেছে, তা না ঘটে পারত না—আমাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহই তাঁর বিধান দ্বারা তা ঘটিয়েছেন। এজন্য তা যদি কোনো ভালো কিছু হয়ে থাকে, তাহলে অযথা অহংকার করার কিছু নেই—আল্লাহর করুণা ছাড়া তা ঘটত না, তার বিধান অনড় না হলে তার উল্টোটাও ঘটতে পারত; এবং তা যদি দুর্ভাগ্যজনক কিছু হয়, তাহলে দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ তা ন্যায্য বিধান অনুযায়ীই ঘটেছে, এবং দুঃখ করা মানে নিজের কর্মফলের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো এবং বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। আমার বিশ্বাস, কেউ যদি ধর্মের পতে চ'লে শুধু এই আয়াতের আদেশটাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে চলতে পারেন, তাহলে তিনি আল্লাহর অলি হয়ে যাবেন। পরবর্তী আয়াত দ্রঃ।)

(সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

(সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলকাম হলো। (পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার কথা স্মরণ রাখলে সহজেই বুঝা যাবে ধৈর্য কেন দরকার।)

(সূরা মু'মিমূন, আয়াত : ১১১)

আল্লাহ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন **এই উদ্দেশ্যে যে, যেন** প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে। (এই আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতটি থেকে **স্পষ্টভাবে** বুঝা যাচ্ছে যে আমাদের সব কর্মকাণ্ডকে ধারণ করার এবং তা অনুযায়ী যথাযথ ফল সৃষ্টি করার, অর্থাৎ তার প্রতি সঠিক সময়ে সঠিক সাড়াটি প্রদান করার, সমস্ত যান্ত্রিকতা এবং পাওয়ার-সাপ্লাই আকাশ এবং পৃথিবীতে সুষমভাবে স্থাপিত করা রয়েছে। আর এ কারণেই পৃথিবীতে কার্য-কারণ বিধি কাজ করে, বস্তু তার বৈজ্ঞানিক ধর্ম লঙ্ঘন করে না। কি রহস্যময় আয়াত! মানুষ যেন তার কর্মফল পেতে পারে **এই উদ্দেশ্যেই** আকাশ-পৃথিবীকে সুষমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে! বাস্তবে বিজ্ঞানও তো তাই দেখছে! আমরা যাকিছু করি, তাই-ই পরবর্তীতে ফলস্বরূপ আমাদের কাছে ফিরে আসে। এরূপ একটা আয়াত প'ড়ে বা শুনেই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। কোরআনেই বলা হয়েছে (বারবার! অসংখ্য বার!) যে, কোরআন কেবল জ্ঞানী এবং চিন্তাশীলদের জন্যই।)

(সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

বল—আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল—আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি।

(সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

www.pathagar.com

আল্লাহ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুক। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

প্রথমেই আসা যাক দৈহিক পীড়া, দুর্বলতা, এবং যাবতীয় রকমের রোগ-ব্যধির প্রসঙ্গে। আধুনিক জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেহকে এবং দেহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে একটা বিশেষ ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় যার নাম সিস্‌টেমস্ কনসেপ্‌ট্। এর সাধারণ অর্থটা পুরোপুরি গাণিতিক এবং শ্বাশ্বত। তা হলো *গোটা দেহ এমন একটা ব্যবস্থা যার কর্মকাণ্ডের উৎস এবং প্রকাশ এবং প্রক্রিয়া সেই ব্যবস্থার (System) মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত এবং গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে যতগুলো উপ-ব্যবস্থা (Subsystem) আছে তারা প্রত্যেকে পারস্পরিক ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা একে-অপরের সাথে জড়িত, যেখানে একটা সব-সিস্‌টেমেরে প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামাল বা INPUT সংশ্লিষ্ট অন্য একটা সাব-সিস্‌টেমের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উৎপাদ বা ফল বা OUTPUT। এবং এর ফলে গোটা দেহ-ব্যবস্থার সুস্থতা এবং অস্তিত্ব প্রতি-মুহূর্তের প্রয়োজন (INPUT) অনুসারে স্থাপিত ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। এই সার্বিক গতিশীল ভারসাম্যের অবস্থায় প্রত্যেকটা সাব-সিস্‌টেমেও আলাদ-আলাদা ভারসাম্য ক্রিয়াশীল। ফলে কোনো একটা সাব-সিস্‌টেমের ভারসাম্য কোনো কারণে বিঘ্নিত হ'লে তা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্‌টেমের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে এবং এই বিঘ্ন সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্‌টেমের সীমার মধ্যে থাকলে উক্ত সাব-সিস্‌টেমের আঞ্চলিক (Local) ক্রিয়াকাণ্ডে যে অনিয়মের সৃষ্টি হয়, তা একটা রোগ বা ব্যধি নামে গণ্য হয়। এই বিঘ্ন জীবাণুর মাধ্যমে বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। এই বিঘ্ন যদি সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্‌টেমের নিজস্ব সহনশীলতার সীমা কিংবা আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে, তাহলে তা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্‌টেমের ক্রিয়াকাণ্ডকেও প্রভাবিত করে। চিকিৎসা মানে হলো সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্টেমে বা সাব-সিস্টেমগুলোতে আবশ্যক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।* এই সিস্‌টেমস্ কনসেপ্‌ট্ থেকে পরবর্তীতে আরো বিশুদ্ধ গাণিতিক System ফিল্ড বা *'মরফোজেনেটিক ফিল্ড'* এর ধারণাও এসেছে। এসব ধারণা সর্বাধুনিক রোগের জেনেটিকতত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়েছে। জেনেটিক রোগতত্ত্বের সূত্রটা সাধারণ কথায় এরূপ : সুস্থ ভারসাম্যপূর্ণ দেহের জিনবিন্যাস, বা আরো বিশেষভাবে, DNA বিন্যাস, একটা রেল লাইনের মতো, যার ওপর দিয়ে দেহগাড়ির বগিগুলো মসৃণ গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে লাইনের স্লিপারে সমস্যা ঘ'টে গেলে বা রেলগুলোর পারস্পরিক সমান্তরলতায় ব্যাঘাত ঘটলে, বগি তখন চলতে গিয়ে হোচট খেয়ে পাশে প'ড়ে যায়। সৃষ্টি হয় ব্যাঘাত বা রোগ-ব্যধির। জেনেটিক চিকিৎসার বা আস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লাইনটাকে আবার ঠিক ক'রে দিলে বগিটা আবারও যথাস্থানে ফিরে আসে এবং যথানিয়মে চলতে শুরু করে। এই বিশৃঙ্খলতা মানুষের ভুল আচরণের জন্যই ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

আসল কথা হলো এই যে এই দেহের সবকিছুর জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, ভারসাম্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, একটা বিশেষ বয়সের নারী বা পুরুষের সুস্থ অবস্থায় তার শরীরের সবগুলো সাব-সিস্টেমের সূচক যেমন রক্তসংবহনতন্ত্র, (রক্তে হিমোগ্লোবিনের ,পরিমাণ/সংখ্যা, শুগারের পরিমাণ), রেচনতন্ত্র (প্রশ্রাব-পায়খানার বিভিন্ন অবস্থা, প্রশ্রাবে ইউরিয়ার পরিমাণ ইত্যাদি), পরিপাকতন্ত্র, রক্তের চাপ, দেহের তাপ, দৃষ্টিশক্তির উর্ধ্বসীমা-নিম্নসীমা, কর্মপেরণা ইত্যাদির একেকটা বিশেষ মান থাকে। এগুলোর সার্বিকতাকে একটা বহুমাত্রিক গ্রিডে বা ম্যাট্রিক্সে ফেলে বলা যায় যে ঐ বিশেষ বয়সের জন্য ঐ বিশেষ লিঙ্গের মানবসন্তানের দেহের ভারসাম্যের চিত্র বা সূত্র হলো ঐ গ্রিড বা ম্যাট্রিক্সটা। এদের যে-কোনো একটা সূচকের মান যদি গ্রহণযোগ্য সীমার বাইরে চ'লে যায়, তাহলে, অন্যান্য সূচকগুলোর মান 'স্বাভাবিক' থাকলেও, একথা বলতে হ'বে যে ব্যক্তির দেহে কমপক্ষে একটা অস্বাভাবিকতা আছে, তা যে কারণেই হোক। এই 'অস্বাভাবিকতাটাই' চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাধি নামে পরিচিত। অনাকাঙ্খিত জটিলতা এড়ানোর জন্য আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকলাম।

আমরা পাঠককে অবাক ক'রে দিয়ে আবারও ব'লে রাখি : **দেহে এরূপ যে-কোনো অস্বাভাবিকতার উপস্থিতিই সেই দেহের ওপর আল্লাহর করুণার সক্রিয়তাকে স্পষ্টভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করে।** অর্থাৎ, এই অস্বাভাবিকতাই তার রহমত!

কোনো কোনো পাঠক হয়তো এতক্ষণে ক্ষেপে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো ডাক্তার হন—এবং আমার বিশ্বাস যে আমার প্রিয় পাঠকদের মধ্যে কমপক্ষে একজন জ্ঞানী ডাক্তার রয়েছেন—তাহলে, আমার অনুরোধ, আপনার ক্ষেপে ওঠা একদম উচিত হবে না, কারণ আমাদের পরবর্তী ব্যাখ্যা এবং রায় আপনার বিদ্যার এবং পেশার পক্ষেই যাবে!

আমরা আরেকটু বাড়িয়ে বলতে চাই যে, মৃত্যু বা ধ্বংসের আগ পর্যন্ত দেহে বা দেহের কোনো অংশে যত ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার সবই মূলত আল্লাহর তরফ থেকে রহমত বা করুণা। তা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন।

তাহলে আমরা এই দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থাকে আরেকটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। লক্ষণীয় যে :

- দেহের প্রত্যেকটা বয়সের একেকটা সীমা বা Rangeকে একেকটা স্তর হিসেবে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, বয়সের এক-একটা স্তরের জন্য (পুরুষ এবং নারীর জন্য আলাদাভাবে) মানবদেহের সার্বিক ভারসাম্য এক-এক রকমের।

www.pathagar.com

- প্রত্যেকটা সার্বিক ভারসাম্যের অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট সাব-সিস্টেমগুলোর নিজ-নিজ ভারসাম্যগুলোর বা স্বাভাবিক অবস্থাগুলোর (Normal Value) একটা সুনির্দিষ্ট সমন্বয়। এই সমন্বয়কে গ্রিড বা ম্যাট্রিক্স বলা যায়।
- বয়সের এক-এক স্তরের জন্য দেহের সার্বিক ভারসাম্য বা ম্যাট্রিক্স এক-এক রকমের ব'লে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দেহের গতিবিধি মূলত একটা পরিবর্তনশীল ভারসাম্যের (Dynamic Equilibrium) চলার পথ—অন্য কথায়, একগুচ্ছ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার একটা সারিবদ্ধ সজ্জা।

উদাহরণস্বরূপ, ১-৩ বছর, ৩-৬ বছর, ৬-৯ বছর, ৯-১২ বছর, ১২-২০ বছর, ২০-৩০ বছর ইত্যাদি বয়সের স্তরগুলোর (যা এখানে কাল্পনিক) জন্য একই দেহের সার্বিক ভারসাম্য হবে ভিন্ন ভিন্ন, এবং কোনো বিশেষ দেহের গোটা জীবনধারাকে এই ভারসাম্যগুলোর ধারাটা (Series) দ্বারা বর্ণনা করা যাবে।

এভাবে মানবদেহের গোটা বয়সের জন্য একটা সাধারণ বা গড় বক্ররেখা বা Curveবা চিত্র বা ভারসাম্যপথ পাওয়া যাবে। মজার ব্যাপার হলো, সহস্র বছরের ব্যবধানে বা আবহাওয়ার ব্যবধানে এই চিত্র বিভিন্ন রকমেরও হতে পারে! এই সত্যটা জানলেই বুঝা যায় কেন একেক যুগে একেক ধরনের রোগ-ব্যধির প্রকোপ বেশি দেখা দিত বা দেবে। হাদিসেও বর্ণিত আছে যে শেষ যুগে নতুন নতুন ব্যধি এবং ঔষধের উদ্ভব ঘটবে। ভারসাম্যের এই সচলতার কারণেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন :

সত্য এসেছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্গত হয়ো না। (সূরা আলইমরান, আয়াত : ৬০)

তাহলে তুমি কি (হে মুহাম্মদ (সঃ)) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ বাদ দেবে এবং তোমার বক্ষ সংকুচিত করবে? যেহেতু তারা বলে—কেন তার প্রতি ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি, অথবা তার সাথে ফেরেস্তা আসেনি? (সূরা হুদ, আয়াত : ১২)

নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কেতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার (মূসা (আঃ)এর) কেতাব প্রাপ্তির বিষয়কে সন্দেহ ক'র না। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২৩)

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। (সূরা আছর, আয়াত : ১-২)

প্রত্যেক যুগের জন্য রয়েছে একটি ধর্মগ্রন্থ (যা আমি অবতীর্ণ করেছি)।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৮)

www.pathagar.com

প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে; যখন তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন তারা তাকে এক ঘণ্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, কিংবা তারা তা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৪)

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর স্বভাবের অনুসরণ কর, যে-স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—এটাই সরল চিরস্থায়ী দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই অভিমুখী হও; তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর ... (সূরা রুম, আয়াত : ৩০-৩১)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (নিজেদের এবং অপরের) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দেহ-ঘড়ির সূচক বা কাঁটটা সব বয়সের ক্ষেত্রে যেমন সমান ঘোরে না, তেমনি সব যুগের বা আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও সমান ঘোরে না। অর্থাৎ পূর্ণ দেহটাও একটা পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নয়, এটাও একটা সাব-সিস্টেম, যা বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ক্রিয়াশীল ব'লে গোটা প্রকৃতির তাৎক্ষণিক ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে কোনো একটা বিশেষ সময়ের জন্য কোনো দেহের চারপাশের ধারণকারী এবং লালনকারী বাস্তবতার ভারসাম্য পাওয়া গেলে এটাও বের করা যায় যে ঐ দেহের ভারসাম্যের সাথে উক্ত ভারসাম্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বৃহত্তর একটা ভারসাম্যের, যাকে লক্ষ্য ক'রে শুধু দেহটা নয়, পারিবার্শ্বিকতার ভারসাম্যের সূচক বা গোটা অস্তিত্বের ঘড়ির কাঁটাটাই ঘুরছে। এই সার্বিক ভারসাম্যবিন্দু হলো আলোচ্য সময় বা যুগের জন্য সার্বিক ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। একটা কথা জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ নিজেই কিন্তু নিজেকে সমস্ত অস্তিত্বের ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিহ্নিত করেছেন, এবং সময়ের সাথে তিনি তার কর্মকাণ্ড পরিচলনার ভারসাম্যবিন্দু বদলে দিয়ে নতুন নতুন পরিবর্তনশীল দেন্দ্রস্থল থেকে কাজ করেন একথাও তিনি বলেছেন :

আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম পদ্ধতি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি, যা তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। তুমি সরল পথেই আছ। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬৭)

বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২০)

www.pathagar.com

প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে; যখন তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন তারা তাকে এক ঘণ্টার জন্যও বিলম্ব করাতে পারে না, কিংবা তারা তা ত্বরান্বিতও করতে পারে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৪)

প্রত্যেক যুগের জন্য রয়েছে একটি ধর্মগ্রন্থ (যা আমি অবতীর্ণ করেছি)।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৮)

নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্যস্তরে আরোহন করবে।(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১৯)

(এ কোরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। পূর্ববর্তী কেতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ১৯৫-৯৬)

এবার মনটাকে আরেকটু চাঙ্গা করার জন্য নিচের আয়াতগুলো একবার প'ড়ে নিলে ভালো হবে :

কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত।
(সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে।
(সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—**সম্ভবত** কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

... তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩০)

আমিই ... লিখে রাখি যা ওরা (মানুষ) আগে পাঠায় এবং যা পেছনে রেখে যায়।
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১২)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (নিজেদের এবং অপরের) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

... শপথ সমুন্নত আকাশের। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তা অনিবার্য। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে। এবং পর্বতমালা উন্মূলিত হবে। সেই দিন মিথ্যাবাদীদের জন্য দুর্ভোগ। যারা খেলাচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। (সূরা তূর, আয়াত : ৫-১১)

তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ বা নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ এবং পৃথিবীর সৃজন, এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ। (সূরা রুম, আয়াত : ২২)

তোমরা অবিশ্বাসী হলে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন—তিনি তাঁর সেবকগণের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৭)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোনো জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২)

যে কেউ খারাপ কাজ করবে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে, এবং ওদেরকে বলা হবে তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছ। (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৯০)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

বল—তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭৭)

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। (সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

www.pathagar.com

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? (সূরা রহমান, আয়াত : ৬০)

আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং তাঁরই কাছে আছে কেতাবের মূল। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৯)

এমনকি কোরআনে বলা হয়েছে যে মানবদেহকে এবং এমনকি বিশ্বজগৎটাকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল ছয়টি ধাপে ফেলে, বিবর্তনের মাধ্যমে।

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপূর্ণ হও, (তাহলে চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। যেন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই (তোমরা কিভাবে জীবন লাভ করেছ এবং কিভাবে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হবে)। আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা নিজ নিজ যৌবনে উপনীত হতে পার। তোমাদের মধ্যে (শিশু অবস্থায়) কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং **তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা ভুলে যায়।** (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫)

তুমি বল, তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই—যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সমানভাবে সকলের জন্য, **যারা এর অনুসন্ধান করে**। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেন—তোমরা উভয়ে **ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হোক**—আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন; এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি প্রথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

(সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ, আয়াত : ৯-১২)

এভাবে দেখা যায় যে গোটা সৃষ্টিকুলের একটা অংশের জন্য যেমন রয়েছে একটা সাময়িক (যুগের) কেন্দ্র বা আঞ্চলিক কেন্দ্র, তেমনি একাধিক আঞ্চলিক বা সাময়িক কেন্দ্রেরও রয়েছে বৃহত্তর কেন্দ্র—এরূপ একাধিক বৃহত্তর কেন্দ্রেরও রয়েছে কেন্দ্র। এভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন বৃত্ত আকারে, যেখানে রয়েছে বৃত্ত, তাকে ঘিরে বৃত্ত, তাকে ঘিরে বৃত্ত, তাকে ঘিরে বৃহত্তর বৃত্ত, তাকে ঘিরে ... অসীম পর্যন্ত সময়ের সাথে ধাবমান এই সব বৃত্তের দ্বারা বৃত্তকে মুড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া। ফলে বিশেষ কোনো অবস্থার যেমন একটা তাৎক্ষণিক কেন্দ্র রয়েছে, তেমনি বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে সেই কেন্দ্রই চূড়ান্ত নয়, সেই ক্ষুদ্র বৃত্ত এমন এক বৃহত্তর বৃত্তের অংশ যার রয়েছে ভিন্ন কেন্দ্র ... ইত্যাদি। তীব্র এবং উদ্ভিদের ফসিলের আকৃতির

www.pathagar.com

ক্রমবিবর্তনকে অধ্যয়ন ক'রেও আমরা দেখতে পাই যে প্রতি ক্ষেত্রেই রয়েছে একই জাতীয় আকৃতির (Form) পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন, কোরআনে যার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে* :

বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।
(সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২০)

নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্যস্তরে আরোহন করবে।(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১৯)

কেন্দ্রের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনশীলতা এবং লক্ষ্য-চালিত গতিবিধি থেকে কী অনুমান করা যায়? গণিত বলে যে অসীম সংখ্যক কেন্দ্রের এই ধারটা (Series) উৎপন্ন হয়েছে একটা কেন্দ্র থেকে এবং সমাপ্ত হয়েছে সেই একই কেন্দ্রে। এই সার্বিক কেন্দ্রটা দৃশ্য এবং অদৃশ্য, প্রকাশ্য এবং গুপ্ত সব বাস্তবতাকে গ্রাস ক'রে রেখেছে। কিন্তু দৃশ্য বা প্রকাশিত বাস্তবতার স্থান এবং কাল দ্বারা সীমিত ব'লে তার প্রকাশিত কেন্দ্র একটা। কেন্দ্র মানেই হলো সব ক্রিয়াকাণ্ডের উৎস এবং লক্ষ্য। যেমন, পদার্থবিদ্যার একটা সরলতম উদাহরণ নেয়া যাক : একটা সুতোকে আঙুলে বেঁধে তার অপর প্রান্তে একটা আংটি বেঁধে আংটিটাকে যে-কোনো দিকে বৃত্তাকারে ঘুরাতে থাকলে দুটো বলের সৃষ্টি হবে—

একটা কেন্দ্রমুখী বল (Centripetal Force) F1, যা আংটিটাকে কেন্দ্রের দিক বরাবর টানবে, এবং একটা কেন্দ্রবিমুখী বল (Centrifugal Force) F2,

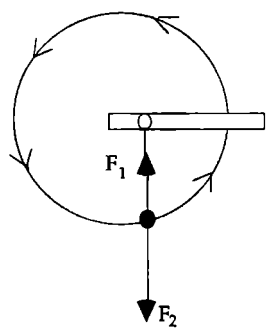

যা আংটিটাকে কেন্দ্রের ঠিক উল্টো দিক বরাবর ঠেলবে। এই টানা এবং ঠেলা (Push & Pull) ঘটবে **কেন্দ্র বরাবর একই সরলরেখায়**— অন্য কথায়, তাদের উভয়ের মিলিতক্রিয়ার **লক্ষ্য এবং উৎস** হলো একই কেন্দ্র—F2 এর **উৎস** যে কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রই হলো F1 এর **লক্ষ্য**। উভয় বলের মান সমান এবং বিপরীতমুখী ব'লে বৃত্তটা গঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু F2 ভেতর থেকে বাইরে এসেছে ব'লে, **তার আত্মচেতনা বহির্মুভখী ব'লে,** সে তার কেন্দ্রকে খুঁজছে বাইরে কোথাও—তাঁর প্রক্রিয়ার বহির্মুখীতার মায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে কেন্দ্রটা। অথচ তারই যে-ধারা উল্টোদিকে ক্রিয়াশীল, সেই আসল ধারা, F1, সব সময়েই তার কেন্দ্রের মুখোমুখী হয়ে ক্রিয়াশীল থাকে এবং সে তার কেন্দ্রকে চিনতে ভুল করে না।

---

* দেখুন এই লেখকের *অন্ধকারের বস্ত্রহরণ* (১ম খণ্ড)

www.pathagar.com

আমরা আমাদের বহির্মুখী আমিত্বকে যদি যথাযথ আমলের দ্বারা ঠেলে ভেতরমুখী করতে পারতাম তাহলে আমরা আমাদের আমিত্বের এমন এক ধারার সাক্ষাৎ পেতাম যা তার উৎস এবং লক্ষ্যকে, সেই মহাকেন্দ্রকে চেনে।

তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতি (ভারসাম্য)। (সূরা, রুম, আয়াত : ২৫)

কিন্তু আত্মজাহিরী অহংকারী জ্ঞানী একথা জেনেও এই জ্ঞান জীবনের কাজে লাগাতে পারবে না। কারণ তার জন্য দরকার আমিত্বকে ত্যাগ করা; তা করতে পারলে তা ক্ষণস্থায়ী মায়ার বাস্তবতা থেকে মুক্তি পেয়ে পৌঁছে যাবে চিরস্থায়ী শাশ্বত বাস্তবতায়, যেখানে আর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, নেই কোনো দুঃখ-কষ্ট-অবসান-আফসোস-হতাশা।

যাহোক, দৃশ্য বাস্তবতার যে-কেন্দ্র, অদৃশ্য বাস্তবতারও সেই কেন্দ্র। কারণ আল্লাহ এক। তিনি কখনও দুই নন। শুধু পার্থক্য হলো এটাই যে অদৃশ্য পরম বাস্তবতা কেন্দ্রের মুখোমুখী হয়ে আবর্তনশীল এবং দৃশ্যমান বাস্তবতা কেন্দ্রের দিকে পিছু ফিরে তার ছায়ার চারদিকে আবর্তনশীল। কিন্তু আল্লাহই কোরআনে বলেছেন : তিনিই গুপ্ত, তিনিই ব্যক্ত; তিনিই আদি, তিনিই অন্ত।

তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩)

আকাশ এবং পৃথিবী উভয়স্থানেই তিনি আল্লাহ। (সূরা আন্'আম, আয়াত : ৩)

তবুও তিনি দুই নন, এক। দোষ তাঁর নয়—মায়াচ্ছন্ন চোখের। চোখ যখন বাস্তবতার নির্দেশিত পথে ক্রিয়াশীল না হয়ে ভ্রান্ত পথ বেছে নেয়, তখন তা প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে নিজেকে খুঁজে পায়, যেমনটা দেখা যাচ্ছে নিচের চিত্রে :

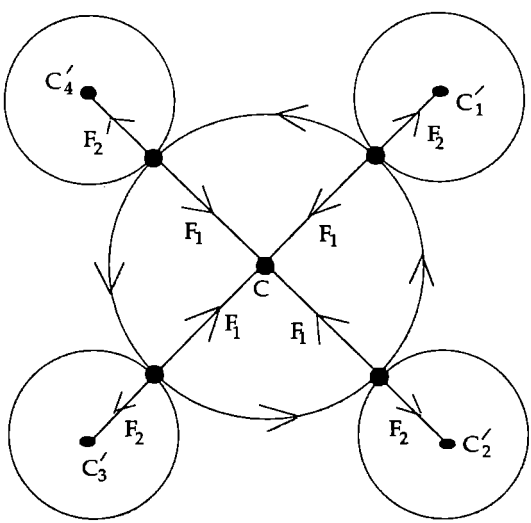

www.pathagar.com

কেন্দ্রবিমুখী বল F2 মূলত কেন্দ্র-ভ্রান্ত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট এক বিদ্রোহী খর্বিত আমিত্ব। সে তার অবস্থান বিন্দুর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত কেন্দ্রের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। সে তার একত্ব হারিয়ে বহুধাবিভক্ত হয়েছে। এই বিভ্রান্তি শুরু হয়েছিল ইবলিস দ্বারা প্রতারিত হয়ে আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন তখন। ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত আছে যে তাঁরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন। কোরআনেও বর্ণিত হয়েছে যে ইবলিস তাঁদেরকে জ্ঞান এবং অনন্ত জীবনের লোভ দেখিয়েছিল। এই সূত্র ধ'রে কপটাচারী অহংকারী নাস্তিক এবং আত্মজাহিরকারী লেখক-কবি সম্প্রদায় তাদের জ্ঞানের তীব্রতা সামলাতে না পেরে এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আগুনের সেঁকা খেয়ে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে ব'লে বসেন—তাহলে ইবলিসই ভালো; আল্লাহ্ চাননি যে মানুষ জ্ঞানী হোক, অথচ ইবলিস মানুষকে জ্ঞানের পথটা দেখিয়ে দিয়েছিল। প্রমিথিউস আগুন চুরি ক'রে (এখানে আগুন হলো জ্ঞানের প্রতীক) শাস্তি খেয়েছিল—আমরাও সেই জ্ঞানের পথের পথিক।—এভাবে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্বোধ ছাড়া আর সবাই একথা বোঝে যে ইবলিস তাদের আল্লাহর মুখোমখি হয়ে থাকা অখণ্ড আত্মচেতনাকে খণ্ডিত ক'রে জড়োদেহমুখী ক'রে দিয়েছিল, যার ফলে তারা আবিষ্কার করতে পারলেন যে তারা মূলত দেহসার দুটো জীব ছিলেন, যাদের পারস্পরিক বন্ধনের উছিলা হিসেবে আল্লাহর করুণা এবং একত্বকে বাদ দিলে বাকি থাকে কেবল নগ্ন দেহভিত্তিক যৌনতা, যা তাঁদের কাজে উন্মুক্ত হয়ে পড়াতে তাঁরা যারপরনাই লজ্জিত হলেন : তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তারা খণ্ড আত্মচেতনাকে অবলম্বন ক'রে কেন্দ্রবিমুখী হ'য়ে পড়েছেন। এখন নিজেদেরকে বহির্মুখী অবস্থায় শতধাবিভক্ত ক'রে পাস্পরিক কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়া ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কি অভিশাপ! নিজেকে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিজেরই খণ্ড আমিত্বের পক্ষে রায় দিতে গিয়ে নিজেদেরই বিরুদ্ধে খুন-খরাবি-হিংসা-লালসায় মত্ত হতে হবে :

> ... শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, যারা পাষাণ হৃদয়। সীমালঙ্ঘনকারীরা **অশেষ মতভেদে** আছে।
>
> (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৩)

> অতঃপর আমি বললাম হে আদম! (ইবলিস) **তোমার ও তোমার স্ত্রীর** শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের ক'রে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি বেহেস্তে **ক্ষুধার্ত হবে না ও বস্ত্রহীন (বা নগ্ন) হবে না**। সেখানে পিপাসার্ত হবে না, এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল–হে আদম! আমি কি তোমাকে ব'লে দেব অনন্ত জীবন দায়ী বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা তার ফল খেল, তখন **তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল**, এবং তারা উদ্যানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো। **এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন**, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ

www.pathagar.com

হলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। তিনি বললেন–তোমরা **একে অপরের শত্রুরূপে** একই সাথে **বেহেস্ত থেকে নেমে যাও**। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৭–১২৩)

তখন শয়তান তাদেরকে বেহেস্তের বাগান থেকে নামিয়ে ছাড়ল, এবং তাদেরকে আনন্দময় অবস্থা থেকে বের ক'রে আনল যাতে তারা অবস্থান করছিল। আমি বললাম। "নেমে যাও সবাই, **একে-অপরের মধ্যে শত্রুতা নিয়ে**। কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী হবে তোমাদের আবাসভূমি এবং রুজি-রোজগারের স্থান।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৬)

কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। (সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

মানুষের এই স্ববিরোধী আচরণের কারণ হলো আল্লাহর একত্ব এবং শাশ্বত স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে তার স্মৃতিলোপ এবং অনীহা। সব মানুষের হৃদয় হওয়া উচিত ছিল একটাই। অথচ মানুষ আজ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর স্বভাবের অনুসরণ কর, যে-স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—এটাই সরল চিরস্থায়ী দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই **অভিমুখী** হও; তাকে ভয় কর, নামাজ কায়েম কর ... (সূরা রুম, আয়াত : ৩০-৩১)

এতকাল অসীম বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব ছিল তাঁদের স্বভাবের অংশ, তৃপ্তির ভিত্তি, এবং পূর্ণতার নিদর্শন। কারণ সব বহুত্ব এবং বৈচিত্র একই ঐক্যের বা তাওহীদের সুতোয় হৃদয়ের সাথে বাঁধা ছিল। আজ সেই বৈচিত্র্য ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

হে মানুষ! আমি **তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে**, পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, **যেন** তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা হতো না, যদি প্রত্যেক খণ্ড মানবের অমিত্ব বহির্মুখী কাল্পনিক বৃত্তের কেন্দ্রমুখী হয়ে স্বার্থপর এবং অহংকারী হয়ে না উঠত।

www.pathagar.com

তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে ক্ষমা চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট কালের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করার আদেশ দিলেন, যে-মেয়াদের পর তাঁদেরকে এবং তাঁদের সন্তানদেরকে আবারও বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রমুখী হতে হবে।

রাব্বানা জ্বলামনা আংফুসানা অইল্লাম্‌তাগ্‌ফিরলানা অতারহামনা লা-না কুনান্না মিনাল খছিরুন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নফ্‌সের ওপর জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, আমাদের প্রতি দয়া না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব।

তাঁদের তথা গোটা মানবজাতির নিয়তি এমনভাবে নির্ধারিত হলো যে, যে-কেউ বহির্মুখী থাকা অবস্থায় তার প্রকৃত কেন্দ্রকে ভুলে না যাবে, সে পরম বাস্তবতায় ফিরে গিয়ে **আল্লাহর সাক্ষাতে** লজ্জিত হবে না :

ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করেছিল, **তখন তার ভাগ্য নির্ণয় কর হলো,** ফলত সে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস তাকে গিলে ফেলল, তখন সে **ধিক্কারযোগ্য**। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে মাছের পেটে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো। (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

তোমাদের নিটক **শাস্তি আসার আগেই** তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। **শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না।** তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে **উত্তম কেতাব** অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, যেন (পরে) কাউকে বলতে না হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টবিদ্রূপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে—আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম।

(সূরা যুমার, আয়াত : ৫৪-৫৭)

আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

... আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে সেখানে চক্রান্ত করার **অবকাশ** দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২৩)

কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জনেন। তিনি ... জানেন যা জরায়ুতে আছে; কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (সূরা লোকমান, আয়াত : ৩৪)

www.pathagar.com

... আমি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তারা যা করছে তা শোভনীয় করেছি।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ১২২)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের মনোরোগ নিরাময় ক'রে দেবেন। (সূরা তওবা, আয়াত : ১৪)

আমি তাদের ভোগান্তিকে/দুঃখ-কষ্টকে সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলাম।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯৫)

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত বিশ্রামের প্রশান্তি পায়। (সূরা রা'দ, আয়াত :)

আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে আগেই যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কে সে তোমাদের বাধা দেয়?
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।
(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৬৭)

যে অবিশ্বাস করে, অবিশ্বাসের জন্য সেই দায়ী; যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে সুখশয্যা। কারণ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। (সূরা রুম, আয়াত : ৪৪-৪৫)

তারা অন্যদেরকে এ (কোরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এবং নিজেদেরকেও; কিন্তু তারা তো শুধু নিজেদের আত্মাকেই ধ্বংস করে, কিন্তু তারা তা বোঝে না।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ২৬)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনায় সাধনা কর, তবে তার দর্শন লাভ করবে। (সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ৬)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম। (সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭১)

যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।
(সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

তোমাদের প্রতিপালক বলেন—তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব; যারা অহংকারে আমার নামে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সূরা মুমিন, আয়াত : ৬০)

www.pathagar.com

তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

কিন্তু যে-কেউ তাঁর কাল্পনিক বহির্মুখী বৃত্তের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরবে, অর্থাৎ উদ্‌ভ্রান্ত আমিত্বকে এবং উচ্ছৃঙ্খল আশা-আকাঙ্খাকে উপাসক বানিয়ে নেবে, সার্বিক ভারসাম্যের কথা বিবেচনায় আনবে না, সে যখন কেন্দ্রমুখী হবে তখন তার কেন্দ্র প্রকৃত কেন্দ্রকে বিকর্ষণ করবে ব'লে সে নিজেরই আমিত্ব দ্বারা নির্মিত দোজখের আগুনে পুড়তে থাকবে।

আল্লাহ সর্বদাই করুণাময়। তাঁর করুণা তাঁর আক্রোশকেও অতিক্রম ক'রে যায়। তাঁর ভালোবাসাই কারো জন্য বেহেস্ত, কারো জন্য দোজখ। বিড়ালকে ভালোবাসা মানে ইঁদুরের মৃত্যুর কারণ হওয়া; অপরপক্ষে ইঁদুরকে ভালোবাসা মানে বিড়ালের অনাহারে থাকার কারণ হওয়া। তিনি সবাইকে একই কাতারে থাকতে বলেছেন। আমরা কাতারচ্যুত হলে সে দায়-দায়িত্ব আমাদের। তিনি পরকালে তার করুণাই প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা তাদের জন্য আক্রোশ হয়ে দেখা দেবে যাদের পেটে ঘি সয় না। সে দোষ আল্লাহর নয়। তিনি সকল দোষ এবং প্রশ্নের উর্ধ্বে :

দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে **একত্রিত করবেন**, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। (অর্থাৎ তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন তাঁর দয়ার আকর্ষণ দ্বারা, কিন্তু সেই দয়ার দান গ্রহণ করার উপযুক্ত যে হয়নি, সে নিজেরই সৃষ্ট নরকে নিজে পুড়বে।) (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬২)

আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪২)

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুক। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে।
(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২৩)

বুঝাই যাচ্ছে যে আল্লাহ মানুষকে একত্র করবেন তাঁর দয়ার আকর্ষণ দিয়েই, অথচ সেই দয়াই কতক লোকের জন্য শাস্তি স্বরূপ হবে। ধরুন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু তার ভালোবাসা এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে তার উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রী অন্য

www.pathagar.com

এক পুরুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ক'রে তা চালু রাখতে থাকে। কিন্তু তার স্বামী সব জেনেও না জানার ভান করে এবং তাকে দ্বিগুণ ভালোবাসতে থাকে। এক পর্যায়ে তার স্ত্রী তার ভুল বুঝতে পারে এবং আগের পথে ফিরে যায়। সে তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং স্বামীর সাথে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য কিছু শাস্তিও মনে মনে কামনা করে। কিন্তু তার স্বামী তাকে শাস্তি দেয়া তো দূরে থাক,আরো বেশি ক'রে ভালোবাসতে থাকে। ফলে লজ্জাহত স্ত্রীলোকটার কাছে স্বামীর এই ভালোবাসাই অসহনীয় শাস্তি ব'লে মনে হতে থাকে। সে তার বিবেকের এবং স্বামীর ভালোবাসার আগুনে জ্বলতে থাকে। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া তার পক্ষে আর স্বাভাবিক হবার কোনো উপায় নেই। ফলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আল্লাহ সবাইকে ভালোবাসেন। তা তিনি কোরআনেও ঘোষণা করেছেন :

আল্লাহ কখনও তার বান্দাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন না।
(সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৫১)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

যেদিন আকাশ মেঘাপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

শেষোক্ত আয়াতের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া চাই। এখান থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে তিনি প্রকৃত কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নেবেন তাঁর ভালোবাসা এবং দয়ার শক্তি দ্বারা, আক্রোশের নয়, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হৃদয় পরকালে তাঁর এই ভালোবাসার বিপরীতে নিজের মধ্যে দোজখের আগুন দেখতে পাবে। তখন যে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বারবার মৃত্যু চাইবে, কিন্তু সে সুযোগ আর থাকবে না :

আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা ক'র না, বহুবার ধ্বংস কামনা করতে থাক।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ১৪)

কেন্দ্র সর্বদাই আকর্ষণ করে. কখনও বিকর্ষণ করে না। কেন্দ্র সর্বদাই ভালোবাসে, কখনও দূরে ঠেলে না। কিন্তু বহির্মুখী আত্মচেতনা সেই ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে করতে নিজের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে কেন্দ্রমুখী হলে দোজখের আগুনের রূপ নেয়। তখন কেন্দ্রের ভালোবাসার তীব্রতা তার কল্পিত কেন্দ্রের আগুনের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২)

www.pathagar.com

সে আগুনে নিজে পোড়া ছাড়া অন্যকে তার ভাগ দেয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ ছাড়া তখন কেউই সহায় হবে না। কোরআনে তাই তো বলা হয়েছে :

তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা **মুখ ফিরিয়ে নিলে**–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

তোমাদের প্রতিপালক বলেন—তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব; **যারা অহংকারে** আমার নামে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সূরা মুমিন, আয়াত : ৬০)

তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা **অহংকারী**। এ নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে। **তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।**
(সূরা নহল, আয়াত : ২২-২৩)

অর্থাৎ আমাদের স্বেচ্ছাচারী, অহংকারী আত্মচেতনাই দোজখে পুড়বে, চেতনা নয়। চেতনা বা চৈতন্য হলো সার্বিক বাস্তবতার অখণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। মনের আদমীয় স্তরে, বেহেস্ত থেকে পতনের আগে, আত্মচেতনা চেতনার সামগ্রিকতাকে স্বীকৃতি দিত—ফলে তখন অস্তিত্বের ধারণকারী ফর্মুলা ছিল একটাই—তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব। আদম-হাওয়া (আঃ) আল্লাহর একত্বের রজ্জুতে তাঁর সাথে এমনভাবে বাঁধা ছিলেন যে আল্লাহই ছিলেন তাঁদের নিকটতম প্রতিবেশী, যা হাদীসে বলা হয়েছে। কিন্তু তথাকথিত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম-হাওয়া (আঃ) **সংকীর্ণ আত্মজ্ঞান** লাভ করলেন—তাঁরা আর আল্লাহর সাথে লীন হয়ে বা প্রেমপূর্ণভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। তাদের **খণ্ডিত আত্মচেতনার** আলোর পেছনে যে প্রখর আগুন ছিল তা তারা টের পেলেন আল্লাহ-কেন্দ্রিকতা ভুলে যাবার পরেই, আগে নয়। তবে এখনও যে-কেউ আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে তাঁরই দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছে :

ইন্নি অজ্জাহাতু অজিহালিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি অয়াল আরদা হানীফাও অমা-আনা মিনাল মুশরিকীন।

সে মুক্তি পেয়েছে—কার কবল থেকে? —নিজের আমিত্বের আগুনের কবল থেকে। আমরা নামাজে দাঁড়িয়েই এই আয়াতটা পড়ি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নাতুর মন যখন সৃষ্টিজগতের পুজোর বাসনা ছেড়ে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন, তখন তিনি এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন।

... আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও জমিনের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখাই, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর যখন তার ওপর রাত আচ্ছন্ন হলো, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল,

www.pathagar.com

যা অস্তমিত হয় আমি তা পছন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। যখন সেটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। এটাই সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর সমকক্ষ কর, তা থেকে আমি মুক্ত। **নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মুখ স্থাপন করলাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।** (সূরা আন'আম, আয়াত : ৭৫-৭৯)

আমরা আমাদের ওপরই জুলুম ক'রে থাকি। এজন্য আল্লাহর মুখোমুখী হয়ে আমাদেরকে বিনীতভাবে দোয়া করতে হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সঃ) কে অনুরোধ করলেন এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দিতে যা তিনি নামাজের মধ্যে পড়তে পারবেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এই দোয়াটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন :

আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বালাম্‌তু নাফ্‌সি জুল্‌মান কাছিরাও অলাইয়াগ্‌ফিরুজ্‌জুনূবা ইল্লা আনতা ফাগ্‌ফিরলি মাগফিরাতাম্‌ মিন্‌ 'ইন্‌দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নফ্‌সের ওপর জুলুম করেছি, বড় ধরনের জুলুম। এবং তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও। এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আমাদের আত্মচেতনা সহ গোটা আমিত্বের ধারক ও বাহককে একত্রে বলা হয় নফস বা Soul বা আত্মা। এর জীবনের উৎস হলো রূহ্‌। এই নফ্‌সের ওপর জুলুম করা মানেই হলো একে কেন্দ্রবিমুখী ক'রে রাখা, পার্থিব বাহ্যিক ভোগলালসায় মত্ত রাখা।

তাহলে আমরা আবার সেই দেহতত্ত্বে ফিরে যাই। দৃশ্যজগতের সার্বিক ভারসাম্য দ্বারা তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটা ব্যক্তির এবং ব্যবস্থার ভারসাম্য নির্ধারিত। প্রত্যেকটা সাব-সিস্টেমের (যেমন মানুষ, জলবায়ু) রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় নিজস্ব চলার পথ। এই গোটা পথটাকেই তার **গতিশীলতার ভারসাম্য** ব'লে আখ্যায়িত করা যায়। এই ভারসাম্যের অর্থ হলো : **কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হলো তার নিজস্ব গতিশীলতার ভারসাম্যের পথ ধ'রে চলা। এই পথ ধ'রে চললে তার দেহ-মন-আত্মা ইত্যাদি সার্বিকতার যে সমন্বয় বজায় থাকবে, তার ইহকাল এবং পরকালের জন্য সেটাই সবচেয়ে উত্তম অবস্থা। এর একটু এদিক-ওদিক হলে যে বিচ্যুতি বা অনিয়ম দেখা দেবে তা পূরণ হবে দৈহিক বা মানসিক বা আর্থিক বিপদাপদের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে, কারণ বিচ্যুতি যদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে তাহলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় না, শুধু বিচ্যুতির সাথে সংশ্লিষ্ট একটা উপসর্গের সৃষ্টি হয়ে তার তাৎক্ষণিক খেসারত হয়ে যায়।**

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ, আপনি এক দিনে ঠান্ডা পানি দিয়ে পাঁচবার গোছল করলেন। সেক্ষেত্রে আপনার জ্বর হতেও পারে। কারণ শরীর থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপ বের হয়ে গেছে। জ্বর তো এই তাপের ঘাটতিই পূরণ করছে, নয় কি? তাহলে এক্ষেত্রে জ্বরের কী দোষ? **তার যখন আসবার কথা সে তখন এসেছে কিনা এটাই দেখবার বিষয়।** জ্বরের মাধ্যমে শরীরে তাপের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা না থাকলে, অর্থাৎ কোনো ঘাটতিকে পূরণের ব্যবস্থা না থাকলে, স্থায়ী ঘাটতি সৃষ্টি হতে থাকত। এটাই হতো অস্বাভাবিক, উদ্দেশ্যহীনতার লক্ষণ। কিন্তু **প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ভারসাম্যবিন্দু একই সাথে একটা লক্ষ্য এবং একটা উৎস : উৎস এজন্যে যে তা থেকেই ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ-ঘাটতির প্রতি সাড়া দেয়া হবে, ফলে তা তার সার্বক্ষণিক শিক্ষক এবং গতিবিধির উৎস, এবং গন্তব্য এ জন্য যে তাকে সেই ভারসাম্যের শর্তকে সর্বদা বজায় রাখার চেষ্ট করতে হবে, নইলে তাকে ঘাটতির কষ্ট পেতে হবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে ব'লে আমরা নিশ্চিতভাবে আস্থার সাথে জীবন-যাপন করতে পারি,এই ভেবে যে আমি নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখি বা না রাখি, আমার ভারসাম্য আমার দিকে লক্ষ্য রাখছে; আমার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সে আমাকে রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে জানিয়ে দেবে।** এজন্য রোগ-ব্যধিকে হাদিসে দেহের সাদকা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—তা আচরণের ত্রুটির খেসারত বা সাদকা স্বরূপ।

সঠিক আচরণবিধি থেকে যত ধরনের বিচ্যুতি হয়ে থাকে তাদেরকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

ভ্রান্তি—যা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করে না

ত্রুটি—যা ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে করে।

এদের মধ্যে প্রথম বিচ্যুতির ফল পরকালে পৌঁছায় না ব'লে তার সমস্তটুকু ইহজীবনেই ভোগ করতে হয়। দ্বিতীয় ধরনের ভুল মনের কপটতা এবং পাপ-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত হয়। তবুও একটা বিশেষ সীমা (যা সংশ্লিষ্ট পাপের জঘন্যতা,তা থেকে উদ্ভূত ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা, ক্ষতির প্রকৃতি পাপকারীর অন্যান্য ভালোকাজের প্রকৃতি এবং পরিমাণ, ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল) অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত তা চূড়ান্তভাবে পরকালের খাতায় লেখা হয় না, তার ফলকে ব্যক্তির ওপর ইহকালে বিভিন্ন বিদাপদের মাধ্যমে চাপানো হয়। **বিপদ চাপানো মানেই হলো ভারসাম্যকে ঠিক রাখা—ব্যক্তিকে সম্মানের গদি থেকে নামিয়ে দেয়া হয় না, কেবল জরিমানা করা হয় মাত্র।** যেমন, হযরত সুফিআন সওরী (রঃ) মারা গেলে আল্লাহ তাঁকে বললেন—তুমি অত কাঁদতে কেন? তিনি জবাব দিলেন—তুমি আমাকে ক্ষমা কর কিনা সেই ভয়ে। আল্লাহ বললেন—লজ্জা করতো না কাঁদতে? তুমি জানতে না যে আমি পরম করুণাময়? তোমার কান্না দেখে আমি তো লেখককে আদেশ ক'রে দিয়েছিলাম তোমার

www.pathagar.com

কোনো খারাপ কাজ লিপিবদ্ধ না করতে। কোরআনেও এই অপূর্ব ক্ষমার কথা বলা হয়েছে :

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (এটাও এক ধরনের ক্ষমা।) (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা **মুখ ফিরিয়ে নিলে**–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

অতঃপর আমি বললাম হে আদম! (ইবলিস) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের ক'রে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি বেহেস্তে ক্ষুধার্ত হবে না ও বস্ত্রহীন (বা নগ্ন) হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না, এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল–হে আদম! আমি কি তোমাকে ব'লে দেব অনন্ত জীবন দায়ী বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা তার ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং তারা উদ্যানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো। **এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন**, তার প্রতি **ক্ষমাপরবশ** হলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। তিনি বললেন–তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সাথে বেহেস্ত থেকে নেমে যাও। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৭–১২৩)

বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, **দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন**। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে–তা শাস্তি হোক অথবা কেয়ামত হোক। (সূরা মরিয়ম, আয়াত : ৭৪)

আমি তাদেরকে **সময় দিয়ে থাকি**। আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৮৩)

... আল্লাহ তার কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর **যে করুণা বর্ষণ করেছেন তা কখনও পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত** তারা তাদের মনকে পরিবর্তন না করে ...
(সূরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ তাদেরকে **ভালোবাসেন**।
(সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭১)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত। (কিন্তু তিনি তাদের ভুল শোধরাবার সুযোগ দিচ্ছেন।) (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

www.pathagar.com

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (এভাবেও তিনি তাঁর করুণা বর্ষণ করেন।) (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। **এ জন্য যে**, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), **তার জন্য দুঃখিত হয়ো না**, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (এই দীর্ঘ জীবনটাই সবচেয়ে বড় করুণা) (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] বল যারা নিজ জীবনের প্রতি জুলুম করেছ, তারা **আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না**। আল্লাহর সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন; তিনি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা **মুখ ফিরিয়ে নিলে**–আল্লাহ্ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

... যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের **মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব**, এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দেব। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৭)

কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না।
(সূরা আন্'আম, আয়াত : ১৬০)

কিন্তু ব্যক্তির ঔদ্ধত্য চরমে যেতে থাকলে তার ওপর পার্থিব বিপদাপদ বহুগুণে বর্ধিত ক'রে দেয়া হয়, যেন সে তওবা ক'রে পথে ফিরে আসার সুযোগ পায় :

আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (সূরা দোখান, আয়াত : ১৫)

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করানো হয়, যেন ওরা পথে ফিরে আসে। (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং **ওদের কৃতকর্মের ফলে** ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

কিন্তু তার পরও যদি ব্যক্তি না বোঝে, কিন্তু সে বিশ্বাসী হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ করুণা ক'রে পাশাপাশি বেশি বেশি ভালো কাজ করার সুযোগ ক'রে দিতে পারেন

www.pathagar.com

কিংবা তিনি যদি মনে করেন যে তাকে মৃত্যু দেবেন বা তার আয়ু বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে তাও করতে পারেন।

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য থাকে বান্দার পরকালের পথটাকে পিরষ্কার ক'রে রাখা, যদি সে বিশ্বাসী হয়। একটা হাদিসে আছে, আল্লাহ রসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলছেন :

আমার কোনো বিশ্বাসী বান্দা যদি পাপ করে তাহলে আমি ইহকালে তাকে রোগ-ব্যাধি অভাব-অনটন ইত্যাদি বিপদাপদ দিয়ে ভ'রে দেই। তাতেও যদি তার পাপ না কাটে, তাহলে তার মৃত্যুর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেই। তাতেও যদি তার পাপ অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমি তার কবরের আযাব বাড়িয়ে দেই, যেন তার পরকালের অনন্ত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

দেখলেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের লক্ষ্য কোনদিকে? আমাদের চিন্তা বড়জোর মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছায়, অথচ তাঁর চিন্তা আমাদের পরকাল নিয়ে, যা সচরাচর আমাদের চিন্তায় গাঢ়ত্ব লাভ করতে চায় না, যেহেতু আমরা সবাই বর্তমানটা নিয়েই ব্যস্ত। মানুষ বড়ই অস্থির। তা কোরআনেই বলা হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ বলছেন যে, আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল আমাদের অনুভূতির যুক্তিতে ধরা পড়ার নয়।

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫৪)

তোমরা অনুমান ও নিজেদের স্বভাবের অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, আয়াত : ২৩)

আমি কি তোমাকে জানাব কার প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটা ঘোর বিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারাই যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার ক'রে থাকে। এবং ওরা যা বলে তা করে না। তবে তাদের কথা আলাদা যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ... (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ২২১-২২৭)

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

www.pathagar.com

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।

(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস করার পর সন্দেহ পোষণ করে না ... (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসুলুল্লাহ (সঃ) কে আরও বলেছেন পূর্ববতী কথাটার ঠিক উল্টো কথাটাও :

কোনো অবিশ্বাসী যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন আমি তার পুরস্কারস্বরূপ তাকে সুস্বাস্থ্য, ভোগ-উপভোগের উপকরণ, অঢেল সম্পদ, মান-যশ ইত্যাদি দান করি। কিন্তু তাতেও যদি তার পুণ্য কিছু বাকি রয়ে যায় তাহলে আমি তার মৃত্যুর যন্ত্রণা কমিয়ে দেই। তাতেও যদি তার পুন্য কিছুটা অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমি তার কবরের আযাব লাঘব ক'রে দেই, যেন সে পরকালের অনন্ত জীবনে দোজখের আগুনে জ্বলতে পারে।

কি বিস্ময়কর! আসলে এই পদ্ধতিটিই ঢুকানো রয়েছে ভারসাম্যের মধ্যে—ভারসাম্য একটা মজবুত বাক্সের মতো, তাতে আছে কিছু জ্বালানি : আপনি যতটুকু জ্বালানি খারাপ কাজে খরচ করবেন ততটুকুর জায়গা আপনার জন্য দোজখ আকারে সঞ্চিত থাকবে; আর আপনি যতটুকু জ্বালানি পুড়িয়ে ভালো কাজ করবেন, ততটুকু জায়গায় পুন্য সঞ্চিত হবে, যার বিনিময় হলো প্রশান্তি এবং আনন্দ—কিন্তু আপনি যদি আল্লাহকে বা পরকালকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে আপনার পুন্যের সবটুকুকে ইহকালে দিয়ে দেয়া হবে; অপরপক্ষে আপনি যদি গভীরভাবে বিশ্বাসী হন, তাহলে আপনার বাক্সটাকে এমনভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হবে যেন সব খারাপ কাজের ফল ইহকালের এবং সব ভালো কাজের ফলই পরকালের ভাগে পড়ে। তখন ইহকালে আপনাকে শুধু তাই দেয়া হবে যা না হলে আপনার স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যাহত হবে। আল্লাহ কোরআনেই বলেছেন যে, যে-কেউ ইহকাল চায়, তাকে সব প্রাপ্য ইহকালেই দিয়ে দেয়া হয়। এ হলো আল্লাহর করুণা—হয় আমি যা চাচ্ছি তিনি আমাকে তা দিচ্ছেন, না হয় তিনি আমাকে তাই দিচ্ছেন যা পেলে আমি খুশি হব, যা আমার চর্মচক্ষু কখনও দ্যাখেনি, মস্তিষ্ক কখনও কল্পনা করেনি :

কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের কী নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে আছে।

(সূরা সিজদাহ, আয়াত : ১৭)

তিনি মানুষকে ভালোই বাসেন, মানুষ সেই ভালোবাসাকে দোজখে রূপান্তরিত করে :

আল্লাহ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন।

(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

www.pathagar.com

মোট কথা কেউ যা চায় তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি কর্মফল নিয়ে। দুঃখ-যাতনা অন্য দিক থেকেও আসতে পারে—**পরীক্ষা**। এই পরীক্ষা শুধু তাদেরই জন্যে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বা করে ব'লে প্রচার করে। আল্লাহ্ কোরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসের সমান গুরুত্বের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চালিত করেন :

> মানুষ কি মনে করে যে, শুধু আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? নিশ্চয়ই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ ক'রে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।
>
> (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩)

কেন এই পরীক্ষা? সাধারণ মানুষ এর অর্থ বোঝে না। কারণ তারা অধিকাংশ সময়ে খেয়ালই রাখে না যে তাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু **আল্লাহর একনিষ্ঠ ভক্তগণ পরীক্ষার প্রতি সচেতন এবং তারা পরীক্ষাহীন ব্যধিহীন দুর্দশাহীন অবস্থায় কিছুদিন থাকলে কষ্ট পান—ভাবেন, আল্লাহ কি তাদেরকে ভুলে গেলেন?** এরূপ ব্যক্তিদেরকে যে-পরীক্ষা করা হয় তা কোনো স্বেচ্ছাচারিতা নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত মজার। আপনি যদি কায়মনোবাক্যে তওবা ক'রে আল্লাহর পথে ফিরে আসেন এবং আপনার হৃদয়ে তার জিকির সদা বলবৎ রাখেন, তাহলে তিনি আপনাকে একের পর এক বিপদের মধ্যে ফেলবেন—শারিরীক ব্যধি, অর্থকষ্ট, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা ইত্যাদি। এটা ঘটে দুটো কারণে : প্রথমত, কেউ বিশুদ্ধ হৃদয়ে তওবা করলে আল্লাহ এতই খুশি হন যে তার জন্য পরকালে বেহেস্ত নসিব ক'রে দেন—ফলে তার পাপকর্মের ফলগুলোকে তার কাছে দ্রুত পেশ করা হয়, যেন সে তা এখানেই নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারে। এই অবস্থায় আল্লাহর ওপর সর্বান্তকরণে নির্ভর করলে সব প্রয়োজন তিনিই পূরণ ক'রে দেন—এমন এমন জায়গা থেকে তিনি বান্দার জন্য রিযিক প্রেরণ করেন যা বান্দা ভাবতেও পারে না। দ্বিতীয়ত, **যার মধ্যে যত ওপরে ওঠার কামনা বর্তমান, তার কাছে সিঁড়ির একধাপ শেষ হবার সাথে সাথে পরবর্তী ধাপকে এনে হাজির করা হয়। ফলে বিপদ তার থামতেই চায় না। আমি যে-সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি, তার পরবর্তী সিঁড়ি যদি তা থেকে খুব বেশি দূরে হয়, তাহলে আমি উপরে উঠব কিভাবে? অন্য কথায়, বিপদ একটা অতিক্রান্ত হলে পরবর্তীটা আসতে যদি খুব বেশি দেরি করে, তাহলে উপরে ওঠাও যে বিলম্বিত হয়ে যাবে।** যে-ছাত্র এস.এস.সি. পাশ করেনি, তাকে তো এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ডাকা হয় না। যে-ব্যক্তি মাথাটা যতটা নত করে, তাকে তত সুযোগ দেয়া হয়, তত পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো—সুযোগ দেয়ার সাথে বিপদাপদের কী সম্পর্ক? হ্যাঁ, এখানেই তো রহস্য। কেউ যখন একটা নির্দিষ্ট ভারসাম্য বিন্দুর সব দাবি সুন্দরভাবে পূরণ করতে পারে তাকে পরবর্তী ভারসাম্যবিন্দুতে, অর্থাৎ আরো উচ্চ মর্যাদার অবস্থানে, দাঁড়াতে

www.pathagar.com

সুযোগ ক'রে দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়া একেবারে স্বয়ংক্রিয়—আল্লাহ সৃষ্টি-পরিচালন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে কেউ কোনো পরীক্ষায় পাশ করার সাথে সাথে তাকে পরবর্তী শ্রেণীর পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য ক'রে নেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী ভারসাম্যে স্থিত হওয়ার জন্য তার রয়েছে অনেক ঘাটতি—আমলের অভাব, ভালো কাজের অভাব, জ্ঞানের অভাব, ধৈর্যের অভাব। অভাব পূরণ না ক'রে যথাযথ প্রশিক্ষণ না নিয়ে, সেখানে পৌঁছানো তার দ্বারা কিভাবে সম্ভব? এজন্য তাকে তার ঘাটতি পূরণ করার জন্য সুযোগ দেয়া হয়—হয় প্রচুর সেলামী বা খেসারত দাও, নইলে বিনা পারিশ্রমিকে কিছু কাজ ক'রে দাও, নইলে বিপদাপদের মুখোমুখী হও এবং ধৈর্য সহকারে আল্লাহকে ডাক। **অপেক্ষা করতে শেখাই সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ**। তা আবশ্যক। যার প্রশিক্ষণ নেই, তাকে পদমর্যাদা দেয়া হবে কিসের ভিত্তিতে?

ব্যাপারটা এরকম : ধরা যাক কাউকে লেফটেন্যানট থেকে সরাসরি মেজর পদে উন্নীত করা হবে; শর্ত তেমন কিছু না, একটাই—প্রার্থীর ওজন হতে হবে মাত্র পঞ্চাশ কেজি। এখন কোনো প্রার্থীকে যদি ঠিক এই ওজন অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তো কোনো কথাই নেই, সে পদটা পেয়ে যাবে। কিন্তু যার ওজন বেশি তাকে ওজন কমাতে হবে। সে যদি তাতে অপারগ হয়, তাহলে তার মাথার ওপর এমন বোঝা চাপানো হয় এবং এমন সময় পর্যন্ত তাকে তা বইতে বাধ্য করা হয় যেন তার ওজন পঞ্চাশ কেজিতে নেমে আসে। এ অবস্থায় তাকে অভাবে অনাহারে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

এ হলো করুণাময়ের ভালোবাসা।

ধরুন আপনার একটা দশ বছর বয়সের ছেলে বা ভাই আছে। সে বাইরে খেলাধুলা ক'রে বেড়াতে পছন্দ করে। কিন্তু ছেলেধরা, অপহরণকারী, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ ইত্যাদির ভয়ে আপনি তাকে ঘরে আটকে রাখছেন। এই কারারুদ্ধ হয়ে থাকার কারণে সে অতীষ্ঠ। সে আপনার ওপর ক্ষিপ্ত। তার ধারণা আপনিই তার সব চেয়ে বড় শত্রু এবং আপনি তার জীবনের সুখ চান না। অথচ সে যদি আপনার মাথার মধ্যে ঢুকে আপনার তরফ থেকে চিন্তা করত, তাহলে বুঝত যে তার ওপরে আপনার প্রবল ভালোবাসার কারণেই আপনি তাকে গৃহবন্দী ক'রে রাখছেন।

সে যদি আপনার অনুভূতিটা বুঝত, তাহলে তার ভুল ধারণা তাকে আর কষ্ট দিতে পারত না। বরং সে কৃতজ্ঞ থাকত, আপনার কাছে তার যে কত মূল্য তা বুঝতে পেরে সে বরং আনন্দিতই হতো। এবং ঘরে আটকা পড়ে থাকার কষ্টটুকুকে সে সাধনা হিসেবে নিত।

সুতরাং যাবতীয় বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে এই তাগিদ দেয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে যে-কোনো রোগ-ভোগের সাথে আল্লাহর রহমত এবং পাপ-ক্ষয় জড়িত।

তারপরও যন্ত্রণা মানুষকে কষ্ট দেবেই। সুতরাং তা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

www.pathagar.com

তার পরও দুটো উপায়ের কথা ব'লে দেই : এক, যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করা এবং তাকে ভুলে থাকা এবং দুই, যন্ত্রণার মধ্যে ঢুকে পড়া এবং তাকে উপভোগ করা—এবং মনে-মনে নিজেকে বলা : হে দেহ, হে মন, এটাই তো আমি চাই। সুতরাং সহ্য তোমাকে করতেই হবে। তা যদি তুমি না কর, তাহলে আমি তোমাকে অস্বীকার করি। তবে যন্ত্রণা যখন কোনোভাবেই উপশম হচ্ছে না, তখন তাকে কাজে লাগানোই উত্তম। একজন বিশ্বাসী তার যন্ত্রণাকেও বৃথা যেতে দেন না। তিনি জ্ঞানী এবং উদারমনা হয়ে থাকলে প্রার্থনা করেন : প্রভু গো! যে যন্ত্রণা তুমি আমাকে দিচ্ছ তা আমার প্রাপ্য—তা আমারই মঙ্গলের জন্য, কারণ তা হয় আমার কর্মফল, যার দ্বারা আমার পাপক্ষয় হবে, কিংবা তা তোমার তরফ থেকে আমার ওপর পরীক্ষা, যার বিনিময়ে আমি যোগ্যতা এবং রহমত প্রাপ্ত হব। কিন্তু এই কষ্টের অনুভূতি বৃথা যাক, আমি তা চাই না, প্রভু। সুতরাং হে পরওয়াদেগার! আমার এই যন্ত্রণার সদ্ব্যবহার হোক। সুযোগ হাতছাড়া হোক তা আমি চাই না, প্রভু। হে আল্লাহ, আমার প্রত্যেকটা যন্ত্রণার ওজনের লক্ষগুণ ওজনের সালাম এবং রহমত তুমি রসুল (সঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের এবং তাঁর সাহাবাকেরামগণের এবং তাঁর রক্তের বংশধর যারা ছিলেন এবং আছেন তাদের এবং সারা পৃথিবীর খাঁটি বুযুর্গ ও মুমিন বান্দাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার যন্ত্রণা এবং রোগভোগ সফল হোক।—বিশুদ্ধ এবং প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে এই প্রার্থনা করতে পারলে এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটবে। কী ঘটবে তা আমি বলব না।

একটা প্রত্যক্ষ প্রামাণ দেই। নামাজে কি আপনি মন স্থির করতে পারেন? না। এমনকি আপনার দেহটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না—চোখ বিক্ষিপ্ত হয়,কান বাইরের কথা শোনে, নাকের ওপর বিড়বিড় করে, পিঠে পিঁপড়া যেয়ে বেড়ায়, হাই আসে—ঠিক যেগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া নিষেধ, সেই উপসর্গগুলোই বেশি ক্ষ্যাপে। দেহ বাগ মানে না—এখন না, একটু পরে নামাজ পড়া যাবে। সারাদিন ক্রিকেট খেলেও ক্লান্তি আসে না, অথচ মাত্র চার রাকাত নামাজ পড়তে সে কি কষ্ট!

এসবের আর্বিভাবই প্রমাণ করে যে নামাজ সত্য!

যাহোক, আল্লাহর পথে যারা পাগলের মতো ছোটেন, তাদের এই সমস্যা আরো বেশি হয়। নামাজে মন যেমন বাগ মানে না, সেই অবস্থা এক পর্যায়ে তাদের মনে সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজ করে। সাধক তখন পাগলের মতো হয়ে যায়। বিশেষত যারা গভীর মনোযোগের সাথে নামাজ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, তাদের এই অবস্থা হয়।

কেন হয় এরূপ? কারণ কোরআনে এবং হাদিসে আছে যে নামাজ দেহ-মনের সমস্ত পাপ এবং ময়লা পরিষ্কার ক'রে দেয়। গভীরভাবে নামাজ পড়লে এক পর্যায়ে গিয়ে নিজের মনের গভীরের ময়লা আত্মচেতনায় চ'লে আসে এবং তা মন থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে। মন খালি হতে থাকে। এ অবস্থায় বিভিন্ন কুকথাও মনে আসে। এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

যতদিন মনটা পরিষ্কার না হয়, ততদিন যতবারই মনের এসব ময়লা উঠে আসে, ততবারই ইস্তেগফার পড়তে হয় (আস্তাগফিরুলালাহা...)—দিনে হাজার বার হলেও।

মনের ময়লার সাথে দেহের ময়লা যখন সাফ হওয়া শুরু হয় তখন চোখ ফেটে রক্ত বের হতে পারে, গলা দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসতে পারে, কফের সাথে রক্তাক্ত মাংসখণ্ডের মতোও পড়তে পারে, মনটা হাইপার অ্যাকটিভ্ হওয়ার কারণে অ্যাসিডিটি অত্যন্ত বেশি ক্ষেপে যেতে পারে। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) আল্লাহর ভয়ে কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তাঁর প্রস্রাবের সাথে কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ত, যা এক ইহুদী ডাক্তার চিকিৎসা করতে এসে সব দেখেশুনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এরূপ অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ নিতে হবে, তাঁকে ভয় করতে হবে, যতটা করা সম্ভব। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন—তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যতটা করা উচিত।

... আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮)

তারা শয্যাত্যাগ ক'রে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় ... ।
(সূরা সিজদাহ্, আয়াত : ১৬)

কিন্তু তার করুণার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া যাবে না। অনেকে এরূপ অবস্থায় আত্মহত্যার কথা ভাবে। সাবধান! আল্লাহর করুণাকে যে ছোট্ ক'রে দ্যাখে সে কাফের। আল্লাহ নিজেই কোরআনে তা বলেছেন। তাছাড়া তিনি বড় পাপীকেও সাহস দিয়েছেন :

তুমি [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] বল যারা নিজ জীবনের প্রতি জুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন; তিনি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩)

দয়া করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছে। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২)

তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১)

তারা ক্ষমাপ্রার্থনা (তওবা) করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে–আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন।
(সূরা তওবা, আয়াত : ৭৪)

তোমাদের প্রতিপালক বলেন—তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব; যারা অহংকারে আমার নামে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সূরা মুমিন, আয়াত : ৬০)

www.pathagar.com

এখানে লক্ষণীয় যে নামজ এমনই একটা আধ্যাত্মিক সাধনা যার সীমানার মধ্যে সাধকের জীবনের এবং অস্তিত্বের সবগুলো দিক যেমন দেহ মন আত্মা ইহকাল পরকাল বাঁধা পড়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত নাস্তিকরা নামাজকে কল্পনার সারবস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা ক'রে বলতে চায় যে তা কেবল অদৃশ্যের সাথে জড়িত। কিন্তু আসল সত্যটা তা নয়। যে জ্ঞানী সে নামাজ পড়েই দেখুক। এর মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তির গোটা অস্তিত্বের কেন্দ্র—যা দেহ-মনকে দূরে রাখেনি। দেহের রক্ত, সর্দি-কাশি, জৈবিকতা এসব নামাজের বাইরে নয়! নামাজে এর সবই পরিষ্কার হয়। তবে শর্ত একটাই—সঠিক নিয়মে ঠাণ্ডা মাথায় নামাজ পড়তে হবে। আমাদের দেহের অপবিত্রতা দেহেই রয়ে যায়। একটা সীমার পরে তা মনে প্রবেশ করে। মন থেকে তা প্রবেশ করে আত্মায়। এভাবে তা ইহকাল থেকে পৌঁছে যায় পরকালে। কেউ তওবা করলে এবং বেশি-বেশি নামাজ পড়লে ও ভালোকাজ করলে, তার জীবদ্দশাতেই তার পরকাল পরিষ্কার হয়ে যায়। একথা প্রমাণিত এবং প্রমাণযোগ্য। সমস্যা শুধু এখানেই **যে আমি যা বলছি তার প্রমাণ রয়েছে আপনার মধ্যে। আপনি তা নিজে না দেখা পর্যন্ত আমার প্রমাণের সত্যতাকে বুঝবেন কিভাবে?**

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে ওজু করার সময়ে পাপ ধুয়ে যায়। নাকে পানি দিয়ে ভালোভাবে নাক ধুলে পাপ ধুয়ে যায়। কী এই পাপ? তা যাই হোক, তার প্রকাশ্য রূপ সরাসরি রক্ত, মাংস, শ্লেষ্মা ইত্যাদির সাথে মিশে থাকে। সুতরাং দেহ, মন, কাজ, বিশ্বাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি—সবকিছুর জন্যই ধর্ম।

যাহোক, আমি বলতে চাচ্ছিলাম অন্য কথা। প্রাথমিক সাধনার অবস্থায় দেহ এবং মনকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা কারো থাকে না। এজন্য আল্লাহ করুণা ক'রে রোগ-ব্যাধি দ্বারা দেহকে দুর্বল এবং ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেন। মুহুর্মুহু তাকে মৃত্যুর ভয়ে দলিত করতে থাকেন। এই পথে যিনি এগিয়েছেন তিনি জানেন এটা আল্লাহর তরফ থেকে কত বড় করুণা। যে-দেহকে আপনি কন্ট্রোল করতেই পারেন না, তাকে আল্লাহ এমনভাবে কন্ট্রোল ক'রে দেবেন যা আপনি ভাবতেই পারবেন না।

www.pathagar.com

নয়

মনের শত্রু, মনের মিত্র

এতক্ষণ আমরা মনের কাঠামো, তার বিস্তার এবং সম্ভাবনা, তার শক্তি এবং সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা, তার কারাগার ও তার মুক্তির রূপরেখাটা দেখলাম। গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে মনের কী সম্পর্ক আমরা তাও দেখলাম। এসব কিছুর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও ফল সম্বন্ধে। এখন মনের বিশেষ উপাদানকে অবলম্বন ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণকে কিভাবে আমিত্বের প্রতিটি পরতে পরতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আমরা তা দেখব। আমরা দেখব যে মনের গঠন-উপাদানগুলোই তার শত্রু এবং মিত্র। মনের উপাদানগুলো হলো মনের হাতিয়ার, যা ব্যবহার ক'রে মন তার উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে সুখী হতে চায়। এরাও মনের শক্তিশালী সহায়ক, স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে এদের শক্তি আসে ব'লে এরা এতই শক্তিশালী যে এদের দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষকে শক্তিশালী করেন তার মনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। জগৎ-পাল্টে-দেয়া সব ব্যক্তিই তাদের শক্তি পেয়েছিলেন মন থেকে, দেহ বা অর্থ-সম্পদ থেকে নয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর শক্তি কি তার দেহে ছিল? মুসলিম খেলাফতের যুগে মুসলমানেরা অসাধ্য সাধন করেছিল মনের জোরে, অবশ্যই গায়ের জোরে নয়। হযরত আলী (রাঃ) এর শক্তি কোথায় ছিল, দেহে নাকি মনে? তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের একজন মানুষ। তিনি তাঁর দেহ দিয়ে যুদ্ধ করেননি, তিনি যুদ্ধ করেছেন তাঁর মন দিয়ে। এমনকি কুস্তি, যাকে আমরা খাঁটি মাংসপেশীর কাজ ব'লে জানি, সেখানেও সফলতার মূলমন্ত্র হলো মনের জোর। যে-কেউ টিভি-র পর্দায় কুস্তি দেখেছে, সেই একথার সত্যতা ভালোভাবে জানে। **হাতী এজন্য শক্তিশালী যে সে তার নিজের ওজন জানে।**

সুতরাং মনের শক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরার কোনো দরকারও নেই। সবাই জানে যে মানুষের সব শক্তিই আসে তার মন থেকে। আর এই মন তার শক্তি এবং দিকনির্দেশনা পায় আল্লাহর কাছ থেকে এবং সে তার শক্তি হারায় আল্লাহর অভিশাপে এবং বিভ্রান্ত হয় ইবলিসের কুমন্ত্রণায় :

... এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন ... (সূরা আহযাব, আয়াত ২৬)

www.pathagar.com

আমি কি তোমাকে জানাব কার প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটা ঘোর বিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারাই যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার ক'রে থাকে। এবং ওরা যা বলে তা করে না। তবে তাদের কথা আলাদা যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ... (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ২২১-২২৭)

তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে **অন্তরে ইশারা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা** দিয়েছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে, ও মানুষ যে-গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (সূরা নহল, আয়াত : ৬৮)

মুসা-জননীর হৃদয় **অস্থির** হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল তার জন্য আমি তার হৃদয়কে **দৃঢ় ক'রে না দিলে** সে তার পরিচয় তো প্রকাশ ক'রেই দিত।
(সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ১০)

যাতে সে আস্থাশীল তার জন্য আমি তার **হৃদয়কে দৃঢ় না ক'রে দিলে** সে তো তার পরিচয়কে প্রকাশ করেই দিত। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ১০)

আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তো ওদের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হবার কাছাকাছি গিয়েছিলে। (সূরা বণি-ইসরাইল, আয়াত : ৭৪)

ফলে একটা কঠোর এবং অপ্রিয় সত্য আছে যা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তা হলো : মনই সব শক্তির উৎস ব'লে আমরা শুধু মনের সৃজনশীল ক্ষমতার দিকে তাকালে ভুল করব। তার সৃজনশক্তি যতটুকু, তার ধ্বংসাত্মক শক্তিও ঠিক ততটুকু। ফলে **মনের শক্তিই মনকে ধ্বংস করে। মন ছাড়া অন্য কিছুই মনকে ধ্বংস করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে হত্যা ব'লে কিছু নেই—মনের মৃত্যুর একটাই উপায় আছে—আত্মহত্যা। মন এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তাকে অন্য কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এবং সে এতই অসহায় যে সে নিজেই বোকার মতো নিজেকে ধ্বংস ক'রে বসে।**

মন ছাড়া আর কেউই মনকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু **মনেরও ধ্বংসের প্রয়োজন আছে, যদি সে আল্লাহর বিরোধিতা করে। এ কারণে আল্লাহ্ মনের শক্তির ফর্মুলার মধ্যে কিছুটা অন্ধত্ব রেখে দিয়েছেন, যেন সে যদি আল্লাহকে চিনতে ভুল করে, তাহলে সে যেন নিজেকেও চিনতে না পারে, এবং সে যেন নিজেই নিজের বিরোধিতা ক'রে নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হয় :**

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (কারণ মনই সৃষ্টিজগতের জ্বালানি এবং ফলে সৃষ্টিজগৎই মনের প্রতিফলদায়ক ফাঁদ।) (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (অর্থাৎ মনের ক্রিয়া তারই ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে।)
(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

www.pathagar.com

যারা নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। (এবং অবিশ্বাসের ফলে সেই আত্মা আরো হারিয়ে যায়।) (সূরা আন্‌আম, আয়াত : ২০)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (কারণ মনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বৃত্তাকার : তার আচরণ তারই দিকে ফেরত আসে।)
(সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন। (কারণ পবিত্র মন আল্লাহর স্বভাবধর্ম লাভ করতে থাকে।) (সূরা তওবা, আয়াত : ১০৮)

মনটাই মানুষ।

মনটাই মানুষের ফর্মুলা।

মনটাই মানুষের শক্তির উৎস।

মনটাই মানুষের একমাত্র কাম্যবস্তু।

মনের সকল শক্তির উৎস হলো তার ভারসাম্য।

একমাত্র ভারসাম্যে পৌঁছেই মন নিজেকে জানে এবং অন্ধত্বমুক্ত হয়। ভারসাম্যহীন মন নিজের সাথে শত্রুতা করে।

কিন্তু কী এই ভারসাম্য?

তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতি (ভারসাম্য)। (সূরা, রুম, আয়াত : ২৫)

তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেককে **যথাযথ স্বভাব** এবং **পরিমাপ** দান করেছেন। (ফলে প্রত্যেক প্রাণী/বস্তু নিজ নিজ প্রকৃতি রক্ষা করতে গিয়ে একটা গতিশীল পারস্পরিক ভারসাম্যের পথ বরাবর পরিবর্তিত হতে থাকে, যেখানে লক্ষ্যবিন্দু হলো পরম (Ultimate) ভারসাম্য।)
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য **নির্দিষ্ট মাত্রা** স্থির করেছেন। (এই নির্দিষ্ট মাত্রাই সবকিছুকে ভারসাম্যের দিকে চালিত করে। একমাত্র মানুষই পারে তার মুক্ত-ইচ্ছা দ্বারা সেই ভারসাম্য বিনষ্ট করতে। কিন্তু প্রাণী এবং বস্তু সেই বিশৃঙ্খলার পরও আবার ভারসাম্যে স্থিত হতে চায়। এভাবে সৃষ্ট হয় ধারাবাহিক গতিশীল ভারসাম্যের লক্ষ্যমুখী যাত্রা।)
(সূরা তালাক, আয়াত : ৩)

এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য **সত্য** ও সুবিচারে **পূর্ণাঙ্গ**। কেউই তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী নেই। **তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ**। (আল্লাহর বাক্যই মহাবিশ্বের নিয়ম, তাঁর বাক্যই বস্তুর ধর্ম। এই বাক্য পূর্ণাঙ্গ ব'লে সামগ্রিক নিয়মও পূর্ণাঙ্গ। মানুষ বস্তুতে বিশৃঙ্খলা ঘটালেও এই নিয়মকে পাল্টাতে পারে না। ফলে মানুষের আচরণ তার কাজেই ফেরত আসে।) (সূরা আন'আম, আয়াত : ১১৪-১১৫)

মনের ভারসাম্য হলো সেই অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কাঠামোবিন্যাস যখন মন তার নিজের পরিচয় পেয়ে যায়। এই পরিতুষ্ট মন সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন—

www.pathagar.com

হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও।
(সূরা ফযর, আয়াত : ২৭-২৮)

মন যখন নিজেকে জানে, তখন সে একথাও জানে যে তার দেহ, ভোগ-উপভোগ, আনন্দ-বেদনা ... পারিপার্শ্বিকতা-পরিবেশ—এসবকিছুই তার *অধীন*। তখন সে জেনে ফ্যালে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় তার কাছে দেহের এবং দেহের বাইরের কোন উপাদানের গুরুত্ব বা মূল্য কতটুকু এবং কার সাথে তার সম্পর্ক কী এবং তার প্রকৃতি কেমন।

মন তার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায়ই সন্দেহাতীতভাবে জেনে যায় যে একমাত্র মনের ভারসাম্যের সমতলেই দেহ এবং প্রকৃতিজগৎ নিজ-নিজ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করে। মন যতক্ষণ তার ভারসাম্যের বাইরে অবস্থান করে, ততক্ষণ তার দেহে এবং প্রকিজগতেও ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করে, এবং ততক্ষণ তারা তাদের সব শক্তি দ্বারা মনের ক্ষতি করতে থাকে। কিন্তু ভারসাম্যহীন, অন্ধ মন তা বুঝতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন—ওরা অন্ধ; ওরা দেখতে পায় না। অন্যত্র তিনি বলেছেন—তাদের চোখ দেখতে পেলেও তাদের হৃদয় অন্ধ। অন্যত্র বলেছেন—যে ইহলোকে অন্ধ, পরলোকেও সে অন্ধ (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭২)। প্রকৃতপক্ষে, ভারসাম্যপূর্ণ মন অনেক কিছুই চর্মচক্ষু দ্বারাই দেখতে পায়। একথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য।

ভারসাম্যে অবস্থান ক'রে মন জেনে ফ্যালে যে ভারসাম্যপূর্ণ মন ভারসাম্যহীন মনের চেয়েও বড়। কারণ ভারসাম্যহীনতা হলো মনের জন্য একটা স্ববিরোধিতাপূর্ণ অবস্থা। অন্য কথায়, কেবল ভারসাম্যে পৌঁছেই মন তার অস্তিত্বকে অনুভব করে। তখন মন ঘরে ফিরে আসে।

মনের ভারসাম্যের সাথে মনের কর্মকাণ্ডের ভারসাম্য জড়িত। পবিত্র কোরআনে সরাসরি বলা হয়েছে যে মানুষ যা করে তা তার মনকে প্রভাবিত করে, যা আধুনিক বিজ্ঞান, জেনেটিক্‌স, এবং মনোবিজ্ঞান প্রমাণ সহকারে বলেছে :

অতঃপর ওরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ ওদের হৃদয় বাঁকা ক'রে দিলেন।
(সূরা সাফ, আয়াত : ৫)

মনের ভারসাম্যের সাথে দেহ জড়িত, কারণ দেহ হলো প্রকাশিত বর্তমান বাস্তবতায় মনের ধারক। এজন্য ইসলামী ইবাদতের সাথে দেহ-মন-অর্থ-সম্পদ সবই জড়িত।

দেহের ভারসাম্যের সাথে খাদ্যের ব্যাপার জড়িত। এ কারণে হারাম-হালাল বেছে চলতে হবে। নইলে দেহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে যা তাকে ভারসাম্যপূর্ণ মনকে ধারণ করার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত ক'রে তুলবে।

www.pathagar.com

খাবার নির্বাচনের সাথে প্রকৃতির খাদ্য-শৃঙ্খল, শক্তি-শৃঙ্খল, পানি-শৃঙ্খল, কার্বন-শৃঙ্খল সব জড়িত। যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম, তারা দেহ, মন, এবং দেহ-মনের মিলিতাবস্থার জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি প্রকৃতিতেও কোনো-না-কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য কাজে তারা আবশ্যক। ফলে দেখা যাচ্ছে যে **হারাম-হালালের রীতি হলো ভারসাম্যেরই রীতি। এই রীতি মানতে হবে। নইলে মাইন্ড কন্ট্রোল কখনও সেল্‌ফ কন্ট্রোলের পর্যায়ে উঠে আসবে না।** আমরা ডাক্তারের কথামতো বা 'ফিগার' ঠিক রাখার প্রয়োজনে 'ডায়েট কন্ট্রোল' করতে পারি, অথচ হরাম-হালাল বেছে চলতে হলে আমাদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়ে যায়। এ দোষ আমাদের, হারাম-হালাল ভেদাভেদের নয়। নিয়ম মানতে মন চায় না—এ দোষ নিয়মের নাকি মনের? **সেই নিয়মই মনের কাছে প্রথমত সবচেয়ে জঘন্য কালাকানুন ব'লে মনে হয় যার মধ্যে মনের প্রাণশক্তির রহস্য নিহিত। কারণ মন যতক্ষণ ভারসাম্যে না পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ সে নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভারসাম্যহীন মন তার ভারসাম্যের বিধানকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে।** এ দিয়েই বুঝা যায় কেন উদ্‌ভ্রান্ত প্রগতিশীলরা সবকিছু সহ্য করতে পারলেও আল্লাহর বিধানকে সহ্য করতে পারে না। আর নামাজ যেহেতু আল্লাহর বিধানের মধ্যে সুন্দরতম এবং সবচেয়ে রহস্যময় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান, সেহেতু নামাজ তাদেরকে রীতিমতো বিকর্ষণ করে। শুধু মার্কা-মারা প্রগতিশীলরাই নয়, অনেক বংশ-পরম্পরায় নামে-মাত্র মুসলমান ঘরের তরুণ ছেলে-পুলেরাও এমন আছে যারা নিজেদেরকে মুসলমান ব'লে পরিচয় দেয়, তাতে 'হিন্দু' এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করা যায় ব'লে, এবং মুসলমানদের সুদীর্ঘ উজ্বল অতীত ঐতিহ্যও সম্মানের ভাগীদার হওয়া যায় ব'লে, কিন্তু নামাজের ব্যাপারে তারা পুরোপুরি ক্ষ্যাপা। কেন এমন হয়? কারণ **নামাজের মধ্যে আল্লাহই রয়েছেন। সাধে কি আর তাকে মে'রাজ বলা হয়েছে? কেউ কী পরিমাণে ভ্রান্ত আমিত্বের দ্বারা অন্ধ হয়ে আছে তা মাপা যায় সে নামাজকে কী পরিমাণে ঘৃণা করে তা দিয়ে। নামাজই সবচেয়ে বড় কষ্টিপাথর। এত বড় যে, তা মোনাফেকের মোনাফেকি আরো বাড়িয়ে দেয়।**

> তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করে না, এবং কেবল অনুমান ক'রে থাকে। (এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ লোকের মতই ভ্রান্তিপূর্ণ। বাস্তবেও দেখা যায় তাই। এ হলো কোরআনের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ।)
>
> (সূরা আন'আম, আয়াত : ১১৬)

> ... খারাপ এবং ভালো কখনও সমান নয়, এমনকি যদিও খারাপের আধিক্য তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে ... (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১০০)

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া এবং উদারতায় ভরপুর, তবুও **অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না**। (অধিকাংশ লোকের অকৃতজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে কোরআনের বাণী সত্য।) (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬১)

এখানে আল্লাহ কোরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য 'Proof by the Negative/Opposite' এর অবতারণা করেছেন, এবং তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ব'লে যে **অধিকাংশ লোকের বিভ্রান্তি এবং কোরআন-বিরোধিতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে কোরআন সত্য!** অনেক আয়াতেই এই উপায়ে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ প্রমাণ জ্ঞানের বিশুদ্ধতম শাখা গণিতে *ইনভার্স* ও *ডুয়াল* আকারে এবং যুক্তিবিদ্যাসহ সব উচ্চতর শাখাতেই তত্ত্বকে প্রমাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং প্রথমেই পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে যে কোরআন সত্য। এবং এই আস্থা নিয়ে এগোলেই এবং সঠিক নিয়ম অনুসারে চললেই জয় করা যাবে মনকে, যার তুলনায় জগৎ-জয় একটা তুচ্ছ ঘটনামাত্র।

যদি আমি ওদের কাছে **ফেরেস্তা পাঠাই**, এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলে, এবং সব বস্তুকে তাদের সামনে হাজির করি, তবুও আল্লাহ ইচ্ছা না করলে ওরা বিশ্বাস করবে না। **কিন্তু/তবুও** ওদের **অধিকাংশই** অজ্ঞ। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১১১)

এই আয়াতের **তবুও/কিন্তু**-র ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আল্লাহ এখানে অবিশ্বাসীদেরকেই তাদের মনের **দ্বিতীয় স্তরে** প্রবেশ ক'রে চিন্তা করতে বলছেন। তিনি **প্রথম ধাপে** বলছেন—তোমরা লক্ষ্য কর কী কী ঘটার পরও তোমাদের বিশ্বাস জন্মায় না। এবং তিনি দ্বিতীয় ধাপে বলেছেন—একথা কি সত্য নয় যে জ্বলন্ত অলৌকিক দেখেও তোমাদের বিশ্বাস জন্মায় না? অলৌকিকেও যে তোমাদের মনে দাগ কাটতে পারে না—এই ঘটনা লক্ষ্য ক'রেও কি বুঝতে পার না যে তোমাদের মনে সমস্যা আছে, তাতে ময়লা পড়েছে, এবং তোমরা অবাক হবার যোগ্যতা হারিয়েছ?—যেমন, আল্লাহ বলেছেন, '(হে মুহাম্মদ (সঃ)) তুমি তো অবাক হচ্ছ, আর ওরা করছে ঠাট্টা।' (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১২)—আল্লাহ এই বিস্ময়ের প্রতি ইঙ্গিত ক'রেই বলছেন—তাহলে কোরআনের এই সত্য কথা শুনেও, এবং এর মধ্যে তোমাদের মনস্তত্ত্বের অন্ধকারকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে জেনেও, তোমরা কি তোমাদের সেই অন্ধকারের প্রতি **দ্বিতীয়বারের মতো** একবার তাকিয়ে দেখে নতুন ক'রে ভাববে না কিসে তোমাদেরকে বিশ্বাসের পথে আটকায়? মনস্তাত্ত্বিক বাধা নিয়ে চিন্তা ক'রেও কি **জ্ঞানের দ্বারা** এবং **যুক্তির দ্বারা** তা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে না?—কোরআনে এরূপ প্রশ্নও উস্কে দিয়েছেন আল্লাহ :

আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে আগেই যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে **কে সে তোমাদেরকে বাধা দেয়?**
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ৮)

www.pathagar.com

আল্লাহই মানুষকে প্রশ্ন করছেন, এর মানে এই নয় যে তিনি এর উত্তর জানেন না, বরং এর দ্বারা তিনি মানুষকে এই তাগিদ দিচ্ছেন যে সে যেন নিজের ওপর প্রশ্নটাকে প্রয়োগ করে। আর এই প্রশ্ন কোনো অবিশ্বাসীর তরফ থেকে নিজেকে করা মানেই (লক্ষণীয় যে আয়াতটা **অবিশ্বাসীকে লক্ষ্য ক'রেই অবতীর্ণ হয়েছে**) তাকে নিজের বিরুদ্ধেই দাঁড় করানো, যেন তার মনের অন্ধত্ব ঘুচে যাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয়। আরো কিছু প্রশ্ন দেখা যাক :

> তবে কি ওরা এই বাণীর ব্যাপারে **চিন্তা করে না?** না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? (সূরা মোমেনুন, আয়াত : ৬৮)

> তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ এই ইঙ্গিত করেছেন—তারা যে অজ্ঞ একথা আমি স্পষ্টভাবে বললাম, কিন্তু তার পরেও, ওরা ওদের অজ্ঞতার ব্যাপারে আমার সঠিক মন্তব্যের কথা জানতে পেরেও, বুঝতে পারে না যে ওরা অজ্ঞ। এখানেই রয়েছে তৃতীয় স্তরের চিন্তা—আল্লাহ অবিশ্বাসীকে তার যুক্তির আরো গভীরে খোঁজ করার তাগিদ দিচ্ছেন : আমি বলেছি যে তোমরা জান না যে তোমরা অজ্ঞ—তোমাদে অজ্ঞতা সম্পর্কে তোমাদের এই অজ্ঞতার কথা শোনার পরও কি তোমাদের অজ্ঞতা ঘুচবে না?—প্রশ্নটার গভীরতা এত বেশি যে ইবলিস কারো মনের তৃতীয় স্তর পর্যন্ত দখল করলেও এই প্রশ্নের সাহায্যে সে ইবলিসের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু ইবলিস যার মনের আরো গভীরে প্রবেশ করেছে, তাকে তো আল্লাহ অবকাশ দিয়েছেন।

> ... আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে সেখানে চক্রান্ত করার **অবকাশ** দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২৩)

> যার হৃদয়কে আমি আমাকে অবহেলা করার অনুমতি দিয়েছি, সে অধীনতা স্বীকার করবে না। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮)

তার জন্য নিদেন চিকিৎসা হলো এই যে, সে-যে অবকাশ ভোগ করছে একথা বুঝতে পারার সাথে সাথেই তার উচিত তওবা ক'রে ফিরে আসা। আর সে যদি এটা বুঝতে না পারে যে সে অবকাশ বা ছুটি ভোগ করছে, তাহলে বুঝতে হবে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

১. ক্রোধ

মনের শক্তির সবচেয়ে উচ্চাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে ক্রোধ বা রাগের মাধ্যমে। যুগে যুগে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিযোগিতা গোপন হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে, তার মূলে ছিল

www.pathagar.com

একটাই শক্তি—ক্রোধ; তার উস্কানিদাতা ছিল একটাই—ক্রোধ। যুগে-যুগে যত ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে, তার সবই ক্রোধের ফল।

ক্রোধকে আয়ত্ত করা মানে শত শত অ্যাটম বোমা হজম করার মতো শক্তি এবং দৃঢ়তা অর্জন করা। হযরত আলী (রাঃ) নিজেকে বীর ভাবতেন এজন্য নয় যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করতেন, বরং এজন্য যে তিনি সফলভাবে নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতেন। একবার এক কাফেরকে ভূপাতিত ক'রে তিনি তাকে খুন করতে উদ্ধত হয়েছেন এমন সময়ে কাফের লোকটা তার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করল। আলী (রাঃ) হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন এবং তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন। তাকে কাফেরটাকে ছেড়ে দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে থুথু মারার ঘটনার পর তিনি যদি তাকে হত্যা করতেন, তাহলে সেই হত্যাকে তার নিজের ক্রোধের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং পরকালে তাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হতো।

ক্রোধ এমন এক তরবারি যাকে প্রতিহত করার একমাত্র ঢাল হলো ধৈর্য। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হলো, ক্রোধ এবং ধৈর্য উভয়ের শক্তির একটাই মাত্র উৎস। **ফলে কেউ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে আর সহজে নিজেকে থামাতে পারে না : যে-শক্তি দ্বারা সে ধৈর্যকে মজবুত রাখত, সেই মুহূর্তে তাই ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রোধ দ্বারা, যার ফলে তার ক্রোধ সেই মুহূর্তে পরাক্রমশালী এবং ধৈর্য দুর্বল।**

এখন প্রশ্ন হলো : ক্রোধকে প্রকাশ করলে বিশ্বযুদ্ধও ঘটানো যায়, কিন্তু তাকে চেপে রাখলে কি তা দ্বারা লাভজনক কিছু করা যায়? তা করা না গেলে কী দরকার কষ্ট-সাধনা ক'রে ক্রোধ দমন করার?

আরো একটা প্রশ্ন : **সব সময়ে যদি ক্রোধকে দমনই করতে হলো, তাহলে মানব মনকে ক্রোধই বা কেন দেয়া হয়েছিল?**

প্রশ্ন দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **ক্রোধ কেন দমন করতে হবে, তা দমন করলে কোন কোন ব্যতিক্রমধর্মী এবং অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করা যাবে, তা না জানলে, এবং পুরোপুরি সন্দেহতীভাবে না জানলে, তা দমন করাই সম্ভব নয়।**

রসুলল্লাহ (সঃ) কে একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ), আপনি আমাকে মাত্র এমন একটা উপায় ব'লে দিন যা অবলম্বন করলে আমি বেহেস্তে যেতে পারব। রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন—কখনও রেগে যাবে না।

এতেই বুঝা যাচ্ছে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার সুফল কত বড়। কিন্তু কেন এ কাজের মধ্যে এই সুফল নিহিত? এই 'কেন'র জবাব না জানলে বাস্তবে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, অনেক কৌশল শিখেও।

জবাবটা জানার আগে আরেকবার ভেবে দেখুন ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কতখানি। ভেবে দেখুন ক্রোধের কারণে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে আপনি কতভাবে এবং কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন :

www.pathagar.com

—দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে

—সাংসারিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে

—বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

—ব্যবসায় ক্ষেত্রে

—প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে

—রাজনীতির ক্ষেত্রে

—পেশাগত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে

—শিক্ষার ক্ষেত্রে

—সামাজিক মর্যাদারক্ষার ক্ষেত্রে

—আতিথেয়তার ক্ষেত্রে

—বৈবাহিক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে

—সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মর্যাদা রক্ষায়

—অনাবশ্যক এবং বড় ঝামেলা সৃষ্টিতে

মোট কথা, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার দেহ-মন-অর্থ-মর্যাদার যত ক্ষতি হয়েছে, তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ক্রোধ জড়িত। মানসিক ভারসাম্যের বিবেচনায়, ক্রোধ :

—বিবেককে দুর্বল ক'রে;

—মনের স্থিরতা এবং আত্মসম্মানবোধের মধ্যকার সম্পর্ককে নষ্ট করে;

—সিদ্ধান্তগ্রহণের পেছনে চিন্তার ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়, যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রবণতা এবং সম্ভাবনা বেড়ে যায়;

—স্নেহ-ভালবাসা-অভিমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আক্ষেপের জন্ম দেয়, যখন 'আমাকে রেগে যেতে হলো কেন?' এই আক্ষেপ ক্রোধকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং আরো ধ্বংসাত্মক ক'রে তোলে;

—ধৈর্য, ভালোবাসা, সৌজন্য কমিয়ে দেয়; ইত্যাদি।

শারিরীক দিকগুলোও বিবেচনা করুন। আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগী হতেন, তাহলে কি 'মন খুলে রেগে যাওয়ার শাস্তিটুকু' পেতে পারতেন? ভয় জাগত—পাছে যদি আবার ফ্যাট্ ক'রে হার্টটা ফেটে যায়। কিংবা যদি ফট্ ক'রে একটা স্ট্রোক ক'রে বসেন।

কী কাজে লাগে এই ক্রোধ? **কেন মানব-মনের উপাদানগুলোর মধ্যে এমন একটা উপাদান থাকার প্রয়োজন ছিল যার সামান্য অপব্যবহার বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে? তাহলে কি এটা সৃষ্টির ফর্মুলার ভুলের ফসল নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?**

www.pathagar.com

দেখুন, এই সব প্রশ্নের জবাব পেলে বড় মাপের দার্শনিক হতেও আর বেশি বাকি থাকে না। তবে সবকিছুর পরেও বড় একটা ফাঁকা রয়ে যাবে, কারণ আমরা আসল প্রশ্নটাই এখনও করিনি—ক্রোধ কী? অবশ্য একথাও সত্য যে এই প্রশ্নটার গুরুত্ব এখন যতটা মনে হচ্ছে শুরুতেই একে উপস্থাপিত করলে এর গুরুত্ব এতটা ব'লে মনে হতো না। আমরা বিশুদ্ধ জবাবটাই খুঁজব।

ক্রোধের প্রয়োজন কী?

জবাবটা দেয়ার আগে উপযুক্ত উপমা প্রয়োজন। ধরুন আপনি একজন সৈন্য। আপনার প্রশিক্ষণ চলছে। কিসের প্রশিক্ষণ? যুদ্ধের। কার সাথে যুদ্ধ? শত্রুর সাথে। সুতরাং শত্রুবিহীন প্রশিক্ষণ ব'লে কিছু নেই। প্রশিক্ষণের স্বার্থেই আপনাকে শত্রু খুঁজতে হবে। আপনার সামনে যদি শত্রু না-ও থাকে, তবুও বন্ধুকে বানাতে হবে শত্রু, এবং অভিনয়ের ছলে হলেও যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। অন্য কথায়, প্রথমে যুদ্ধের মহড়া চালাতে হবে নিজেদের মধ্যেই।

আপনাকে যুদ্ধ কেন করতে হয়? কারণ আপনি সর্বদা শত্রুবেষ্টিত। যুদ্ধে যখন নেমেছেন, তখন কি প্রশ্ন করেছেন—শত্রু কেন দেয়া হলো? না। কারণ আপনার যুদ্ধবিদ্যা শত্রু চায়। যুদ্ধবিদ্যা আপনার যোগ্যতা। তা দেখাবার জন্য আপনার শত্রুই দরকার। অন্য কথায়, আপনি শত্রুই চান। কেউ নিজে যা চায় তা নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন করে না।

আপনি কি প্রশ্ন করেন—যুদ্ধ কেন দেয়া হলো? না। কারণ কেউ তার নিজের যোগ্যতার বিপক্ষে প্রশ্ন করে না। এ প্রশ্ন করে জনগণ, যারা বিনা পরিশ্রমে সুখে থাকতে চায়। কোনো সৈন্য এ প্রশ্ন করে না। যুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে শত্রুর উপস্থিতির কারণে। আপনার কাছে আপনার শত্রুর উপস্থিতি আপনাকেও তার বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন ক'রে দেয়। এ কারণে নিজের শত্রুতার ব্যাপারে আপনি কোনো প্রশ্ন করতে চাইবেন না। শত্রুর ব্যাপারেই যখন প্রশ্ন নেই, তখন যুদ্ধের ব্যাপারেই বা প্রশ্ন থাকবে কেন।

ক্রোধ দেয়া হয়েছিল কেন?

ক্রোধকে অতিক্রম করার জন্য!

ক্রোধই আপনার শত্রু।

শত্রুর ব্যাপারে তো আপনি কোনো প্রশ্ন তোলেন না, কারণ আপনি একজন যোদ্ধা। আপনার অস্ত্র হলো ধৈর্য।

আপনাকে ক্রোধ দেয়া হয়েছে ধৈর্য শেখানোর জন্য।

আপনাকে ক্রোধ দেয়া হয়েছিল ক্রোধের কাছে মাথা নত না ক'রে তাকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য।

www.pathagar.com

কই, আপনি তো কখনও প্রশ্ন করেন না—ধৈর্য দেয়া হয়েছে কেন? কারণ ওটা আপনাকে দেয়া হয়নি, ওটা যেন আপনি অর্জন ক'রে নিতে পারেন, আপনাকে কেবল সেই সুযোগ ক'রে দেয়া হয়েছে।

যারা গুরুতর পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রেগে যায় তখন ক্ষমা করে (... তারা পুরস্কৃত হবে) (সূরা শুরা, আয়াত : ৩৭)

আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলাকাম হলো। (সূরা মু'মিমূন, আয়াত : ১১১)

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুক। (কারণ আস্থা রাগকে ধ্বংস করে। রাগের সৃষ্টি ভয় এবং অস্থিরতা থেকে এবং আস্থা এগুলোকে ধ্বংস ক'রে দেয়।) (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ঠ দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে। এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল; এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর স্মরণ নেবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বস্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ্, আয়াত : ৩৪-৩৬)

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা ক'রে দিলে তা বীরত্বের কাজ। (অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারী আল্লাহর কাছে বীর উপাধিপ্রাপ্ত।) (সূরা শুরা, আয়াত : ৪৩)

ওদেরকে দুবার (অর্থাৎ পৃথিবীতে এবং পরকালে) পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল, এবং ওরা ভালো'র দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে, এবং আমি ওদের যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ওরা ব্যয় করে। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত : ৫৪)

কেন প্রশ্ন করছেন না—পর্যাপ্ত ধৈর্য দেয়া হয়নি কেন? তাহলে তো আপনাকে জবাব দেয়া যেত—ধৈর্য দেয়া হলে তা আপনার হিসাব বাড়িয়ে দিত, তার জন্য আপনার হিসাব দিতে হতো। ওটা আপনাকে অর্জন ক'রে নিতে বলা হয়েছে। ক্রোধ আছে ব'লেই সেই সুযোগটা আপনি পাচ্ছেন।

আল্লাহর পথে চলতে পারে একমাত্র যোদ্ধারাই। জেহাদ দুই ধরনের—বাইরের এবং ভেতরের। ভেতরের জেহাদই আসল এবং বেশি কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা যোদ্ধাকে লড়তে হয় নিজের বিরুদ্ধেই। **নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করুন। আল্লাহ আপনার ক্ষত সারিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে যুদ্ধের মাঠ থেকে আলাদা বিশ্রামপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাবেন। নিজেকে ধরাশায়ী করুন। আল্লাহ আপনাকে শত্রুমুক্ত ক'রে দেবেন।** তাঁরই সান্নিধ্যে দেবেন প্রশান্তির বিশ্রামের সুযোগ :

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত বিশ্রামের প্রশান্তি পায়। (সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮)

www.pathagar.com

কিন্তু কখন আসে বিশ্রাম? পর্যাপ্তভাবে ক্লান্ত না হয়ে কি কেউ বিশ্রামের শান্তি পেতে পারে?

কী এই ক্রোধ?

আমরা রেগে যাই প্রধানত নিম্নলিখিত কারণে :

—বিরক্তির কারণে

—মানভয়ে বা সম্মান হারাবার ভয়ে

—প্রাণভয়ে

—অসহিষ্ণুতার কারণে

—পরিবর্তনের ভয়ে

—অপছন্দের কারণে

—সন্দেহ থেকে

আমরা যখন বিরক্ত হই, তখন রেগে যাই। দৈনন্দিন জীবনে বিরক্তিই রাগের একটা প্রধান কারণ। বিরক্ত কেন হই? ক্লান্তিতে বা অপছন্দের কারণে। আমরা যখন কোনো কিছু করতে ক্লান্তবোধ করি কিন্তু তবুও তা করতে বাধ্য হই, তখন এক প্রকারের **ক্লান্তি** এবং **অনিচ্ছা** থেকে আমাদের মধ্যে একজাতীয় আত্মকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি হয়, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়টাকে বিকর্ষণ ক'রে বা দূরে রেখে নিজেকে বিশ্রামপূর্ণ অবস্থায় রাখতে চায়। **এই বিকর্ষণই ক্রোধ**। এরূপ ক্রোধের সাথে নৈতিক অপরাধ জড়িত না-ও থাকতে পারে। কিন্তু ক্রোধ মানেই যেহেতু মনের ভারসাম্যহীনতা বা অস্থিরতা, সেহেতু **ধৈর্যের** অনুশীলন ক'রে এরূপ ক্রোধকে দমন করতে হয়। **ক্রোধ চেপে রাখলে তা মনের দুর্বল মুহূর্তে আরো শক্তিশালী রূপ ধারণ ক'রে আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে ব'লে কোনো ক্রোধ চাপা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের মনকে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে। অনুভব করতে হবে যে ক্রোধকে অতিক্রম করা মানে যুদ্ধে জয় করা এবং স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে জয়ী বীর খেতাব পাওয়া।**

কোনো ঘটনা ঘটলে আমাদের সম্মানহানি হবে এরূপ **আশঙ্কা** থাকলে আমরা সেই ঘটনাকে মনে মনে বিকর্ষণ করি। যেমন, আপনার স্ত্রীর কোনো কথায় আপনার লজ্জা পাবার ভয় থাকলে আপনি তার ওপর রেগে যেতেও পারেন। কোনো ঘটনা ফাঁস হলে আমাদের সম্মানহানি হবে এরূপ আশঙ্কা থাকলে আমরা সেরূপ ঘটনা যে-ব্যক্তি ফাঁস করবে ব'লে **সন্দেহ** করি, তার ওপর রেগে যেতে পারি। এভাবে অনেক লোক খুনও হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সম্মানরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত—আগে থেকে এমনভাবে সাবধান হয়ে চলা উচিত যেন আমরা নিজেরাই মানহানিকর কোনো কাজ না ক'রে ফেলি। কোনোভাবে যদি করেই ফেলি, তাহলে তওবা ক'রে নেয়া উচিত এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়বে এমন ভয় থাকলে তা নিজেই আগে-ভাগে প্রকাশ ক'রে

www.pathagar.com

আকস্মিকতার ধাক্কাটাকে সামাল দেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি, এমন মেকি আত্মসম্মানবোধ মনে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয় যা সর্বদা চুপসে যাবার ভয়ে ভীত।

বড় জাতীয় ক্রোধের জন্ম প্রাণভয় এবং স্বার্থহানির ভয় থেকে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে সামান্য বাধা দিতে গেলে সে প্রথমত আপনার ওপর প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে আহত করার চেষ্টা করতে পারে। তার এই ক্রোধের উৎস তার সাহস নয়, ভয়। সে ধরা পড়ার ভয়ে ভীত। কিন্তু তাকে যদি প্রথম ধাক্কাতেই কিছুটা দমিয়ে দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন সে ক্রুদ্ধ হবার সুযোগই পাবে না; তখন তার ভয় তাকে হতাশ করবে এবং পালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টারত হতে বাধ্য করবে। পবিত্র কোরআনের একটা পরম শিক্ষা হলো—যে-কেউ দুর্ব্যবহার আশা না করলে সে যেন কারো সাথে দুর্ব্যবহার না করে।

> অন্যায় আচরণ ক'র না, তাহলে তোমাদের সাথেও অন্যায় আচরণ করা হবে না।
> (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৯)

এই নীতি অনুসারে চললে জীবনে ঝামেলা খুব কমই আসবে। যে-সব ঝামেলা আসবে তার মোকাবেলা করার শক্তি মন থেকেই পাওয়া যাবে। **নিষ্পাপ মন স্বভাবতই সাহসী হয়।** কেন কোনো ঘটনার প্রতিবাদ করতে হবে—এর ব্যাখ্যা যদি মনকে দেয়া যায়, তাহলে মন স্বভাবত অবিচল এবং সাহসী থাকে। **মৃত্যুভয় সৎ মনের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোপুরি অমূলক। কারণ মৃত্যু নির্ধারিত।** তার সময় না হলে সে কখনও আসবে না। তা পরিবর্তিত হতে পারে কেবল আপনার কাজ এবং প্রার্থনার মাধ্যমে :

> কেয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের ফলাসালা তো হয়েই যেত। (অর্থাৎ ওরা যে অপরাধ করেছে, ওদের ধ্বংসের জন্য তাই-ই যথেষ্ট। তবুও পূর্বঘোষণার সম্মানে ওদেরকে সুযোগ দেয়া হবে। অন্য কথায়, পূর্বঘোষণাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ পাপ করা পর্যন্ত ওদেরকে সুযোগ দেয়া হবে। এই পাপ পর্যন্তই তাদের অবকাশ বা আয়ু—সময়ের মাপে নয়।) (সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ২১)

> বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (অর্থাৎ ওদের কিছু কিছু কর্মফল এখানেই পরিশোধ করার মাধ্যমে আমি ওদের আয়ুকে দীর্ঘায়িত করব। কিন্তু ওদের মোট পাপ করার সুযোগের পরিমাণের একটা সীমা আছে। এই সীমার দ্বারাই ওদের 'বয়স' নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ 'বয়স' আর 'আয়ু' এক কথা নয়। 'আয়ু' নির্ধারিত, কিন্তু 'বয়সের' হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে—কর্মফল অনুসারে এবং মঞ্জুরীকৃত অবকাশের ভিত্তিতে। পরবর্তী আয়াত থেকেই একথা স্পষ্ট।)
> (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

> তোমাদের নিটক শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না।

www.pathagar.com

তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম কেতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, যেন (পরে) কাউকে বলতে না হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টাবিদ্রূপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে—আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (অর্থাৎ 'আয়ু' শেষ হলে পর শাস্তি এসে পড়বে। কিন্তু তার আগে তওবা করলে এবং কোরআনকে আঁকড়ে ধরলে বড় শাস্তি আর আসবে না, আসবে কেবল ছোট শাস্তি, যার বিনিময়ে পাপ ক্ষয় হবে এবং ফলে মোট পাপের পরিমাণ ক'মে যাবে, যার ফলে 'বয়স'কে ভালো কাজ করার জন্য অবকাশ দেয়া হবে, যেন পর্যাপ্ত ভালো কাজ করার মাধ্যমে সব পাপ নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া যায়।) (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৪-৫৭)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (অর্থাৎ কোনো বিষয় লিপিবদ্ধ না হলে তা ঘটেনা। বিপরীতক্রমে, কোনোকিছু ঘটে গেলে বুঝতে হবে যে তা লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তা না-ঘ'টে পারত না। ফলে তা নিয়ে অযথা টেনশন করার বা অহংকার কিছু নেই—বরং সামনে কী ভালো কাজ করা যায় তা নিয়ে ভাবাই উত্তম। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তা লিখিত হয়ে গেলে তা আসবেই। তখন বরং সেই মৃত্যুকে পরকালের কাজে লাগাবার চেষ্টা করাই উত্তম। অপরপক্ষে, ভালো কাজ করতে গিয়ে যতই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তা দ্বারা মৃত্যু ঘটলে সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে, কিংবা তা করার মাধ্যমে পাপ ক'মে গেলে আয়ু বেড়ে যাবে, যেন আরো ভালো কাজ ক'রে বাকি পাপটুকু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।) (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি কি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হবে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? (অর্থাৎ 'আয়ু' নির্ধারিত হলেও জীবনের 'বয়সটা' দীর্ঘ বটে—তাতে আয়ু শেষ হবার আগে বহুবার পর্যাপ্তসংখ্যক সংকেত দেয়া হয়, যেন ব্যক্তি তওবা ক'রে পথে ফিরে এসে অবশিষ্ট আয়ুকে পর্যাপ্তভাবে দীর্ঘ বয়সে রূপান্তরিত করতে পারে। ব্যাপারটা অত্যাধুনিক বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী যন্ত্রের মতো, যা তার সঞ্চিত বিদ্যুৎ-শক্তি শেষ হয়ে আসতে থাকলে বেশ আগে থেকে পর্যাপ্তসংখ্যক হুঁশিয়ারি সংকেত দেয়। এই বিচারে জীবনটা অবশ্যই দীর্ঘ।) (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৭)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—সম্ভবত কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (... সম্ভবত কেয়ামত আসন্ন—অর্থাৎ তার *'সময় দ্বারা পরিমাপিত*

www.pathagar.com

দৈর্ঘ্য' নির্ভর করছে তোমাদের ভালো বা মন্দ কাজের *পরিমাণের* ওপর, যে পরিমাণটা পূর্বনির্ধারিত। রসুলল্লাহ (সঃ)-ও বলেছেন যে আল্লাহ্ ততদিন পর্যন্ত কেয়ামতকে সংঘটিত করবেন না, যতদিন তিনি ইমাম মাহদী (রহঃ)কে মুসলিম জাহানকে একত্রিত করার জন্য প্রকাশ করতে বিলম্ব করবেন। এই হাদীস থেকেও দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ *সময়ের মাপে নয়,* নির্দিষ্ট পরিমাণ *কর্মফলের* মাপে। ফলে কর্মফল দ্বারা এবং প্রার্থনা দ্বারা আয়ুকে বৃদ্ধি করা যায়। তবে তা বাড়ছে কি না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না ক'রে চোখ বুজে ভালো কাজ ক'রে গেলেই তা বেশি বাড়ে বা জীবন থেকে বেশি ফল পাওয়া যায়। মৃত্যু মুসলমানের লক্ষ্য নয়, মুসলমানের লক্ষ্য হলো পরকাল। পরকালের হক সর্বোচ্চ মাত্রায় আদায় করা হলো কি-না সেটাই বিবেচ্য—তাতে মৃত্যু এই মুহূর্তে এলেও।)

(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

... তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিন আছে, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আলোকে বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই পূর্বনির্ধারণকে সময় দ্বারা মাপা হয়নি, একে মাপা হয়েছে পাপ-পুণ্যের সেই সীমা দ্বারা যা সংশ্লিষ্ট যুগের আকাশ-পৃথিবী ধারণ এবং সহ্য করতে পারবে। এই নির্ধারণ অনড়, কিন্তু সময় আপেক্ষিক বিধায় তা (অনুভূতিতে) বাড়তে বা কমতেও পারে (কাজ অনুসারে)।) (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩০)

আমিই ... লিখে রাখি যা ওরা (মানুষ) আগে পাঠায় এবং যা পেছনে রেখে যায়। (অর্থাৎ কোন কর্মফল পরকালে বা আগামীতে সুফল/কুফল দেবে ব'লে তা পরকালে/ভবিষ্যতে পৌঁছে গেল আর কোন কর্মফল ব্যক্তি পৃথিবীতে ভোগ করল/সহ্য করল। কেউ ভালো বা খারাপ কাজ করলে এবং তার সুফল/কুফল এখানে ভোগ না করলে তা তার জন্য পরকালে পৌঁছে যাবে। অন্যথায় তা তার জন্য এখানেই রয়ে যাবে। অর্থাৎ কর্মফলই ভবিষ্যৎকে রচনা করে। ফলে ভালো কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। বরং মৃত্যুর কথা স্মরণ করা উচিত তখনই যখন মনে কোনো মন্দ কাজ করার ইচ্ছা জাগে।) (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১২)

যদি কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে এরূপ লোকেরা (নিজেদের এবং অপরের) ক্ষতি ক'রে থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আদেশ আল্লাহর। (সূরা রা'দ, আয়াত : ৩১)

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সীমাটাই গুরুত্বপূর্ণ—এই সীমার ব্যাপারেই তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর প্রতিজ্ঞার কোনো নড়চড় হয় না। তাঁর এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর বিধান। কোরআনই এই প্রতিজ্ঞার স্পষ্ট প্রকাশ। তাঁর এই সীমা হলো মানুষের কর্মের সীমা, কোনো 'সময় দ্বারা পরিমাপিত সীমা' নয়।)

(সূরা শুরা, আয়াত : ৪০)

পূর্ব ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। (সূরা রুম, আয়াত : ৪)

www.pathagar.com

ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করেছিল, তখন তার ভাগ্য নির্ণয় কর হলো, ফলত সে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস তাকে গিলে ফেলল, তখন সে ধিক্কারযোগ্য। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে মাছের পেটে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো। (একজন নবীর (আঃ) ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধানের কঠোরতা শিথিলযোগ্য নয়। আল্লাহর নাম জপ ক'রে তিনি তাঁর পাপকে না কমালে, তাঁকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে না ব'লে, ইহকালে তাঁর 'সময়-দ্বারা-পরিমাপিত' যন্ত্রণাময় জীবন বাড়িয়ে দেয়া হতো। এখান থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে আমাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তাঁর পূর্বনির্ধারণকে ঠিক রেখেও আমাদের জীবনের সময়কাল বাড়িয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আগু-পিছু হয় আমাদেরই কর্ম অনুসারে, কিন্তু তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নয়।)

(সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (অর্থাৎ ধৈর্যের মূল্য এত বেশি যে তা অপরের দ্বারা আরোপিত আপাত-ক্ষতিকে সুফলে রূপান্তরিত ক'রে দিতে পারে।)

(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

... আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি; কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া চক্রান্ত করে না। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২৩)

কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জনেন। তিনি ... জানেন যা জরায়ুতে আছে; কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (সূরা লোকমান, আয়াত : ৩৪)

সুতরাং যা নির্ধারিত তা নিয়ে অযথা আকাস্মিকভাবে ভীত হয়ে সেই ভয় দ্বারা ক্রোধোন্মত্তের মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কোনোকিছু ঘটতে পারে—এই সন্দেহ অত্যন্ত খারাপ। কোরআনে স্পষ্টভাবে এরূপ সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনে এও বলা হয়েছে যে সন্দেহ একটা বড় পাপ। প্রতিদিন সকালে নামাজ পড়ার পর এ বিষয়ে ধ্যান করার অভ্যাস থাকলে অমূলক ভয় থেকে মনকে দৃঢ়ভাবে দূরে রাখা যায়। এমন ঘটনাও শোনা যায় যে ভূমিকম্পের ভয়ে অনেকে বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মৃত্যুবরণ করেছে! কী লাভ হলো ভয় পেয়ে! বরং এরূপ মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সামিল হয়ে যেতে পারে। অনেককে দেখা যায় পাশে বোমার শব্দ শুনে কোনোরূপ চিন্তা না ক'রেই নিজের স্ত্রীকে বা সন্তানকে ফেলে রেখেই দৌড় দেয়। এরূপ কাপুরুষতা একটা অভিশাপ। রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ কাপুরুষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। আপনিও করুন।

www.pathagar.com

আমরা অসহিষ্ণুতার কারণেও রেগে যাই। সহনশীলতার অভাব দেখা দেয় কখন? ক্লান্তি থেকে, হৃদয়ের টান বা আত্মীয়তাবোধের অভাব থেকে, বিরক্তি থেকে, অপছন্দ থেকে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা অসহিষ্ণু হবার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্রতা দ্বারা পীড়িত হচ্ছি। বিচ্ছিন্নতাবাদ আসে স্বার্থপরতা থেকে। স্বার্থপরতা আসে লোভ-লালসা থেকে। লোভ মানে কিন্তু দোজখের আগুন। এ আগুনের কারণে কেউ পরকালে দোজখে যাবে এমন ভাবারও দরকার নেই—সে দোজখেই আছে। লোভই লোভের শাস্তি। লোভ মানেই নফ্‌স বা রিপুর পরাধীনতা। লোভী লোভ না ক'রে পারে না। স্বভাবের এরূপ কোনো obsession বা compulsion বা আবশ্যিকতাই তো পরাধীনতা। এটা কি দোজখ নয়? সুখ কি কতকগুলো দ্রব্যের সমষ্টি? ভোগের আধিক্য? নাকি উপভোগের প্রশান্তি? উপভোগই সুখ। উপভোগ কিন্তু ভোগের চেয়ে ত্যাগেই বেশি নিহিত। এক কবি বলেছিলেন :

একদা আমার ক্ষুধা পেল,
আমি অপেক্ষা করলাম;
আমার আরো ক্ষুধা পেল;
অতপর আমি আমার ক্ষুধাকে খেয়ে
ক্ষুধা মিটালাম।
একদা আমার তৃষ্ণা পেল,
এবং আমি অপেক্ষা করলাম;
এবং আমার আরো তৃষ্ণা পেল;
এবং আমি আমার তৃষ্ণাকে পান ক'রেই
মিটালাম তৃষ্ণা।

কত সুন্দর কথা। আল্লাহর কসম, ত্যাগের শান্তি যখন এই পর্যায়ে চ'লে যায়, তখন শুরু হয় প্রকৃত উপভোগ। তখন বুঝতে পারা যায় আল্লাহর নেয়ামত আসলে কোনটা—ক্ষুধা, নাকি খাদ্য। তখন তৃপ্ত মন ব'লে ওঠে—**হে প্রভু, রিযিকদাতা, প্রশংসা তোমারই—শুধু এজন্যে নয় যে তুমি খাদ্য দিয়েছ, বরং এজন্যে যে তুমি ক্ষুধা দিয়েছ; এজন্যে নয় যে তুমি শীতল পানীয় দিয়েছ, বরং প্রধানত এজন্যে যে তুমি তৃষ্ণা দিয়েছ।** কোরআন এবং হাদীসে বলা হয়েছে যে হাশরের মাঠে আল্লাহভক্ত মানব-মানবীগণ জেগে উঠবেন প্রচণ্ড ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। আর সে কারণেই তারা আল্লাহর নেয়ামতে তৃপ্তি পাবেন বেশি। মনে রাখতে হবে যে ইহকালে যেমন সবাই আল্লাহকে সমানভাবে পায় না, তেমনি পাবে না পরকালেও। সেখানে মানুষের শ্রেণীভেদ থাকবে এখানকার চেয়ে আরো বেশি :

www.pathagar.com

আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা তা কমিয়ে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী (অর্থাৎ তিনি জেনেশুনেই তা করেন।)

(সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬২)

লক্ষ্য কর কিভাবে আমি ওদের একদলকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি; **পরকাল নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।** (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ২১)

ইহকালে ত্যাগ করার যে মূল্য কত তা হাশরের মাঠে মানুষ বুঝতে পারবে তখন যখন তারা দেখবে যে তাদের যে-সব দোয়া কবুল হয়নি সেগুলোর বিনিময়ে তারা পেয়েছে অঢেল। তখন তারা আফসোস করবে—আহ! যদি পৃথিবীর জীবনে একটা দোয়াও কবুল না হতো!

এভাবে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে কারো জন্য সামান্য কিছুটা কষ্ট করা বা জ্বালাতন সহ্য করার সময়ে অসহিষ্ণু হওয়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

পরিবর্তনের ধাক্কা মানুষকে যেমন উদভ্রান্ত ক'রে দেয়, তেমনি পরিবর্তনের ভয়ও মানুষকে জড়সদৃশ ক'রে দেয়। প্রত্যেকেই নিজের মতো 'নির্ঝঞ্ঝাট' জীবন-যাপন করতে চায়, যার-যার 'উচ্চ বাঁশের মাঁচায়' 'ছাই মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত' খেতে চায়, নিরিবিলি থাকতে চায়। ফলে তারা কোনো আকস্মিক পরিবর্তন, কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা, ভিন্নধর্মী বা সেবামূলক তৎপরতা ইত্যাদি থেকে 'নিজেকে নিয়ে' দূরে থাকতে চায়। মনের এই জড়তা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ক'রে দেয়। এরূপ আত্মকেন্দ্রিক মন পরিবর্তনের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে এবং বিরক্ত হয়। ফলে সে নিজের সুখও হারায়, অপরের প্রতি নিজের কর্তব্যবোধ থেকেও বেমালুম দূরে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রতিও মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলত সে নিজের শান্তিই হারায়। আসল কথা হলো কোনো কিছুতেই সহজে অস্থির না হওয়া। কোরআনেই বলা হয়েছে যে মানুষ স্বাভাবশতই অস্থির।

মানুষ জন্মগতভাবেই অস্থির ... । (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৭)

আদম (আঃ) সৃষ্ট হবার পর-পরই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সাধনার উদ্দেশ্যই হলো সব অস্থিরতাকে অতিক্রম করা।

২. পছন্দ-অপছন্দ

পছন্দ অপছন্দ সবারই থাকে। কিন্তু একটা ভারসাম্যপূর্ণ মনের কাছে শরীয়তপরিপন্থী বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই অপছন্দনীয় নয়। অপছন্দ হলো মানব-মনের অশান্তির সবচেয়ে বড় কারণ—সবচেয়ে বড়। কেউ তার ভাগ্যের কোনো দানকে অপছন্দ করলে তা হয় মনের গভীরে খোদাদ্রোহীতার নামান্তর। একথা আত্মসচেতনতায় রাখতে হবে যে

www.pathagar.com

আমার জীবনের প্রত্যেকটা প্রাপ্তিই এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। হয় তা আমার কর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত পাওনা, না-হয় আমার জন্য এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক। ব্যাপারটা যাই হোক, আমার যা প্রাপ্য আমি তাই-ই তো পেয়েছি।

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সুতরাং কর্মফলকে মাথা পেতে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।) (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (সুতরাং শাস্তির প্রয়োজন আছে বৈকি—আমাদের মঙ্গলের জন্য।
(সূরা দোখান, আয়াত : ১৫)

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে। (অর্থাৎ আমি যা চাই তা পাওয়া আমার জন্য সঠিকভাবে মঙ্গলজনক না-ও হতে পারে।)
(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

আল্লাহ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন। (সুতরাং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।) (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সুতরাং বুঝতে হবে যে আমার মঙ্গলের জন্য তিনি জেনে শুনেই আমাকে বিপদ দিচ্ছেন।) (সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর উপাসনা করে দ্বিধায় সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাঁকেই মনটা সঁপে দিতে হবে। তিনি যেভাবে রাখছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাহলেই একদিন চোখের সামনে সব রহস্য খুলে যাবে।) (সূরা হজ্ব, আয়াত : ১১)

তাহলে তা আবার আমি মেনে নিচ্ছি না কেন? স্ত্রীর ব্যবহার খারাপ? তাহলে তা এটাই তো প্রমাণ করে তাকে ভালো বানানোর দায়িত্বই আমার। হয়তো এর মাধ্যমেই আমার কোনো পাপ ক্ষয় হবে কিংবা এরই বিনিময়ে আমি এমন কিছু পাব যা আমার দরকার ইহকালে এবং/বা পরকালে। অর্থকষ্ট? তাহলে কি আমি ভাবতে চাচ্ছি যে আমার

www.pathagar.com

মতো লোকের অর্থকষ্ট থাকা উচিত ছিল না? স্বয়ং রসুল (সঃ) বলেছিলেন—দারিদ্র্যই আমার গর্ব। পার্শ্ববর্তী লোকটা আমার চেয়ে কম মর্যাদাবান লোক হওয়া সত্ত্বেও আমার চেয়ে বেশি ধনী? তাতে আমার ক্ষতিটা কোথায়? আমার যা বেশি আছে তার তো সেটাই কম আছে—এও কি যথেষ্ট নয়? তাছাড়া আমাকে কি হিংসা করতে বলা হয়েছে? অন্যের টাকা দেখে তাকে হিংসা করে তো কমুনিস্টরা। ওদের মন চিরকালই ছোট ছিল। ওরা তো আসলে সাম্যের কথা বলে না, বলে অপরের রোজগার করা অর্থে নিজে বিনা-শ্রমে মতবাদের বিনিময়ে ভাগ বসানোর কথা। তাছাড়া আমার চেয়েও তো অভাবী লোক আছে। তাদের দৃষ্টিতে আমিও তো ধনী—ব্যাপারটা তাদেরকে বুঝানো যাক বা না যাক। তারাও তো আমাকে হিংসা করবে। আমি কি আসলে সচ্ছল হতে চাই নাকি 'পাশের বাড়ির লোকটার চেয়েও ধনী' হতে চাই?

বল—আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ জানে না। (জানলে তারা বুঝত যে তাদেরকে যাকিছু দেয়া হয়েছে তাই-ই তাদের বর্তমান মুহূর্তের জন্য মঙ্গলকর।) (সূরা সা-বা, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ জীবিকার ব্যাপারে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তাহলে কি ওরা আল্লাহরই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে? (সবাই এই ব্যাপারে সাবধান হয়ে চললে প্রত্যেকেই যার যার যার পাওনা পেয়ে যেত—কেউ বঞ্চিত হতো না।) (সূরা নহল, আয়াত : ৭১)

আমিই ওদের পর্থিব জীবনে ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি, এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যেন (তারা) একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে ...
(সূরা যুখরোফ, আয়াত : ৩২)

আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ দিয়ে থাকেন। (সুতরাং তাঁর এই ইচ্ছা অবশ্যই সুবিচারপূর্ণ।) (সূরা শুরা, আয়াত : ২৭)

আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমারা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২০)

আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই সফলাকাম হলো। (সূরা মু'মিমূন, আয়াত : ১১১)

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুক। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১১)

স্বামীর কেনা শাড়িটাই আমার পছন্দ হতে চায় না। কেন? আমাকে মার্কেটে সাথে নিয়ে কেনা হয়নি বলেই কি এই অপছন্দ? তাহলে তা আমি তাকে মিষ্টভাবে কিংবা অন্য কোনোভাবে চালাকি ক'রে হাসিমুখে বলছি না কেন? আমি কি ভেবে দেখছি যে আমার

www.pathagar.com

সামান্য অভিমানের গাল-ফোলানোতে তার কী কষ্ট হচ্ছে? তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ নষ্ট হচ্ছে কিংবা মনটা খারাপ যাচ্ছে? স্ত্রী খালিই গোস্যা করে—অত বাড়াবাড়ি আর ভালো লাগে না—এই সমস্যা? তাহলে একথাটা স্বামী হয়ে কেন বুঝতে চাচ্ছি না যে তাকে একটু তোয়াজ করলেই সে একটু খুশি হবার সুযোগ পাবে? ইদানিং এও দেখা যায় যে ধর্মের নামে মাথায় টুপি সেঁটে দেয়া লোকেরা নারীর বায়না-ধরাকেও খারাপ চোখে দ্যাখে। তারা কেন বোঝে না যে সৃষ্টির ফর্মুলাটাই এমন যে নারীরা শিশুর মতো একটু বায়না ধরবেই? সে তা করে শুধু এটুকু জানার জন্য যে তার স্বামীর কাছে সংসারের আর দশ জনের তুলনায় তার গুরুত্ব কতখানি। তাকে একটু প্রশংসা তো করতেই হবে। স্বয়ং রসুলল্লাহ (সঃ) একদিন তাঁর নয়জন স্ত্রীর প্রত্যেককে একটা ক'রে খেঁজুর দিয়ে বলেছিলেন—কাউকে বলো না যে তোমাকে আমি খেঁজুরটা দিয়েছি। তিনি নারীমনের রহস্য জানতেন। অথচ আজকালকার হুজুর-গোছের অনেক লোকই নারীর মেয়েলিপনাকেও বরদাস্ত করতে চায় না। তাহলে তারা কি পুরুষালি স্বভাবের নারী চেয়েছিল নাকি? মেয়েকেই তো মেয়েলিপনা মানায়, নয় কি?

মোট কথা কোনো স্বাভাবিক ক্ষেত্রে কারো অপছন্দই প্রমাণ করে যে তা পছন্দ করার যোগ্যতা তার নেই। এর খেসারত তাকে দিতে হয় আফসোস ছটফটানির মাধ্যমে। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন—সুখী হবার যোগ্যতা সবার নেই। আমি মুড়ি খাই, আপনি খান না। কোনো শারিরীক সমস্যা থাকলে তো তা ভিন্ন কথা। নইলে আমি বলব যে মুড়ির মতো একটা সাধারণ জিনিস খেয়েও খুশি হবার ক্ষমতা আমার আছে, আপনার নেই।

যার আনন্দের পেছনে যত বড় শর্ত থাকে, সে জীবনে তত কমই আনন্দিত হয়। শর্ত থাকে শিশুর, কোনো পরিপক্ক মনের মানব-মানবীর নয়। **আপনার পছন্দকে আপনি শর্তাধীন করবেন তো আপনার সুখও শর্তাধীন হয়ে যাবে। একেক দিনে আপনার একেক ধরনের ক্ষুধা জাগলে আপনাকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের অনাহারে থাকতে হবে। আপনি যা চাবেন তাই পাবেন—একথা ঠিক নয়, বরং একথাই ঠিক যে আপনি যা চাবেন তা অনুসারে আপনার না-পাওয়ার ওজন নির্ধারিত হবে। অত্যধিক উচ্চাকাঙ্খা অত্যধিক কষ্টের কারণ।** না, সেই **উচ্চাকাঙ্খাই একটা কষ্ট। সে-ই স্বাধীন যার কোনো আকাঙ্খা তার সুখের অনুভূতিকে শর্তাধীন ক'রে দেয় না।** অত্যধিক বৈচিত্র্যকামনাও একটা রোগ। আজ এটা ভালো লাগে, কাল ওঠা। এমনকি সপ্তাহে কমপক্ষে চার রকমের রান্না না হলেও আপনার ভালো লাগে না। ভেবে দেখা উচিত যে অত্যধিক বৈচিত্র্যকামী লোকদের স্ত্রীরাও যদি অত্যধিক বৈচিত্র্য চেয়ে বসে, তাহলে কী হবে? আমরা প্রত্যেকেই শুধু চাই, দিতে চাই না।

এখন আপনার চারপাশে কিছু শিশু খেলা করছে—আপনি তা পছন্দ করছেন না। তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন—এই বিষয়টা পছন্দ করার মতো যোগ্যতা কি আমার

www.pathagar.com

আছে? নিজেকে প্রশ্ন করতে শিখলে অনেক রহস্যই বের হয়ে আসে। তাতেই অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অথচ আমরা শুধু প্রশ্ন করতে শিখেছি অন্যদেরকে। এ কারণে অধিকাংশ প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়েই আমাদেরকে মরতে হয়।

অপছন্দের একটা বড় কারণ হলো এক ধরনের বাতিক। কিছু নারী এবং পুরুষ আছে যারা কিছু কিছু স্বাভাবিক কাজ কখনই পছন্দ করতে পারে না। এ একটা রোগ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি কারণ থাকতে পারে যে আমাকে চিরকালই বিশেষ কিছু স্বভাব বা অভ্যাসের হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে? যদি কোনো কারণ থেকেও থাকে, তাহলে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে এখন কারণটা যেহেতু জানা হয়ে গেল, এখন তা থেকে মুক্ত হতে হবে?

ক্রোধের আরেকটা উৎস হলো সন্দেহ। এ সম্বন্ধে আমরা আগেও বলেছি যে সন্দেহ একটা রোগ এবং দুর্বলতা—এবং তা অনেক ক্ষেত্রে মহাপাপও বটে। আপনার অবর্তমানে আপনার স্ত্রী অন্য কারো সাথে গল্প করে কি না তা আপনাকে আগে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। নইলে আপনি বৃথাই সে ব্যাপারে ঘুম হারাম করবেন।

> যারা সতী রমণীর ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে, এবার তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না—এরাই সত্যত্যাগী। ... এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক'রে বলবে যে, সে সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর অভিশাপ। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ ক'রে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামী মিথ্যাবাদী, এবং পঞ্চমবার বলে—তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর ক্রোধ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হলে (তোমাদের কেউই রক্ষা পেতে না।) (সূরা নূর, আয়াত : ৪-১০)

> হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনা (অনুমান) থেকে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা (অনুমান) পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান ক'র না; এবং একে-অপরের নিন্দা ক'রো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চায়? (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১২)

> যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কর না, বরং এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এই কথা (অর্থাৎ রসুল (সঃ) এর এক স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ) শুনবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন

www.pathagar.com

নিজেদের বিষয়ে সৎ-ধারণা করেনি এবং বলেনি এতো নির্জলা অপবাদ। তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। (সূরা নূর, আয়াত : ১১-১২)

আপনার কাজের মেয়েটা চুরি ক'রে চিনি খায় কিনা এ নিয়ে আপনি কত ভাববেন? একদিন তাকে তার আশা মিটিয়ে খাইয়ে দিন না চিনি। এমনও তো হতে পারে যে সে ভাবছে—চিনি খাব, কেউ দেখে ফেলবে কিনা—যার ফলে তার কোনোদিন চিনি চুরি ক'রে চিনি খাওয়া হচ্ছে না, এবং আপনিও তাকে কোনোদিন ধরতে পারছেন না ব'লে আপনার সন্দেহও কোনোদিন যাচ্ছে না। তাহলে তাকে এমনভাবে কিছু চিনি খাওয়ার সুযোগ দিন যখন তারও না থাকবে ভয়ের কোনো কারণ আর আপনাকেও সন্দেহের ঘুনপোকারা কুরে কুরে খাবে না।

৩. আফসোস

ক্রোধের পরে মানব মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আফসোস বা আক্ষেপ—ধেৎ, জীবনটা নষ্ট হয়েই গেল। এই বাজে মহিলাকে/লোকটাকে যদি বিয়ে না করতাম! দেখুন, আপনি এমন একটা 'যদি'র কাছে নিজের সুখকে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন যা এখন আপনার নাগালের বাইরে। এখন যাতে কাজ হয় তাই করুন, তবে মনে রাখা উচিত যে আফসোসে কোনোদিন কারো কোনো কাজ হয়নি। আফসোস হলো আল্লাহকে পাবার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। আফসোফ মানে অকৃতজ্ঞতা এবং বিদ্রোহ। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর কেউ না হোক, আফসোসকারীরা তাই-ই। কেন আফসোস? কিসের আফসোস? নিচের আয়াতগুলোর মর্ম বুঝলে আর কোনো আফসোস থাকতে পারে না।

আল্লাহ সকলের খোঁজ-খবর রাখেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।
(সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

www.pathagar.com

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং **ওদের কৃতকর্মের ফলে** ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে **যার জন্য ইচ্ছা** জীবিকা বর্ধিত করেন, এবং **যার জন্য ইচ্ছা** তা কমিয়ে দেন। আল্লাহ **সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী** (অর্থাৎ তিনি জেনেশুনেই তা করেন।)
(সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬২)

আফসোস মানে হয় নিজের কর্মফলের ভার নিজের ভালো লাগেনি ব'লে অন্যের ওপর চাপাতে চাওয়া, না হয় নিজের পাপের খেসারত নিজে না দিতে চাওয়া, না হয় কর্তব্যপালনে অনীহা প্রকাশ করা, না হয় অযথা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থেকে নিজেকেই অস্বীকার করা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন—যে আমাকে অস্বীকার করে সে নিজেকে অস্বীকার করে। তাহলে যে সরাসরি নিজেকে অর্থাৎ নিজের কর্মফলকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই আল্লাহর বিধানকে তথা আল্লাহকে অস্বীকার করে। কোরআনে বলা হয়েছে যে আমরা শুধু মুখে আল্লাহকে বিশ্বাস করি, একথাতে আল্লাহ খুশি নন :

মানুষ কি মনে করে যে, শুধু আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? নিশ্চয়ই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ ক'রে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩)

যাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই তাদের প্রার্থনা হলো মনের নিরর্থক অস্থিরতা।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ১৪)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তার মনে যা আসে তার পরিণাম চিন্তা না ক'রে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।
(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ১১)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর উপাসনা করে দ্বিধায় সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ১১)

মানুষের প্রতি দয়া দেখালে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। বল [হে মুহাম্মদ (সাঃ)]–তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরাআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং এ তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত আছ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী বিশ্বজগতে প্রকাশ করব এবং (প্রকাশ করব) ওদের নিজেদের (মনোজগতের) মধ্যেও, ফলে ওদের

www.pathagar.com

কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই (কোরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সব বিষয়ে জ্ঞাত? জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে : জেনে রাখ, আল্লাহ্ সব কিছুকে ঘিরে আছেন।

(সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ্, আয়াত : ৫১-৫৪)

এই পার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

যে ব্যক্তি আফসোসহীন নয়, তার নামাজ নির্মল হতেই পারে না। তাকে নামাজের মধ্যে হাবিজাবি চিন্তা করতে করতেই বার্ধক্যের দিকে ছুটতে হবে।

৪. হতাশা

হতাশা মনের—এবং এমনকি দেহেরও—মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এর উৎস হলো উচ্চাকাঙ্খা, অনাস্থা, অকারণ ভবিষ্যৎ-মুখী দুশ্চিন্তা, অলসতা, নাস্তিকতা, ত্বরিৎ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করা, ভাগ্যে অবিশ্বাস, পরমুখাপেক্ষিতা, মানসিক অনমনীয়তা, মেকি আত্মসম্মানবোধ, নিজের পাপের ফল। আল্লাহর ওপর আস্থা এবং নিয়তিকে মেনে নেয়ার মতো ভদ্রতা ও উদারতা এবং সৎ-সাহস এবং যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ—এগুলো থাকলেই হতাশা থেকে চিরতরে মুক্ত থাকা যায়। মনে রাখা দরকার যে বিপদাপদ সাময়িক। তাতে হতাশ হলে বরং তা বেড়েই যায়, আপনার ভারসাম্য বিন্দু থেকেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার মতো আধ-মরাকে 'ঘা-মেরে বাঁচানোর' জন্য ছুটে আসে।

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা **সংঘটিত করার আগেই** তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। **এ জন্য যে**, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য **দুঃখিত হয়ো না**, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য **হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীকে** ভালোবাসেন না। (আমাদের কৃতকর্মের ফলে যা ঘটবে ব'লে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে না। হঠাৎ ক'রে আন্দাজে কিছুই ঘটানো হয় না।)

(সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন ওরা ওতে আনন্দিত হয়। এবং ওদের **কৃতকর্মের ফলে** ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (সূরা রুম, আয়াত : ৩৬)

আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (সুতরাং শাস্তিতে আমাদেরই মঙ্গল।) (সূরা দোখান, আয়াত : ১৫)

www.pathagar.com

ভারসাম্য বিন্দুর নিয়ম হলো—এই লোকের কর্মফল এটা বা তার জন্য নিয়তিতে এটাই নির্দিষ্ট; সুতরাং সে এ সাহসের সাথে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে তা আরো দিতে থাকতে হবে, যেন সে আঘাতে আঘাতে সাহসী হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য হলো আপনাকে উপযুক্ত করা। বিধানটা আপনার মঙ্গলের জন্য। **আল্লাহর পরীক্ষা মানেই তাঁর তরফ থেকে প্রশিক্ষণ। তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিলে এবং তার উপযুক্ত শিক্ষাটুকু গ্রহণ করলে তিনি পরীক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কারণে তা তুলে নেন।** এসব ব্যাপারে আগে অনেক বলেছি। সুতরাং এখন এ নিয়ে আর কিছু বলার আবশ্যকতাও নেই।

তুমি [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] বল **যারা নিজ জীবনের প্রতি জুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।** আল্লাহর সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন; তিনি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

৫. কৃপণতা

কৃপণতা একটা জঘন্য অপরাধ। সীমাহীন কৃপণ কখনও মুসলমান হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর বানী শুনুন :

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। **আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে তা থেকে ব্যয় কর–মৃত্যু আসার আগে, নইলে মৃত্যু আসলে সে বলবে–হে প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য সময় দিলে আমি দান করতাম,** এবং সৎশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে সময় দেন না। (সূরা মোনাফেকুন, আয়াত : ৯-১১)

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে, এবং যে অভাবগ্রস্ত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা অপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ অভাবের পর সচ্ছলতা দান ক'রে থাকেন। (সূরা তালাক, আয়াত : ৭)

আল্লাহ জীবিকার ব্যাপারে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তাহলে কি ওরা আল্লাহরই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে? (সূরা নহল, আয়াত : ৭১)

www.pathagar.com

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে, তাদেরকে বহুগুণ বেশি দেয়া হবে, এবং তাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৮)

তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক প্রশংসা ও ধনজনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়; এর উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আছে। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।
(সূরা হাদীদ, আয়াত : ২০)

পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান তো নিঃশেষিত হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং ওরা অন্ধ। (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৬৬)

যে-ব্যক্তি কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম।
(সূরা হাশর, আয়াত : ৯)

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে; তাহলে তিনি তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং তার জন্য মহাপুরস্কার আছে। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ১১)

এই পার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

তারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তাদের আত্মাকে বিক্রি ক'রে দিয়েছে।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৯০)

৬. ভয়

এ ব্যাপারে আগেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ করা হয়েছে। সুতরাং এখন শুধু আল্লাহভীতির প্রসঙ্গে কিছু আয়াত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে।

আল্লাহভীতির সাথে উন্নতি জড়িত। (সূরা মাঈদা, আয়াত : ১০০)

যারা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম। (সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।
(সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ ক'রে দেন।
(সূরা তালাক, আয়াত : ৪)

www.pathagar.com

৭. যৌবনের বাসনা

বয়ঃসন্ধির লগ্ন থেকে আমৃত্যু সুস্বাস্থ্যবান থাকা অবস্থায় একজন পুরুষকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে এবং কষ্ট দেয় তার যৌবন। ঠিক তা নয়, **মানুষকে কষ্ট দেয় যৌবন সম্বন্ধে তার ভুল ধারণা**। যৌবন জীবনকে সমৃদ্ধ, সমধুর, এবং বিকশিত করার এবং পৃথিবীতে জীবনের ধারাকে অব্যাবহতভাবে সচল রাখার জন্য।

তোমরা কি তোমাদের **বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ?** তা থেকে কি **তোমরা সৃষ্টি কর**, না কি **আমি সৃষ্টি করি?** আমি তোমাদের মৃত্যুকালে স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই। ... তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা অংকুরিত কর, না আমি তা করি? (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৬৪)

বল–আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল–আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং গবাদিপশুর (মধ্য থেকে তাদের) জোড়া—এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন।
(সূরা শুরা, আয়াত : ১১)

তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরিক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে-কারণে **সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে?**—বল, আল্লাহই সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ, আয়াত : ১৬)

তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশাবলীর মধ্যে আর একটা হলো; তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের মধ্যে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং অনুকম্পা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের মধ্যে এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রুম, আয়াত : ২১)

সুতরাং যৌবনে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা নেই যৌনবাসনাতেও। যত সমস্যা যৌনবাসনার ব্যাপারে মানুষের ভুল ধারণার কারণে। মানুষের সৃষ্টির ফর্মুলার সাথেই যৌবন জড়িত। সৃষ্টির সাথে জড়িত অনাসৃষ্টি। এ কারণে মানুষ বুঝতেই পারে না যে তার যৌবন, যা তার মধ্যকার সব সৃজনশীল তাড়নার মূল, তার স্বভাবজাত আবশ্যিক তাড়নার মধ্য দিয়েই তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে।

যৌবনকে গতানুগতিক এবং 'স্বাভাবিক' অর্থে গ্রহণ করলে তা থেকে জীবনের প্রাপ্যটুকু আদায় ক'রে নেয়া কখনও সম্ভব হয় না। এ কারণেই শতকরা প্রায় একশ' ভাগ লোকই তৃপ্তচিত্তে যৌবনের দান গ্রহণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশাবলীর মধ্যে আর একটা হলো; তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের মধ্যে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং অনুকম্পা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের মধ্যে এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রুম, আয়াত : ২১)

হে মানুষ! আমি **তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে**, পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, **যেন** তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

যৌবন কোনো সাদামাটা, সাধারণ জিনিস নয়। তা পুরোপুরি অসাধারণ। এ কারণে তাকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। নইলে তা চিরকালই একটা মায়া হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাবে, এবং ব্যক্তিও তার পেছনে উন্মাদের মতো আমৃত্যু ছুটতে থাকবে। অথচ অবশেষে, এবং প্রতি মুহূর্তেই, তাকে বিলাপ করতে হবে—যা চেয়েছি তা পাই না, যা পেয়েছি তা চাই না।

একটু ভেবে দেখুন তো—সুন্দরী নারীকে দেখে, অন্তত দূর থেকে দেখলে, আপনি কখনও ভাবতে পেরেছেন সে কোনো সাধারণ সৃষ্টি? পারেননি। তার সৌন্দর্যের মধ্যে আপনি পুরোপুরি অলৌকিকতার ছাপ দেখেছেন। সুন্দরকে পাবার পর ব্যক্তিগত কারণে তার প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা জাগতে পারে, তবে সৌন্দর্যের প্রতি আপনার আকর্ষণ কোনোদিন কমেনি, বরং তা আরো প্রবলতর হয়েছে। অথচ নিজের স্ত্রীকে আপনার কাছে এখন আর অসাধারণ মনে হয় না। অথচ আপনার স্ত্রীও অন্য কোনো পরনারীকাতর পুরুষের কাছে অসাধারণ। রোগটা আপনারও থাকতে পারে। তাহলে কেন এই সমস্যা? সেক্স এজুকেশনের কোনো বই প'ড়েও, বড় সাইকিআট্রিস্টের সিম্‌পোজিয়ামে যোগ দিয়েও, বিখ্যাত পরামর্শকেন্দ্রে গিয়েও, মনি-রত্ন-পাথর ব্যবহার ক'রেও, হরমোন থেরাপি নিয়েও, মদ্যপান ক'রেও, ভায়াগ্রার নিদেন চিকিৎসা নিয়েও কোনো কাজ হয়নি। হবেও না। **যৌবন থেকে যা চেয়েছেন সে আপনাকে তা দেয়নি। দেবেও না। যৌবন আপনাকে যা দিয়েছে তাতে আপনি তৃপ্ত হননি। হবেনও না।**

কারণ?

কারণ যৌবনকে আপনি ছোট ক'রে দেখেছেন।

কারণ যৌবন থেকে আপনি খুব কমই আশা করেছেন।

কারণ যৌবনকে আপনি গতানুগতিক, তুচ্ছ, এবং স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

কারণ আপনি যৌবনকে বোঝেননি।

যৌবনের কাছে আপনি কী চেয়েছিলেন?

সামান্য আনন্দ।

এ কারণে পূর্ণ তৃপ্তি পাননি কোনোদিন।

যৌবনকে আপনি কী দিয়েছেন?

তাচ্ছিল্য।

এ কারণে সেও আপনার তৃষ্ণা নিয়ে চিনিমিনি খেলেছে।

তার ওপর আপনি অবিচার করেছেন।

ফলে সেও আপনার প্রতি সুবিচার করেনি।

যৌবনকে আপনি মল-মূত্র ত্যাগের মতোই একটা দৈনন্দিন ঘটনা হিসেবে দেখেছেন।

এ কারণে সেও আপনার সাদামাটা আটপৌরে পোশাকের মতো আপনার শরীরের সাথে ময়লাযুক্ত হয়ে লেপটে আছে।

যৌবনের কাছ থেকে আপনি পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা আশা করেননি।

অথচ আল্লাহ বলেছেন—তোমরা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে পবিত্রতা আশা কর।

এজন্য সে আপনাকে সহজে ক্লান্ত করেছে, যৌনমিলনের পর তা আপনার অপরাধবোধ বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণার কারণ হয়েছে।

আপনি যৌবনসুধা পান ক'রে তৃপ্তি পাননি, কারণ আপনি তা আকণ্ঠ পানই করতে পারেননি।

আপনি তা পান করতে পারেননি, কারণ আপনি তৃষিত হননি।

আপনি তৃষিত হতে পারেননি, কারণ আপনি তৃষ্ণার রহস্যটাই জানেননি।

আপনি তৃষ্ণার রহস্যটাই জানেননি, কারণ আপনি সামান্য ক্ষুধাকে তৃষ্ণা ভেবে বসেছিলেন, এবং সে আপনাকে সামান্য জলখাবার দিয়েই তার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয় পাঠক, যে-যৌবন সর্বকালের সব মানবজাতিকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে, যার চিন্তায় মগ্ন থাকার কারণে তরুণ-তরুণীরা তাদের জীবনের আসল সময়টাই নষ্ট করছে, যা বৃদ্ধকেও ভীমরতির ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ করেছে, যার যন্ত্রণা জীবনের গোটা সবুজ বনানীকে বিরান ক'রে দিয়েছে, তার রহস্য না জেনে তার দান গ্রহণ করতে গেলে

www.pathagar.com

তার তাচ্ছিল্যই পেতে হয়। এই জিনিসটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবি, তাহলে এ নিয়ে একটু বেশি কথা বলা কেন যাবে না? কোরআনেও আছে যে পরকালেও আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে—আল্লাহর দিদার বাদে—শ্রেষ্ঠ হবে যৌবনই। সুতরাং তা কোনো সাধারণ জিনিস নয়। তা কোনো পার্থিব জিনিসও নয়।

> নারী, সন্তান, বাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর ও লোভনীয় করা হয়েছে–এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ–তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল রয়েছে।
>
> (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪)

যে-ব্যক্তি দেহকে যৌবনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে, যৌবন তাকে তার দেহের ক্লান্তির সীমানা পর্যন্ত কেবল দৈহিকভাবেই সঙ্গ দেয়। দেহ হলো যৌবনের প্রকাশভূমিমাত্র, তার কর্ষণক্ষেত্র। দেহের সীমানায় তার ফসল ফলে, কিন্তু সে ফসলের পূর্ণ দানটুকু ঘরে তোলার মতো কোনো যোগ্যতা তার নেই।

যৌবন থেকে যে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না, যৌবন তার অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়।

যৌবনের সুধা পান করার মতো উপযুক্ত হৃদয় এবং তৃষ্ণা যার নেই, তা হজম করতে না পেরে সে পথে-ঘাটে বমি করে। খাবার সময়ে যে বমি করে, সে কি পারতপক্ষে নিজের বমিই খুটে খায় না?

আপনি আপনার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাকে কোথায় রাখেন? সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং গোপন জায়গায়। নয় কি? যৌবনও আপনার সবচেয়ে মূল্যবান পাওয়া। এজন্য তার ফোয়ারাকে উন্মুক্ত করা হয়েছে দেহের সবচেয়ে গোপন এবং মূল্যবান স্থানে।

গোপন যখন প্রকাশ হয়, তখন কী ঘটে? তখন তা তার মূল্য হারায়। এক টুকরো মূল্যবান হীরক নিয়ে আপনি যত সন্তর্পণে এবং গোপনে নাড়াচাড়া করবেন, একটা শিশু বা পাগল তা করবে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে বয়স্ক শিশুরা নির্বোধের মতো পথে-ঘাটে-মাঠে-মার্কেটে যৌবনের মহামূল্যবান মনি-মুক্তাকে বিনামূল্যে বিলিয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ঠকছে। **এখন গোপনকে সবাই প্রকাশ্যে বাজারজাত করছে। ফলে তৃপ্তি বিক্রি হয়ে গেছে বিনামূল্যে।**

যৌবন মূল্যবান নয়।

তা মহাবমূল্যবান।

তা গোপনীয় কিন্তু অবৈধ নয়, তা সবচেয়ে বৈধ দান।

ফলে তার গোপনীয়তা তার মূল্য এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য।

এজন্যে তা গোপনীয় হয়েও লুকোচুরিপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

এজন্য এই গোপনীয়তারও সামাজিক, প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা চাই।

এজন্য এই গোপনকে প্রকাশ্য, আনুষ্ঠানিক, আইনী পরিচয় দান করা হয়।

এই পরিচয়ের নামই বিবাহ বা বিয়ে।

একটা পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তান একটা প্রকাশ্য ঘটনা, অথচ তার ইতিহাস এবং পরিচয় গুপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, কলুষিত, ঘৃণ্য। অপরপক্ষে প্রগাঢ় তৃপ্তির যৌনতার লীলাভূমি প্রগাঢ় এবং সৌম্যময়, অথচ তার ইতিহাস এবং প্রকাশ এবং পরিচয় আলোর মতো ধবধবে সত্য, অনুষ্ঠেয় এবং আনুষ্ঠানিক, পবিত্র, এবং কাম্য।

অবৈধ যৌনতা মানুষকে নেশার আনন্দ দিয়ে কাছে টানে, কিন্তু আনন্দের নেশা দিতে পারে না। ফলে সেরূপ ভোগ কখনও উপভোগ হয়ে ওঠে না। তা দেহ থেকে উঠে দেহের সীমাতেই হারিয়ে যায়। তা এমন এক খাবার যা অন্য কারো বমি। অল্প পানির মাছ যেমন লাফায় বেশি, তেমনি এরূপ দেহসর্বস্ব এবং দেহনির্ভর সম্ভোগ মনে কেবল অস্থিরতাই এনে দেয়।

ইদানিংকালের দৃষ্টিনির্ভর যৌনতা, শ্রুতিনির্ভর যৌনতা, বাক্যনির্ভর যৌনতা মূলত চোখের ময়লা, কানের পুঁজ, আর জিহ্বার বর্জ্য ছাড়া আর কিছু নয়। যারা চক্ষুষ্মান তাদের চোখে এসব ধরা পড়ে।

এখন যৌবন যাকে চৌরাস্তার মোড়ে শিশ দেয়ার উস্কানি দেয়, এখন যৌবন যে মহিলাকে তার যৌবনের বেসাতি নিয়ে আধো-উদোম হয়ে ঘন-ঘন নিরুদ্দেশে মার্কেটে এটা-ওটা কেনার নামে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, এখন যৌবন যে-পুরুষকে নারী-শিকারের নেশায় ঘর থেকে বাইরে বের ক'রে আনে, উর্ধ্বশ্বাসে সুপারমার্কেটে রাস্তায় ঘুরিয়ে মারে, এখন যৌবন যে-পুরুষকে চৈত্রের কুকুরের মতো পতিতাশিকারের লালসায় হোটেল-মুখী ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, এখন যৌবন যে-তরুণকে বাণিজ্যিক তরুণীদের নগ্ন ছবি আঁকতে এবং এঁকে তা চাটতে বাধ্য করে—পর্নোগ্রাফিক চিত্রের জলছবির মায়াপুরীতে ঘুমহীন গভীর রাতে ডুবে থাকতে বাধ্য করে, এখন যৌবন যাকে নেশাতুর করে অথচ তৃপ্তি দেয় না, উদ্‌ভ্রান্ত করে অথচ পথ দেখায় না, শুধুই ভাসায় অথচ গভীরে ডোবায় না, শুধুই পোড়ায় অথচ শীতল করে না—সে বড়ই হতভাগা। জীবন তাকে ফাঁকি দিয়েছে। কারণ সে তার সত্তার কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছে। সে যৌবনের দাস হয়েছে কিন্তু মনিব হতে পারেনি। সে তার মহামূল্যবান লুকানো মানিককে বিনামূল্যে পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রেখেছে। সে কখনও নিজেকে গোছগাছ ক'রে একখানে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে এবং অনুভব করতে পারবে না। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

যৌবন যাকে প্রকৃত তৃপ্তি দেয়, সে নিশ্চুপ হয়ে নিজের গভীরে ঢুকে যায়, ছটফট ক'রে বেড়ায় না। তার ভোগ শেষ হলেও উপভোগ শেষ হয় না। কোনো ব্যক্তির অস্থিরতা তার ভেতরকার অতৃপ্তির ব্যধির উপসর্গমাত্র। এরূপ ব্যধি নিয়ে মার্কসবাদী 'বুদ্ধিজীবী'রা বড়াই ক'রে থাকে, কারণ গর্ব করার মতো অন্য কোনো সম্পদ তাদের নেই।

যে-ব্যক্তি মনে করে যে যৌবন তার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তার দান সার্থকভাবে গ্রহণ করাই তার জীবনের একটা বড় লক্ষ্য, অথচ এই তৃপ্তিকে সে খোঁজে পথে-ঘাটে-মার্কেটে হালকামিপূর্ণ চাহনি শিশ অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে, সে যৌবনকে ছোট ক'রেই দেখেছে। সে কিভাবে ভাবল যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে অত সহজে পাওয়া যায়? তার এই ভাবনাই প্রমাণ করে যে সে যৌবনকে ছোট ক'রেই দেখেছে। যৌবন যদি ছোটই হবে, তাহলে তার পেছনে সময় নষ্ট করা কেন?

ভোগবাদী নাস্তিকরা বলে—যৌবন ছোট জিনিস ব'লেই তো তার পেছনে বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না; তাকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে এত সহজলভ্য করতে চাই যেন তার পেছনে দৌড়ে সময় নষ্ট করা না লাগে, যেন তা যখনই যেখানে দরকার হবে তখনই সেখানে পাওয়া যায়।

হতভাগা ভোগবাদী! এতই ছোট ক'রে তো বললে, অথচ তাকে দেখলে তো সেই বড় ক'রেই। যৌবন যদি তুচ্ছ একটা জিনিস হবে, তাহলে তাকে একেবারে বাদ দিলেই হয় না? কিংবা তার প্রতি উদাসীন থাকলেও তো চলে : যখন পেলাম খেলাম, না পেলাম খেলাম না—এই জাতীয় উদাসীনতা? অথচ তারা চায় ধর্মের বা সমাজের বিধানের প্রতি উদাসীন থাকতে। তারা যে-যুক্তির কথা বলে, তা আত্মবিরোধে ভরপুর। তারা যৌবন ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ভাবে না—তাদের গানের লক্ষ্য কী? যৌবন। তাদের নাচের প্রত্যেকটা অঙ্গভঙ্গির লক্ষ্য এবং রং এবং প্রকাশ কী? যৌবন। তাদের গল্পের উপজীব্য কী? যৌবন। তাদের নাটকের মূল আলাপ কী? বিয়ে, যৌবন, প্রেম—অর্থাৎ যৌবন। তাদের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়টা কী?—যৌবন, এমনকি নগ্ন যৌনতা। তাদের চিত্রকর্ম এবং ভাস্কর্যকর্মের একমাত্র—একমাত্র—এবং একমাত্র বিষয় কী? নগ্ন যৌনতা। তাদের কবিতা নিংড়ালে যে-রস বের হয় তা কী? যৌনতা। তাদের চায়ের আড্ডার মূল মসলা কী? স্বামীহীন বা স্বামী-পরিত্যক্তা কিছু নারী এবং 'ডোন্ট মাইন্ড' উদারতার মুক্ত আলাপ। তাদের বিপ্লব এবং সংগ্রামের মূল স্রোতটা কী? যৌনতা-সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধানের বিরোধিতা করা। তাদের নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য কী? উন্মুক্ত যৌনচারের অধিকার।

কারণ কী?

www.pathagar.com

কারণ যৌবনই তাদের জন্য জীবনের একমাত্র উপভোগ।

কারণ যৌবন আসলেই খুব বড়।

আর যৌবন বড় বলেই তাকে ছোট ক'রে দেখার কারণে তারা তার প্রকৃত তৃপ্তি পায়নি। ফলে তাকে খুঁজছে সবখানেই।

তারা যৌবনকে যৌবনের মূল্যবান জায়গায় রাখেনি, তাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছে যেখানে-সেখানে। সেই-সব ছড়ানো মাংস-খণ্ড আর হাড়ের টুক্‌রোকে তারা আবার চৈত্রের এতিম একলা-কুকুরের মতো আনমনে সারাক্ষণ খুঁটে খাওয়ার কাজে ব্যস্ত।

তারা মুখে ব'লে থাকে যে যৌবন হলো মল-মূত্র ত্যাগের মতোই একটা 'স্বাভাবিক' ব্যাপার। তাহলে তা নিয়ে এত কেন? এক আর্টিস্টের গোটা জীবন কেটে যায় কিসের ঘোরে? কই, কেউ তো মল-মূত্র ত্যাগ নিয়ে ছবি আঁকে না।

তারা যদি কথা-কাজের অমিল ত্যাগ করতে পারত, তাহলে অন্তত এটুকু সৎভাবে বলত যে তারা যৌবনকে বড় ক'রেই দ্যাখে। আর এ কারণেই যৌবন নিয়ে জীবন-ভর তাদের বড় বড় আয়োজন।

মূর্খ ভোগবাদী! যার গুরুত্বকে ছোট ক'রে মতবাদ দেয়া হয়—যৌবন এক গ্লাস পানির মতো, সহজে গিলে ফ্যাল—তার জন্য এত বড় আয়োজন করলে তা থেকে কি প্রকৃত তৃপ্তিটুকু পাওয়া যায়? তাইতো বলি, যৌবন মূল্যবানই। আপনি নিজেও তা জানেন। অথচ তাকে মূল্য না দিতে পেরে নিজেই ব্যর্থ যৌন-উপাসনা ক'রে গেলেন শুধু।

যা মূল্যবান তাকে গোপন করুন, লুকিয়ে ফেলুন, তার মর্যাদাকে সংহত করুন।

যা মূল্যবান তা নিয়ে অনুষ্ঠান করুন, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন ক'রে বিবাহ-নামক প্রকাশ্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত আবরণ দ্বারা গোপন করুন।

কিন্তু সমস্যা এখানেই। **নাস্তিক হোক আর ধার্মিক হোক, অধিকাংশ লোকই নিজের স্ত্রী নিয়ে তৃপ্ত নয়। কেন? এও একটা ব্যধি। এর রহস্যময় সমাধান আছে। তবে তা জানতে হলে যৌবনের রহস্য জানতে হবে। জানতে হবে সৌন্দর্যের রহস্য।**

৮. বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি : যা পাই তা চাই না

এক বাড়িতে এক মেহমান উঠল। গৃহকর্তাকে বলল—খুব খিদে পেয়েছে। কী যেন একটা খেতে ইচ্ছে করছে। খুব মনে চাচ্ছে। কিন্তু জানি না সেটা কী। গৃহকর্তা ভাবল—

www.pathagar.com

মুসাফির মানুষ। খাবার যখন যা পায় খায় বটে, কিন্তু কোনটাকে কী বলে তা কিভাবে জানবে? সুতরাং এমনও হতে পারে যে তার মন যা চাচ্ছে তার স্ত্রী দশ প্রকারের খাবার রান্না করলে তা তার মধ্যেই থাকবে। এই ভেবে সে তার স্ত্রীকে সবচেয়ে বড় ধরনের মেহমানকে খাওয়ানো হয় এমন দশ পদের খাবার রান্না করতে বলল।

খাবার সময়ে গৃহকর্তা বিশাল এক ট্রে-তে দশটা বাটিতে ক'রে দশ রকমের খাবারের স্যাম্‌প্‌ল এনে হাজির। সে মোসাফিরকে বলল—ভাই সাহেব আমার, এর মধ্য থেকে বেছে নিন কোনটা আপনার মন চেয়েছিল।

মোসাফির হঠাৎ ক'রে সবগুলো খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে পড়ল, ঠিক যেমনভাবে একটা অচেনা পোকার দিকে তাকিয়ে থাকে তরুণী মুরগির বাচ্চা। খানিক পরে সে একটা বাটি থেকে একটু খাবার নিয়ে চেখে দেখল। সে গালের মধ্যে জিহ্বার নাড়ানিটা ভালোভাবে নেড়ে দুচোখ উল্টিয়ে পরখ করল। তারপর পুরো স্যামপ্‌ল্‌টাই কোনো কথা না ব'লে সাবাড় করল—কিন্তু খাবার ভঙ্গিতে নয়, চেখে দেখার ভঙ্গিতে।

প্রথম বাটিটা শেষ হয়ে গেলে সে বলল—আসলে কোনটা মন চাচ্ছে তা একটা একটা ক'রে না খেয়ে দেখলে বুঝব কিভাবে। ফলে সে সবগুলো বাটিই সাবাড় করল।

তাতে গৃহকর্তার কোনো সমস্যা নেই। সে জানতে চাইল তার মনে কোনটা চেয়েছে।

মোসাফির তাকে বলল—আসলে মন যা চায় তা পাওয়া যায় না। কোনোদিন আসল জিনিসটা গালে পড়লেই বুঝতে পারব। এই ব'লে সে ভবিষ্যতে আরেকদিন গৃহকর্তার বাড়িতে পদধূলি দিয়ে তাকে ধন্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত ক'রে চ'লে গেল।

মোসাফির ভুল বলেছে—মন যা চায় তা পাওয়া যায় না। আসলে তার হয়েছে 'যা পাই তা চাই না' রোগ। কারণ **সে নিজেই জানে না সে আসলে কী চায়।**

স্ত্রীর মধ্য থেকে আপনি কী চান তা না জানলে আপনি কোনোদিন তার কাছে কিছু পাবেন না। দশ বাটিতে দশটা স্ত্রীকে রেখে তা থেকে চেখে দেখলেও দেখবেন যে আপনি যাকে চান তাকে এখনও পাননি।

কেউই তার স্ত্রীর মধ্যে আর কিছু খুঁজে পায় না।

কারণ কেউই আসলে জানে না তার স্ত্রীর মধ্যে সে কী খুঁজেছিল।

যা-ই খুঁজুক না কেন, কেন তা খুঁজেছিল?

কারণ তার বুকের মধ্যে একটা ক্ষুধা ছিল। সে খাদ্য খুঁজেছিল। কারণ তার বুকের মধ্যে একটা তৃষ্ণা ছিল। সে এক গ্লাস শীতল পানীয় খুঁজেছিল।

তবুও সে কিছু পায়নি কেন?

সবাই শুধু সমৃদ্ধ এবং তৃপ্ত অতীতের কথা বলে, কেউই তৃপ্ত বর্তমানের কথা বলে না কেন?

www.pathagar.com

কারণ সবাই স্বপ্ন দেখেছিল।

এবং এখন জেগে উঠে দেখেছে যে স্বপ্নটা ছিল মিথ্যা।

সে স্বপ্নে যা চেয়েছিল বাস্তবে এসে সে তা পাবার ক্ষমতা হারিয়েছে। সে বাস্তবের মধ্যে স্বপ্নকে ধ'রে রাখতে পারেনি।

সবাই চাওয়ার সময়ে স্বপ্ন দ্যাখে। অথচ পাওয়ার সময়ে বেশিমাত্রায় জেগে উঠে খুঁটে খুঁটে দ্যাখে কী পেল। দেখলেই তার পাওয়া হারিয়ে যায়। কারণ সে চেয়েছিল চোখ বুজেই, স্বপ্নের ঘোরে।

নারী যখন স্ত্রী হয়ে যায়, তখন সে তার চৌম্বকত্ব হারায়। এই দোষ যতটা নারীর, তারও চেয়ে বেশি পুরুষের। পুরুষ প্রিয়ার কাছে যা চায়, স্ত্রীর কাছেও তাই চায়, অথচ সে প্রিয়াকে যা দেয়, স্ত্রীকে তা দিতে চায় না। নারী কিন্তু পুরুষের এই অক্ষমতাকে বুঝতে পারে—বুদ্ধি দিয়ে নয়, স্বভাব দিয়ে। তাই সে তার স্বামীকে নিয়ে মনের গভীরে প্রশ্ন করে—মানুষটা এতখানি পাল্টে গেল কিভাবে? কেউ যদি জানত নারীর মনের রহস্য, তাহলে অধিকাংশ নারীকেই সে দোষ দিত না।

www.pathagar.com

দশ

নারীর মনের রহস্য

নারীর মনের রহস্য বিশাল। সে রহস্য না জানে পুরুষ, না জানে নারী নিজে। এখানেও তার অধিকাংশ রহস্যই বলা সম্ভব নয়। তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি 'নারীর মন' নামক গ্রন্থে।*

নারীর সৌন্দর্যই তার নারীত্ব। অথচ তার স্বভাব হলো তার মেয়েলিপনা। পুরুষ এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতিবিধান না করতে পেরে নারীর প্রতি অবিচার করে। আসলে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি বেশি মূল্য আরোপ করে পুরুষ নিজে। আর মেয়েলিপনা হলো নারীর নিজস্ব। পুরুষের বড় ভুল হয় এখানে যে সে নারীর দেহ থেকে যা চায়, তার মন থেকেও তাই চায়। প্রথমটা সে পায়; দ্বিতীয়টা পায় না। অথচ সে দ্বিতীয়টার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ ক'রে অনন্যোপায়ে কেবল প্রথমটা নিয়েই প'ড়ে থাকে। এবং এভাবে নারী হয়ে যায় নিছক ভোগ্যবস্তু। ভোগের যেহেতু সীমা আছে, ভোগের মাধ্যমেই যেহেতু উচ্ছিষ্ট সৃষ্টি হয়, সেহেতু নারী এক সময়ে হয়ে যায় উচ্ছিষ্ট। তখন সে স্বামীর সোহাগের তৃষ্ণাকে চাপা দিয়ে মাতৃত্বের তৃপ্তির ছায়ায় বেঁচে থাকে। সে অবলা। তার কোনো যুক্তি নেই, আছে শুধু স্বভাব। তার স্বভাবের যুক্তিটাকে কেউ বোঝে না।

নারী এতই বোকা যে সে 'এত সুন্দর' হয়েও জানে না যে সে সুন্দর। তার নিজের কাছে তার সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেই। তার সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল পুরুষের জন্য। পুরুষ তাকে মূল্যায়ন করলেই তার তৃপ্তি এবং সার্থকতা। তার সৌন্দর্যের ব্যাপারে তার আত্মবিশ্বাস এত কম যে পরমা সুন্দরী রমণীরও সন্দেহ জাগে তার সাজগোজ ঠিক হয়েছে কি না, তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে কি না। পুরুষের প্রশংসাই তার সৌন্দর্যের সার্থকতা। সে শুধু ভোগের বস্তু হয়ে প'ড়ে থাকলে নিজেকে ছোট এবং তুচ্ছ মনে করে। সে প্রশংসার পাত্রী হতে চায়। তার প্রশংসাকারীই তাকে ভোগ করুক—সে এটাই চায়। তাতেই তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। কারণ তখন সে

* প্রকাশক রোহেল পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

নিজেকে দেহেরও অতিরিক্ত ভাবতে শেখে। যেহেতু তার নিজের কাছে তার দেহের কোনো মূল্য নেই, সেহেতু যে ব্যক্তি শুধু তার দেহকে ভালোবাসে, সে তার ভালোবাসায় সংকীর্ণতা খুঁজে পায়। অতএব আপনার স্ত্রীকে প্রশংসা করুন। তার সার্বিক রূপের প্রশংসা করুন। শুধু রূপ নয়, তার গুণেরও প্রশংসা করা চাই। পুরুষদের বোঝা উচিত যে সামান্য প্রশংসার বিনিময়েই দীর্ঘ-যুগের ঘরের বউও মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়ের সূত্র ধ'রে পরপুরুষের হাতে বিক্রি হয়ে যায়। কিছু লোচ্চা পুরুষ আছে যারা অন্যান্য বোকা পুরুষের এরূপ দুর্বতারও সুযোগ নেয়। **স্ত্রীকে যে প্রশংসা করে না সে অহংকারী এবং হিংসুক।**

নারী এতই আত্মবিশ্বাসহীন যে তাকে প্রশংসা করলেও সে প্রথমত সন্দেহ করে। আবার সে এতই বোকা যে আঠালো প্রশংসার ফাঁদে আটকা না প'ড়ে পারে না—তা মিথ্যে প্রশংসা হলেও। সুতরাং কেবল সত্য প্রশংসাই করুন—এবং সঠিক মুহূর্তে। রসুলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া নারীর মনকে আর কেউই পূর্ণভাবে বুঝতে পারেনি। তিনি ভালোভাবেই জানতেন নারীকে কতটুকু প্রশংসা কখন করতে হয়।

নারীর বায়না এবং স্বভাবের ঝগড়াটে জটিলতা এক চমৎকার রহস্য। ছোটখাট বিরক্তিকর আচারণ, চেঁচামেচি, ছ্যাবলামি এসব আপনাকে বিরক্ত করে, বিতৃষ্ণ ক'রে দেয়। অথচ আপনি কি জানেন নারী তা কেন করে? আপনাকে উত্যক্ত করার এবং আপনার ছোট-খাট মুহূর্তকে বিষিয়ে তোলার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিক্ততাপূর্ণ আচরণ তার স্বভাবের একটা মেকানিজম। সে এরূপ আচরণ স্বাভাবিকভাবেই ক'রে বসে—ঠেকাতে পারে না। আসলে সে জানতে চায় আপনি তাকে কতটুকু ভালোবাসেন। তাকে ভালোবেসে তার ছেলেমিকে—এবং এমনকি অত্যাচারকেও—কতখানি সহ্য করেন। তার আত্মবিশ্বাসের অভাবই তাকে লেলিয়ে দেয় আপনাকে ছোট-খাট ব্যাপারে উত্যক্ত করার জন্য। আপনি যদি তাকে হাস্যমিশ্রিত সহনশীলতা এবং আহ্লাদ দিয়ে ভালোবাসার নিশ্চয়তা দিতে পারেন, তাহলে সে আপনার জন্য মরতেও রাজি, পরপুরুষ নিয়ে ভাবা তো দূরের কথা। সুতরাং তাকে সহ্য করুন। তাকে মূল্য দিন। তবে শুধু সহ্য করা নয়, হাসিমুখে সহ্য করুন। যেমনটা ক'রে থাকেন শিশুকে প্রশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে।

তবে তার জটিলতাপূর্ণ আচরণকে যত সহ্য করবেন, সে তার মাত্রা এবং পরিমাণ তত বাড়াতে থাকবে। উদ্দেশ্য সত্যিকারের ঝগড়া-ফ্যাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কারণ?

কারণ সে এটাও জানতে চায় সে একটা কাপুরুষকে বিয়ে করেছে কি না। সে দেখতে চায় তাকে প্রয়োজনে শাসন করার যোগ্যতা এবং পৌরুষ আপনার আছে

www.pathagar.com

কিনা। **নারী সর্বদা একটা সুপুরুষের স্ত্রী হতে চায়।** সুতরাং সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাকে মৌখিক ধিক্কার দ্বারা শাসন করুন। সহজে গায়ে হাত তুলতে যাবেন না, কোরআনে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ছাড়া।

যেই তাকে শাসন করবেন, অমনি সে গোস্যা করবে। সে প্রমাণ পেয়েছে যে সে একজন সুপুরুষের স্ত্রী। তাই সে গর্বিত। এখন সে জানতে চায় সে নিজে সুপুরুষের শাসন শুধু নয়, ভালোবাসা পাবারও উপযুক্ত কি-না। সুতরাং তার গোস্যা না ভাঙ্গা পর্যন্ত তাকে তোয়াজ করুন। প্রয়োজনে প্রগাঢ় আদর দিন। একটা ফুল কিনে দিন। একটা লিপস্টিক। কিংবা কাপড়। কিংবা এরূপ কিছু। তবে তাকে গোস্যা-করা অবস্থায় বেশ কিছুটা সময় থাকতে দিন। নারী কখনও সহজে তার গোস্যা ভাঙ্গতে চায় না। সুযোগ থাকলেও তা করতে যাবেন না। সে তার গোস্যার মূল্য আশা করে। তার জিদকে ব্যবহার ক'রে সে নিজের মূল্য আদায় করতে চায়। তাকে তার মূল্য দিন। তাকে জানতে দিন যে আপনার কাছে সে সম্মানিতও বটে। তাকে বুঝতে দিন যে তার গোস্যাও আপনার কাছে মূল্যবান। তাকে কখনও তার গোস্যার জন্য গালমন্দ করবেন না। নারী একেবারেই শিশুর মতো। তার শরীরের বড় গড়ন-গাড়ন দেখে আমরা তার মনের শিশুত্বের কথাটা একেবারে ভুলে যাই। স্বয়ং আল্লাহই নারীর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে বলেছেন।

আল্লাহর রসুল (সঃ)ও বলেছেন যে নারীর স্বভাবের বক্রতাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে, কারণ তাকে বানানো হয়েছিল আদমের (আঃ) পাঁজরের বাকা হাঁড় থেকে; আর পাঁজরের হাঁড়কে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যায়। সুতরাং সাবধান! বউ-পেটানো হুজুর বা নির্যাতনকারী স্বামী হলে পরকালে আপনাকে তাঁর কাছেই জবাবদিহি করা লাগবে যিনি নারীকে মেয়েলিপূর্ণবাবে সৃষ্টি করেছেন। নারী আপনার পোশাক এবং আপনিও তার পোশাক (আল-কোরআন)। সে আপনার কর্ষণক্ষেত্র (আল-কোরআন)। সে আপনার মুষ্টিযুদ্ধ শেখার বা লাঠিপেটার বস্তা নয়। তাকে কোলবালিশ বানান, ছেড়া ন্যাকড়া বানাবেন না। রসুলল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক স্বামীকে নিষেধ করেছেন যেন সে তার স্ত্রীকে অন্য কারো সামনে অপমানিত না করে। অনেক হুজুরও তাঁর এই আদেশ পালন না ক'রে তাঁকে অবমাননা করছে। পরকালে তারা প্রিয় নবী (সঃ)-কে মুখ দেখাবে কিভাবে? যে-ব্যক্তি রসুল (সঃ) এর আদেশ-নিষেধকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করে না, তার মুখে রসুলের (সঃ) পবিত্র দরূদ শোভা পায় না। সে যেন নিজেকে ঠিকঠাক না ক'রে দরূদ না পড়ে।

নারীর স্বভাবের জটিলতা, বায়না, এবং লুকোচুরি সবচেয়ে বেশি ক্ষেপে যায় তখন যখন আপনি তাকে কাছে পেতে চান। আপনি যখন তাকে চান, তখন, বিশেষ

www.pathagar.com

আনন্দঘন মুহূর্তে, সে চায় আপনার টাকা কিংবা প্রতিজ্ঞা। আপনার তাতে বিতৃষ্ণা ধরে যায়। ভাবেন—এলাম একটু শীতল হতে, মনটাও ভালো ছিল, অথচ সে তার জটিলতা দ্বারা সব আনন্দকে পণ্ড করে দিল! আসলে তার এই রহস্যটাই আপনি বোঝেননি। তার জটিলতার সবচেয়ে বড় কার্যকারিতা তো এখানেই। আপনি যখন তাকে পেতে চান, তখন সেও জানতে চায় আপনি তাকে কতখানি মূল্যবান মনে করেন, নাকি আপনি শুধু তার দেহটার জন্যই লালায়িত। সে আসলে যত বায়নাই ধরুক, তেমন কিছু চায় না, চায় অঙ্গীকার এবং সহনশীলতা। সুতরাং তাকে ভালো কিছু দেবার অঙ্গীকার করুন। স্বয়ং আল্লাহই নারীভোগকে অত্যন্ত আহলাদের সাথে উৎসাহিত করেছেন, অথচ নারীর কাছে যাবার আগে কিছু ভালোকাজ করতেও বলেছেন।

নারীর বায়না মেনে নেয়াটাই একটা অত্যন্ত ভালো কাজ। তার বায়নার সবচেয়ে বড় রহস্য হলো এই যে, আপনি বিরক্ত না হয়ে তাকে যত প্রশ্রয় দেবেন, তত তার সান্নিধ্যে বেশি আনন্দ পাবেন। সৃষ্টির ফর্মুলাকে এভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজানো হয়েছে। আপনি চান তাকে। সে চায় অন্য কিছু পাবার প্রতিজ্ঞা। তাকে এই প্রতিজ্ঞা করতে গিয়েই আপনার মনে খেসারতের উপযুক্ত বদলা উসুল ক'রে নেয়ার আশা জাগবে। আর এই উসুলই হবে তাকে বেশি ক'রে কাছে পাওয়া। অর্থাৎ আপনার স্বভাবের মধ্যেও বিদ্রোহ জেগে উঠবে—তোমার এত বায়নাই যখন সহ্য করছি, তাহলে পাওনাটাও উসুল ক'রে নেব। ফলে প্রেম আরো ঘন হবে। আপনার মধ্যেই এক নিবিড় আনন্দঘন উত্তেজনা জেগে উঠবে। আল্লাহ এই রহস্য নারীর স্বভাবের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এজন্যে যে তাতে আপনার ভুল হলেও নারীর যেন ভুল না হয়, এবং মুহূর্তটা যেন নষ্ট না হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, স্ত্রীকে পূর্ণভাবে যৌন আনন্দ দেয়া স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখবেন, নারীর কাছে যৌনতার চেয়ে তার মূল্য এবং মর্যদার ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তার বক্রতার পথ ধ'রেই তাকে আনন্দ দেয়া যায়—অন্য কোনোভাবে নয়। তবে বক্রতা মানে কিন্তু বিকৃতি নয়। রসুল (সঃ) সব ধরনের যৌনবিকৃতিকে হৃদয় এবং যৌনতা থেকে পুরোপুরি পরিহার করতে বলেছেন। আলী (রাঃ) এও বলেছেন যে, কেউ যদি যথানিয়মে ওজু ক'রে বিসমিল্লাহ ব'লে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং পরবর্তী গোছলের আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। কত বড় কথা! ওজু কিন্তু করতেই হবে—দেহে এবং মনেও।

স্ত্রীকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। লক্ষ্য করেছেন কি তিনি সব জিনিসপত্রের দাম কত কম বলেন? এমনকি দুই টাকার কারণেও তিনি একটা শখের জিনিস কেনা থেকে বিরত থাকেন। এক টাকা কমানোর জন্যও দোকানীর সাথে প্রচণ্ডভাবে দরকষাকষি করেন। অনেক সময়ে দামী জিনিষের জন্য এত কম দাম বলেন যাতে আপনি লজ্জা পান।

বলুন তো পরমা সুন্দরী রমনীরও কেন এই সংকীর্ণতা? এই 'অসুন্দর' আচরণ?

www.pathagar.com

কারণ জানেননি কোনোদিন। কারণ আপনি চিরকাল আপনার যুক্তিকেই তাঁর ওপর চাপিয়েছেন, অথচ লাভবান হয়েছেন তার যুক্তি দ্বারা।

নারীর কৃপণতার কারণ কৃপণতা নয়—মূল্য।

সে ভাবে যে জগতে সবচেয়ে বেশি মূল্য তার—আর সবই তার তুলনায় শস্তা!

তার এই ভাবনাটাই সৃষ্টির একটা ফর্মুলা। সে নিজেকে বেশি মূল্যবান হিসেবে দেখতে চায়, অথচ তার নিজের নেই কোনো আত্মবিশ্বাস। এ কারণে সে মূল্য সঞ্চয় করতে উদ্যত হয়—অর্থাৎ সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। আপনার ছোট মেয়েটার খেলার বাক্সের মধ্যেও দেখবেন অনেক কিছু সঞ্চিত হয়ে আছে। সেও কিছুই খরচ করতে চায় না, শুধু জমাতে চায়। স্বয়ং আল্লাহই তাকে এই অধিকার দিয়েছেন। খেয়াল করেননি?—পৃথিবীর কোনো ধর্মই নারীকে সম্পদ দিতে বলে না, অথচ কোরআনে বলা হয়েছে বিয়ের সময়ে নারীকে দেনমোহরের টাকা দিতে? তার সেই টাকার ওপর পৃথিবীর কারো কোনো অধিকার নেই। যিনি নারীর মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন, যিনি নারীকে সঞ্চয়ী হতে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনিই পুরুষকে বলেছেন নারীর হাতে সঞ্চয় তুলে দিতে। সাবধান! নারীর ভালোবাসার মূল্য পরিশোধ করুন। এটা একটা আবশ্যিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

স্বভাব চিরকালই সব জায়গায় সবার মধ্য দিয়ে একই কথা বলে। তাই তো দেখি যুগ পাল্টায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান পাল্টায়, কিন্তু মানুষ পাল্টায় না। স্বভাব ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন। তা যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয়। জীবনযাত্রাকে সহজ এবং পদ্ধতিগত ক'রে দেয়ার জন্য আল্লাহ স্বভাবকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এজন্য স্বভাব যেন তার যান্ত্রিকতা দ্বারা বিবেককে তথা আল্লাহর বিধানকে অতিক্রম না ক'রে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেও স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে। এই কথাটা নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং নারীরও উচিত একথা বিবেচনায় রাখা যেন তার স্বভাব কখনও সীমালঙ্ঘন না করে। নারীর আত্মমুখিতা যখন সীমালঙ্ঘন করে তখন তা হিংসা, দম্ভ, আত্মজাহিরি, সংকীর্ণতা, পরনিন্দা, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি মহাপাপের জন্ম দেয়। তখন প্রাকৃতিক বৈধ স্বভাব রূপান্তরিত হয় নিকৃষ্ট আচরণে।

নারীর রহস্য নিয়ে আর বেশি কিছু বলার জায়গা এই বইতে নেই। শুধু এটুকু বলি—নারী যদি স্বভাব দ্বারা তাড়িত হয়ে যন্ত্রের মতো আচরণ না করত, তাহলে পৃথিবীতে কখনও সংসার গ'ড়ে উঠত না। এটাই প্রমাণ করে যে আল্লাহই তার স্বভাবকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ওভাবে সৃষ্টি করেছেন। তার স্বভাবের মধ্যে মধু আছে, যদি আপনি মধু পান করার মতো সুপুরুষ হয়ে থাকেন। জগতের সব সুপুরুষ এবং বীর ব্যক্তিই নারীর মেয়েলিপনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এতেও কি প্রমাণিত হয় না সে নারীকে যে সহ্য করতে পারে না সে কাপুরুষ?

www.pathagar.com

নারী কেন সুন্দর? কে এই নারী?

সুন্দর রমণী দেখলে পুরুষের কলিজা ছিড়ে আসে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, পুরোপুরি স্বাভাবিক। কিন্তু কেন? কী আছে নারীতে, যা নারী নিজেই জানে না? নারী যে পুরুষের জন্য মধু, নারী তা বুঝে উঠতে পারে না ব'লে সে ছলনা করে, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, শুধু এটুকু দেখার জন্য যে তার পেছনে পুরুষ কতটা ছোটে। পুরুষের অস্থিরতার প্রবলতা দিয়েই সে নিজের গুরুত্বকে মাপে। অনেক সাহিত্যিক গর্দভ এই রহস্য না বুঝতে পেরে নারীকে 'ছলনাময়ী' নামে আখ্যায়িত করে। কিন্তু শুধু নারী নয়, সব জীবকুলের মেয়েদের স্বভাবেই এই 'ছলনা'র মেকানিজম ঢুকানো আছে। মুরগী যত বেশি আত্মরক্ষার্থে দূরে পালাতে থাকে, তত তার নিজের আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যায় ব'লে সে নিজেও বেশি উত্তেজিত এবং মিলন-উপযুক্ত হয় এবং মোরগও তত জেদী হতে হতে আত্মপ্রত্যয়ী এবং উত্তোজিত হয়। এতে উভয়েরই লাভ।

সুতরাং স্ত্রীকে ছলনা করার সুযোগ দিন। তারপর তার ছলনার ফর্মুলার মধ্যে ঢুকে পড়ুন।

পুরুষ নারীকে চায়। তাই সে তার পিছু নেয়। নারী পুরুষকে চায় না। সে চায় যে পুরুষ তাকে কামনা করুক। সে চায় যে চায় যে পুরুষ তার পিছু নিক। কি চমৎকার সমীকরণ! এ কারণে পুরুষ তাকায় নারীর দিকে, নারী তাকায় নিজের দিকে কারণ পুরুষ যেহেতু তার দিকে তাকাবে সেহেতু নিজেকে দর্শনীয় ক'রে সাজিয়ে রাখা চাই।

তাহলে কে এই নারী? সে কেন নিজেকে গোছগাছ ক'রে আরেক জনের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিতে চায়?

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কখনও কি ভেবে দেখেছেন কে তিনি?

তার মুখখানা মোলায়েম ক'রে ধ'রে খুব কাছাকাছি ব্যক্তিগত আয়নার মত তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কখনও—কিছু দেখা যায় কি না? তার ঠোঁটে-মুখে-চোখে চুম্বন ক'রে দ্বিতীয়বার কি তাকিয়ে দেখেছেন তার মুখের রং পাল্টে যায় কি না? তার দেহ নিয়ে যতটুকু মাতামাতি করেছেন, তা করেছেন দেহের লোভে। তার চোখের মধ্য দিয়ে সরাসরি তার হৃদয়ের দিকে তাকিয়েছেন কখনও? না। এ কারণেই পবিত্র কোরআনের আয়াতের রহস্য বোঝেননি। রসুল (সঃ) এর হাদীসের রহস্য বোঝেননি।

> তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশাবলীর মধ্যে আর একটা হলো; তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের মধ্যে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং অনুকম্পা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের মধ্যে এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রুম, আয়াত : ২১)

www.pathagar.com

সৃষ্টির প্রথমে ছিল পুরুষ। আদম (আঃ)। তাঁর থেকে সৃষ্টি করা হলো নারীকে। মা হাওয়া (আঃ) কে—আরবি শব্দ অপছন্দকারী শিক্ষিত 'আধুনিক'দের ভাষায় 'ইভ্'।

নারীকে সৃষ্টি করার পর সৃষ্টির ফর্মুলায় টেনে নেয়া হলো নারীকে। তখন থেকে পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্ম হতে থাকল নারীর গর্ভ থেকে।

> হে মানুষ! আমি **তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে,** পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

পুরুষের ভেতর থেকে এসেছিল নারী। তারপর নারীর ভেতর থেকে এসেছে পুরুষ। একজনের ভেতরটা হলো অন্যজনের বাহির। একজন ভেতর থেকে বের হয়ে এসে আবৃত করল অন্যজনকে। একজন হলো অন্যজনের পোশাক। তাইত কোরআনে বলা হয়েছে যে **নারী পুরুষের পোশাক এবং পুরুষ নারীর পোশাক।**

স্ত্রীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাহুবদ্ধ ক'রে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কখনও কি খুঁজেছেন তার মধ্যে আপনার ভেতরটা প্রকাশিত রয়েছে কি না? ভেবেছেন কি—যে-সাদা বাহু কোমল দেহ মধুময় বুক আপনাকে প্রগাঢ় উষ্ণতায় চারদিকে চাদরের মতো ঘিরে রেখেছে, তা আসলে আপনারই জৈবিক আমিত্বের বর্হিপ্রকাশ? এখন আপনারই যে-অংশ আর ভেতরে নেই, বাইরে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে আপনি বাইরে দেখে চিনতে পেরেছেন, আবারও বুকের সাথে চেপে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন। সে তো ভিন্ন ডাইমেনশানে আপনারই স্বরূপ। আপনি তার ছোট-খাট বায়না সহ্য করতে পারেন না—এর মানেই হলো আপনি নিজেকে অস্বীকার করেন, নিজেরই ভেতরটাকে অস্বীকার করেন। এ কারণে নারী-নির্যাতনকারী এবং নারী-বিদ্বেষী কোনোদিন নিজেকে আনন্দিত হিসেবে খুঁজে পায়নি।

আপনার ভেতরটা ছিল সুধাময়—সুধা বাইরে বের হলে সেখানে সৃষ্টি হলো ক্ষুধা। আপনি তৃষ্ণার্ত হলেই সুধা তার সার্থকতা খুঁজে পায়। কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছিলেন—'নর দিল ক্ষুধা নারী দিল সুধা ...'। তবে তিনি ক্ষুধার উৎসটাই যে ছিল সুধা তা বুঝতে পারেননি, যে কারণে তিনি আগে ক্ষুধার প্রসঙ্গটাই টেনেছেন। আসলে আদম (আঃ) এর বুক ভরা ছিল সুধা। আল্লাহ মা হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করতে গিয়ে সেই সুধা টেনে বের করলেন—সেই শূন্যস্থানে সৃষ্টি হলো ক্ষুধা। এখন ক্ষুধা তার সুধাকে খোঁজে; সুধা নিজেকে ক্ষুধার কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিতে চায়। রসুল (সঃ) এটা হাদীসে যৌবনের তৃপ্তিকে সরাসরি সুধা বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে পৃথিবীর তিনটা জিনিস তিনি পছন্দ করেন—সুগন্ধি, প্রার্থনা, এবং নারী। কত সম্মানের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন তিনি নারীকে। তাঁর কাছে নারী গণ্য হলো প্রার্থনার

www.pathagar.com

গুরুত্বে! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর মাথা মোবারকটা ছিল মা আয়েশা (রাঃ) এর বুকের ওপর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আল্লাহর অলিগণ সাধনার মাধ্যমে যখন পার্থিব মায়া থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত বাহ্যিকতার মেকিত্ব থেকে মৃত্যুবরণ ক'রে, আল্লাহর সান্নিধ্যে বেঁচে ওঠেন, তখন তাঁরা তাঁদের ভেতরেই সব খুঁজে পান। এরূপ আত্মাকে সম্বোধন ক'রে আল্লাহ বলেছেন—হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রশান্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। (সূরা ফযর, আয়াত : ২৭-২৮) তাঁদের অন্তর আর দোলায়িত হয় না। তাতে বিরাজ করে পরম প্রশান্তি এবং তৃপ্তি। তাদের মাথা নত হয়ে যায়। তাদের মনে তখন এমন তৃপ্তি বিরাজ করে যা নারী-পুরুষের বৈধ এবং তৃপ্তিময় মিলনের শান্তি অপেক্ষা একশ' গুণ বেশি তৃপ্তিময়! কারণ তারা তখন মানসিক ভারসাম্যের আদমীয় স্তরে উন্নীত হন। তখন তাঁদের নিকটতম প্রতিবেশী থাকেন একমাত্র আল্লাহ। এর উপরের স্তরে আছে মুহাম্মদ (সঃ) এর হৃদয়, যা সর্বদা প্রেমময়, অসীম মাত্রার সাথে প্রগাঢ় তৃপ্তিতে একাকার। এই স্তরে ওঠবার সাধ্য কারো নেই, আল্লাহ যাকে করুণা করেন তিনি ছাড়া। তাঁর হৃদয়ের সাথে যিনি মিলিত হতে পারেন এবং তাঁর জ্ঞানসমুদ্রের এক ফোটা পান করতে পারেন, তিনিই তাঁকে সর্বাধিক চিনতে পারেন। তিনি তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যান। এজন্য রসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন—আমার মতো আরো মুহাম্মদ আছে, আদমের মতো আরো আদম আছে। এই হাদীসের রহস্য একমাত্র আল্লাহর অলিগণের মধ্যে তাঁরাই জানেন যাদের হৃদয়কে প্রশস্ত ক'রে দেয়া হয়েছে। অনেক ধর্মে হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলনের এই রহস্য ঠিকমতো ব্যাখ্যা না করতে পেরে বলা হয়েছে যে যুগে যুগে একই ব্যক্তি ধর্মপ্রচারের জন্য দেহধারণ ক'রে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এভাবে এসেছে পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ। কিন্তু না। এই একত্ব দেহের নয়, হৃদয়ের। এ হলো ধাপে ধাপে স্তর থেকে স্তরে ওঠার রহস্য। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

> নিশ্চয় তোমরা এক স্তর থেকে অন্যস্তরে আরোহন করবে।
>
> (সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১৯)

যাহোক, নারী হলো পুরুষের ভেতরটার বহিঃপ্রকাশ। পুরুষের ক্ষুধা সুন্দর, তাই নারী সুন্দর। তাই তো পুরুষ যা চায়, নারী তা চায় না, তা *দিতে* চায়। এই বৈপরীত্বই মিলনের ফর্মুলা। এতেই নিহিত সমস্ত রহস্য। পবিত্র কোরআনে নারী-পুরুষের গতিবিধির এই বৈপরীত্বের কথাটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অথচ সংক্ষেপে বলা হয়েছে :

> শপথ তাঁর যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।
>
> (সূরা লাইল, আয়াত : ১-৪)

www.pathagar.com

এর পরও আপনি কিভাবে কামনা করেন যে আপনি যা চান আপনার স্ত্রীও যেন তাই চায়? তাহলে তো আপনার আনন্দই ধ্বংস হবে। আপনি চান একটা মেয়েকে বিয়ে করতে? তাহলে কি আপনার স্ত্রীকেও বলছেন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে? পশ্চিমা বিশ্বে লেসবিয়ানদের অবস্থা কী হচ্ছে তা দ্যাখেননি? তারা তো নারী-নারী বিয়ের বা যৌনমিলনের পক্ষপাতী। তারা কি বিভ্রান্ত নয়? তারা কি তৃপ্তি পেয়েছে কোনোদিন? পশ্চিমা বিশ্বে পুরুষে-পুরুষে বিয়ের আন্দোলনও চলছে, যা, কোরআন বলছে, শুরু হয়েছিল হযরত লূত (আঃ) এর যুগে, যে অপরাধে ধ্বংস করা হয়েছিল সেই জনপদকে—আজও সেই ধ্বংসাবশেষ 'ডেড সী' এবং জর্ডান নদীর রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

এগারো

পরকীয়ার রহস্য

নারীর রহস্য জানা গেল। জানা গেল স্ত্রীর রহস্য। এবার জানা দরকার পরকীয়া প্রেম এবং অবৈধ যৌনতার রহস্য। পরকীয়া এবং অবৈধ যৌনতাকেই মানব মন সচরাচর বেশি তৃপ্তি পায়। যারা এই তৃপ্তির সন্ধান করে, তাদের কোনো বিশেষ জাত নেই— মানবের বৈশিষ্ট্যই এরূপ। যারা এতে অন্ধের মতো আসক্ত হয়ে আছে তাদের ওপর আইন এবং শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য। তবে মন যদি কোনো কাজ কেন করতে হবে বা হবে না তার ব্যাখ্যা না পায় তাহলে তার পক্ষে একটা নির্দিষ্ট পথে চলাও দুঃসাধ্য হয়ে যায়। পাঠক/পাঠিকা নিশ্চয়ই নিজের মনের দিকে তাকিয়েও এই কঠোর এবং কুৎসিত সত্যটা বুঝতে পারবেন।

পরকীয়ার সাথে লুকোচুরি এবং চৌর্যবৃত্তির সম্পর্ক আছে ব'লে, তার সাথে নতুনত্বের ছোঁয়া লেগে আছে ব'লে, তার সাথে 'গতানুগতিক' ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে 'প্রগতি এবং মুক্তির' দিকে এগিয়ে যাবার অনুভূতি জড়িত আছে ব'লে, তা মানুষের বেশি ভালো লাগে। এ থেকে মানুষকে আইন প্রয়োগ ক'রেও সরানো সম্ভব নয়, যদি না তাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া যায় তা কেন মধুর এবং কতটুকু।

পরকীয়ার রহস্য এমনই যে তা কেন মধুর তা যে-ব্যক্তি জানবে, সে চিরকালের মতো তার স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য তওবা করবে! আমরা এমন অনেক কিছুতেই আনন্দ পাই যাতে কেন আনন্দ পাই তা জানলে তাতে আর কোনোদিন আনন্দ পেতাম না।

অনেক নর-নারীই পরচর্চা বা পরনিন্দা করতে পছন্দ করে। কেন করে? কারণ তাতে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শাস্তি পাওয়া যায়। দোজখ মানুষের খুব নিকটে। সে তাকে এত প্রবলভাবে কাছে টানে যে মানুষ তার আকর্ষণে দোজখের উপযুক্ত কাজ আনন্দের সাথেই করে।

... আমি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তারা যা করছে তা শোভনীয় করেছি।

(সূরা আন'আম, আয়াত : ১২২)

www.pathagar.com

তবে গোশতের রহস্য আমি এখন বলব না। যাহোক, কেউ যদি এই সত্য স্পষ্টভাবে জানতে পারে, তাহলে কি সে পরনিন্দা করবে?

পরকীয়া মানে নিজের লাশের পঁচা মাংস খাবলে খাওয়া। নিজের মাংস নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু, তা না হলে তা কি কেউ খেত?

অবশ্য মনের নিজস্ব কিছু প্রশ্ন আছে—সুন্দরকে দেখা বা পাওয়া কেন দোষের? যৌনতার জন্য 'বিশেষ পুরুষের সাথে বিশেষ নারী' এরূপ আবশ্যিক জোড় সম্পর্ক আল্লাহর তরফ থেকে বেঁধে দেয়া হলো না কেন? তাহলে আর ভুল হতো না। প্রত্যেকটা তালার যেমন নিজস্ব চাবি থাকে, তেমনি প্রত্যেক নারীর জন্য থাকত বিশেষ পুরুষ; অন্য কোনো জুটি কাছাকাছি হলেও তাদের মধ্যে প্রেমবিনিময়ের ইচ্ছাও জাগত না। কিন্তু আমি যে-নারীর দিকেই তাকাই, তাকেই তো আমার ভালো লাগে। তাহলে কিভাবে আমি প্রমাণ পাব তার সাথে প্রেম করা আমার জন্য নিষেধ?

প্রশ্নগুলো করেছিল আমার এক সদ্য-পরিচিত কমুনিস্ট বন্ধু।

লজ্জার বালাইটা তার ঠোঁটে একটু কম আছে দেখে আমিও কিছুটা নির্লজ্জের মতো প্রশ্ন করলাম—আপনার মায়ের চেহারা কেমন?

তিনি একটু দ'মে গেলেন। বললেন—কেন?

বললাম—বলেনই না, শুনি।

ভালো। সবাই বলে মা বয়েসকালে খুব সুন্দরী ছিল।

তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন। সবাই তার নিজের মাকে সুন্দরী বলতে চায়। মেয়েরা তো বটেই।

তখন আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এমন একটা মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—এই মহিলাকে দেখতে কেমন?

তিনি এক নাগাড়ে স্থির হয়ে মহিলার দেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পলক আর পড়ে না। খানিক পরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললেন—আহ্! অপূর্ব সুন্দরী! একটু মোটাসোটা হওয়াতে দেখতে বেশ মোলায়েম। ভরাট দেহ ... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তার মুখে লাগাম দেয়া নেই দেখে তাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য প্রশ্ন করলাম—আপনার মা কি এনার চেয়েও সুন্দর?

তিনি একটু হতাশ এবং বিরক্ত হলেন। পাল্টা প্রতিবাদ জানালেন—মায়ের সাথে এ মহিলার কিসের আবার তুলনা?

বললাম—আমি অবশ্যই যৌন অনুভূতির সাথে মিশিয়ে সৌন্দর্যকে ইঙ্গিত করিনি। আপনিই সেভাবে ধ'রে নিয়েছেন। বলেন দেখি, কেন আপনি আপনার মায়ের সাথে এই মহিলাকে তুলনা করতেই ক্ষেপে গিয়েছেন?

www.pathagar.com

মায়ের দিকে কি কেউ ওভাবে তাকায় নাকি?—তিনি বললেন।

কিভাবে তাকানোর কথা বলছেন আপনি?

ঐ যে, যেভাবে তাকালাম; সৌন্দর্য দেখার জন্যে।

কিন্তু আপনি তো বলেছেন যে আপনার মাও খুব সুন্দর।

সে তো অন্য সেন্‌সে।

বললাম—দেখেন, ঘাবড়াবেন না বা রেগে যাবেন না। এসব ক্ষেত্রে তো তারাই রেগে যায় যারা মনে করে যে এসব ক্ষেত্রে তাদের রেগে যাওয়া উচিত।

তাহলে কি আমারও রেগে-যাওয়া উচিত না? পথে-ঘাটের সবাইকে যদি মা বলতে হলো, তাহলে মানুষ আর বিয়ে-সাদি করতে পারত না।

ঠিক বলেছেন। একথা ইসলামই বলে। একদল সাহাবা ভুলক্রমে তাদের স্ত্রীদেরকে মায়ের সাথে তুলনা করেছিলেন ব'লে সে ব্যাপারে কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছিল। বলা হয়েছিল—ওটা তোমাদের মুখের কথামাত্র।

> তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণকে মায়ের সাথে তুলনা করে, (তারা জেনের রাখুক যে) ওরা (অর্থাৎ তাদের স্ত্রীগণ) তাদের মা নয়। যারা তাদের জন্মদান করে, কেবল তারাই তাদের মা। ওরা তো অসঙ্গত এবং ভিত্তিহীন কথাই বলে। (তবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। (সূরা মুজাদালা, আয়াত : ২)

> আল্লাহ্ কোনো মানুষের দুটি হৃদয় তৈরি করেননি, তোমরা তোমাদের পত্নীগণের মধ্যে যাদের মাতৃসম্বোধন করেছো, তাদেরকে (আল্লাহ্) তোমাদের মাতা করেননি, এবং তোমাদের পোষ্য-পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি : এ তোমাদের জন্য মৌখিক বাক্য মাত্র, এবং আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন, তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।
> (সূরা আহ্যাব, আয়াত : ৪)

ইসলামেই বিয়ে ব্যাপারটাকে বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে, অথচ অবৈধ যৌনতাকে প্রচণ্ড কঠোরতার সাথে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের চোখের গোপন চাহনির ব্যাপারেও আমাদেরকে পরকালে প্রশ্ন করা হবে।

> আল্লাহ্ চোখের গোপন ছলনা সম্পর্কে জানেন, এবং মানুষের হৃদয় যা গোপন করে, তাও।
> (সূরা মু'মিন, আয়াত : ১৯)

> তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। (সূরা আন'আম, আয়াত : ১২০)

তিনি ক্ষেপে উঠলেন : ইসলাম ধর্মের নামটা শুনলেই তিনি ওভাবে ক্ষেপে গিয়ে থাকেন—এর সাথে আবার ইসলামের কী সম্পর্ক? কিসের মধ্যে কী?

www.pathagar.com

বললাম—দেখেন, আপনি আপনার মাকে বর্ণনা করার জন্য একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'সুন্দর'; আপনি একটু আগে পাশ-দিয়ে হেঁটে-যাওয়া মহিলাটাকে বর্ণনা করতেও সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'সুন্দর'। অথচ দুই 'সুন্দর' এর ব্যঞ্জনা দুরকমের। একটা প্রকাশ্য বর্ণনা, একটা গোপন ইঙ্গিত। আপনাকে কি আমি বলেছিলাম 'এই মহিলার দিকে সেভাবে তাকাবেন না যেভাবে আপনি আপনার মায়ের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত?' বলিনি। আমি শুধু একটাই প্রশ্ন দ্বারা দুজনকে ইঙ্গিত করেছিলাম। আপনিও উভয় ক্ষেত্রে একই জবাব দিয়েছেন। কিন্তু আপনি যে একই শব্দকে দুই ক্ষেত্রে দুই অর্থে ব্যবহার করবেন এ কি আমার জানার কথা? জানলেও দায়-দায়িত্বটা কি আমার? আপনি আপনার মাকে যে-চোখ দিয়ে দেখেছেন, এই মহিলাকেও সেই চোখ দিয়ে দেখেছেন। অথচ আপনি আপনার মায়ের সৌন্দর্য চিত্রকে মনের যে-পটে এঁকেছেন, এই মহিলার সৌন্দর্য চিত্রকে সে-পটে আঁকেননি। কেন? কে আপনাকে যুগে যুগে বলেছে যে মায়ের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়? কোনো বিজ্ঞান বা ডাক্তার তা বলেনি। তা বলেছে একমাত্র ধর্ম। তা প্রচলিত হয়ে রয়েছে প্রথা আকারে—পৃথিবীর সব সভ্য সমাজে, পশু বাদে। আপনি কিন্তু নিজের অজান্তেই ধর্মকে মেনে নিয়েছেন। কোনো বিজ্ঞানী বা ডাক্তারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ব'সে থাকেননি, যদিও নাস্তিকরা ধর্মের বিধানকে বিজ্ঞান দ্বারা যাচাই করতে গিয়ে, নিজেরা বিজ্ঞান কম জানার কারণে এবং বিজ্ঞানের অদ্যাবধি চূড়ান্ত কোনো স্তরে না পৌঁছাতে পারার কারণে, ধর্মকে ত্যাগ করে; তারা বলে আগে বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম প্রমাণিত হোক, তারপর ধর্ম মানব। তাহলে তারা কি বিয়ের যে বিধান ধর্ম থেকে এসেছে তা বাদ দেবে?

মায়ের দিকে যে কৌণিক দৃষ্টিতে তাকানো যায় না, একথা কেউ কোনোদিন কোনো মানবসন্তানকে শিখিয়ে দেয়নি। অথচ মানুষ মায়ের সৌন্দর্যকে চিরকাল ভালোই বেসেছে, প্রশংসা করেছে; তার গায়ের ঘ্রাণটা তার কাছে চিরকালই সুধাময়। তার এসব অনুভূতিতে আকস্মিকভাবেও যৌনতা চ'লে আসেনি। কারণ মা এবং ছেলের মধ্যে, বাবা এবং মেয়ের মধ্যে, ফুফু ভাতিজা, খালা ভাগ্নে ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা 'প্রাকৃতিক দেয়াল' দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা হয়েছে যে সেসব ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রগাঢ়তা বা নিবিড়তাও যৌনতাকে আশ্রয় করে না। মহান স্রষ্টা যে-সব ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক দেয়াল গ'ড়ে রেখেছেন, সে-সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকেও তিনি নিষিদ্ধ করেননি, এবং বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন। ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে যৌনতা স্বাভাবিকভাবে আসে না ব'লে তাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা নিষিদ্ধ নয়। অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ—কারণ আল্লাহ যৌনতাকে কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও পর্দা দিয়ে ঢেকে দেননি, তাকে ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন ক'রে রেখেছেন। যৌনতার সুযোগ যদি

www.pathagar.com

সার্বজনীন না হতো, তা যদি এক-চাবি-এক-তালার মতো নির্ধারিত হতো, তাহলে প্রত্যেক নর-নারীকে তার স্ত্রী বা স্বামীকে খুঁজতে গিয়ে সারা পৃথিবী চ'ষে ফেলতে হতো। উপযুক্ত তালার উপযুক্ত চাবি না পেলে বন্ধ তালা কোনোদিন খোলা যেত না, চাবিও কোনো কাজে আসত না। তখন ধর্ষণ-পরকীয়া থাকত না, থাকত শুধু আত্মহত্যা।

প্রাকৃতিক দেয়াল নেই বলেই আপনি এই মহিলার দিকে মার্যিতভাবে মাত্র একটা পলক তাকাতে পারেননি। অথচ ভুলক্রমে আপনি যদি কোনোদিন আপনার ঘরে ঢুকে দেখেন যে আপনার মা বা বোন কাপড় বদলাচ্ছে, এবং আকস্মিকভাবে তাদের সৌন্দর্যের গোপন কোনো অংশ যদি আপনার নজরে প'ড়ে যায়, তাহলে আপনার চোখ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি একটু পরেই ভুলে যাবেন কী দেখেছিলেন। কারণ আপনার মন সেই দৃশ্যকে প্রশ্রয় দেয়নি।

আপনাদের নগ্নতার আর্টিস্টরা কাকে বলে সৌন্দর্য? নারীর দেহকে। ভালোই তো। নারীর দেহকে কোরআনে সুন্দরই বলা হয়েছে, অসুন্দর নয়।

> তিনি আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ক'রে দিয়েছেন বিশ্রামস্থল এবং আকাশকে আবরণস্বরূপ, এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন আকৃতি এবং তোমাদের **আকৃতিকে করেছেন সুন্দর**, এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন জীবিকা–পবিত্র এবং সুন্দর জিনিস থেকে। আল্লাহ্ এমনই, তোমার প্রতিপালক। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬৪)

> নারী, সন্তান, বাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট **সুন্দর** ও **লোভনীয়** করা হয়েছে–এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ–তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল রয়েছে।
> (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪)

তাই ব'লে তা নিয়ে সার্বজনীনভাবে প্রদর্শনকাজ চালাতে হবে নাকি? আপনি তো বিয়ে ক'রে সেরূপ একটা দেহই দেখবেন যা আপনার মায়ের ক্ষেত্রে আপনি দেখতেই চাননি—মুহূর্তের মধ্যে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছেন। অথচ আপনি নিজেই হলেন সেই দেহের প্রতিটা বিন্দুতে লুকানো ক্ষুধার মন্থনের ফল। তার দেহের সাথে আপনার বাবার চেয়ে আপনার সম্পর্ক আরো নিবিড়। এমনটা যদি হতো যে কোনো মায়ের সাথে তার ছেলের যৌনক্রিয়া সম্ভবই নয়—তাদের দৈহিক গড়ন এমন হতো যে চেষ্টা করলেও সেক্ষেত্রে যৌনক্রিয়া চলতে পারত না, ঠিক আপনার ভিন-তালা ভিন-চাবির মতো, তাহলে আমি ধর্মের বিধানের প্রসঙ্গ তুলতাম না। সেক্ষেত্রে অসম্ভাব্যতাই হতো বিধান। কারো কোনো দুশ্চিন্তা থাকত না। কিন্তু যৌনতা পুরোপুরি ইউনিভার্সাল। গ্রীক সভ্যতার যুগে সফোক্লেস তার 'ইডিপাস রেক্স্' নাটকে যে মূল ঘটনাটা এনেছেন তাতে নায়ক

www.pathagar.com

তার মাকেই বিয়ে করে এবং তার গর্ভে একাধিক সন্তানও জন্ম দেয়। ছেলে জানত না সে মাকে বিয়ে করেছে, মাও জানত না সে ছেলেকে বিয়ে করেছে। কই, তাদের জানা-না-জানা তো তাদের যৌনতাকে আটকায়নি। অথচ কেউ তার মায়ের নগ্ন দেহ ভুলক্রমে দেখে ফেললেও তো তার মনে যৌনতা জাগে না।

দেহ এবং যৌবন ইউনিভার্সাল ব'লে তা নিয়ে নগ্নতার মহড়া দিলে মাকেও অপমান করা হয়। চিত্রকররা তো তাই-ই করছে। তারা কিছুই গোপন করছে না। যা প্রকাশ্য, অথচ তাকে সব ক্ষেত্রে প্রকাশ করাও যায় না, তা ইউনিভার্সাল ব'লে তাকে পর্দার আড়ালে রাখতে হয়। নারীদেহ প্রত্যেক পুরুষের জন্য, অথচ প্রত্যেক পুরুষকে নির্দিষ্ট দেহ বেছে নিয়ে পর্দার আড়ালে লুকাতে বলা হয়েছে। 'প্রাকৃতিক দেয়াল' মনের আবশ্যক ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন, তিনি বিধান দ্বারা বাকিটা—অর্থাৎ দেহের পর্দাটা আপনাকেই করতে বলেছেন।

তবুও সেই মনের পর্দাও কিন্তু ভঙ্গুর। কেউ স্বেচ্ছায় তা ভাঙতে চাইলে তাও ভাঙতে পারে। দেহ তা ঠেকাতে পারে না। শোনা যায় ফরাসি কবি বোদলেয়ারের নাকি গল্পকার মঁপাসাঁর সাথে তার মায়ের এবং প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে তার বোন ডরোথির গোপন যৌন সম্পর্ক ছিল। হাদীসে আছে যে শেষ যুগে এরূপ অবৈধ সম্পর্কের ছড়াছড়ি দেখা যাবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির শীতলতার কথা বলেছেন, কিন্তু তার নিজের মনে কি শীতলতা ছিল? তার প্রত্যেকটা কবিতার প্রত্যেকটা পংক্তিই ব'লে দেয় যে তিনি হাফ ছাড়ছেন—অর্থাৎ তিনি একটু আগেই হাফাচ্ছিলেন। তার অস্থিরতা ছিল তুঙ্গে, হতাশা ছিল চরমে, আবেগ ছিল বাধাহীন। এ কারণে একটু দখিনা বাতাস লাগলেও তার জিহ্বায় পানি চ'লে আসত, কবিতা-ভেজা পানি। বোদলেয়ার জীবনেও সুস্থ কবিতা লেখেননি। তিনি ছিলেন চরম অস্থির এবং পুরোপুরি রিপুর দাস। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রশান্তির কথা বলতে গিয়ে একটু আগের ছটফটানির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর বোদলেয়ার ছটফট করতে করতে ব্যর্থভাবে শীতল হওয়ার আশা পোষণ করেছেন। তারা সামান্য দৈহিক যৌনতার মধ্যে খুঁজতে চেয়েছিলেন গোটা আমিত্বের তৃষ্ণার সুধা। তারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে মানুষ যৌনতার দাস নয়, যৌনতাই মানুষের দাস। দাসকে দিয়ে পূর্ণ কাজ আদায় করতে হলে তার ওপর প্রভুত্ব করা চাই। দাস একমাত্র তার প্রভুকেই পূর্ণ সেবাটুকু দিয়ে থাকে, অন্য কোনো দাসকে বা তার অধীন কাউকে নয়।

যৌনতা ইউনিভার্সাল ব'লে চোখকে সাবধান করতে বলা হয়েছে। যে-কোনো নারীই পুরুষের কাছে কমনীয়। অর্থাৎ বাহ্যিক সৌন্দর্য বাধাহীন। অথচ অন্তরের সৌন্দর্য নিয়মাধীন ব'লে এই দুইকে মেলাতে গিয়ে বাইরেরটাকে নিয়মাধীন করতে হবে। যারা

www.pathagar.com

শুধু বলে 'সব ভালো মনের কাছে' তারা নিজেরাই জানে যে তাদের দেহ তাদের মনকে দখল করেছে ব'লে কথাটা দিয়ে তারা নিজেদেরকে শান্ত্বনাই শুধু দেয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণহীন উদভ্রান্তরা তাদের অস্থিরতাকে সৃজনশীলতার সাথে জড়িত করে। তাদের ফ্যাশান হলো অস্থিরতা, উছিলা সৃজনশীলতা। তারা অস্থিরতায় প্রতিযোগিতা ক'রে দেখাতে চায় যে তারা সৃজনশীল। অথচ সত্য বলতে কি, আমি আপনাকে এমন লোকের পরিচয়ও দিতে পারি যার সৃজনশীলতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মেধার পর্যায়ে ফেলা যায়, অথচ তিনি জানেন যে সেই সৃজনশীলতাকে অস্থিরতার মধ্যে প্রকাশ করলেই তার অপব্যবহার হবে, এজন্যে তাকে তিনি ব্যবহার করেন সৃজনশীলতার স্রষ্টাকে বোঝার জন্য। এখন থেকে এক হাজার থেকে আটশ' বছর আগ পর্যন্ত এরূপ লোকের সংখ্যা ইসলামী জগতে এত বেশি ছিল যে ততগুলো শ্রেষ্ঠ মেধা পশ্চিমা বিশ্ব বিগত ছয়শ' বছর ব'সেও জন্ম দেয়নি। আমি আল্লাহর মারেফতধারী আউলিয়াদের কথা বলছি। বিশ্বাস করেন আর না করেন, জগতের শ্রেষ্ঠ মাপের বিজ্ঞানী হতে পারত এমন মেধাও আছেন যারা এখনও নির্জন জীবন বেছে নিয়েছেন, কেবল তাদের প্রভুর জন্য। তারা জেনেছেন যে সৃজনশীলতার উৎস অস্থিরতা নয়, অস্থিরতা তার একটা প্রকাশমাত্র। এ কারণে অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিলে সৃজনশীলতা বাড়ে না—সৃজনশীলতার সংজ্ঞাতে যতটুকু পরিমাণে বিভ্রান্তি জড়িত আছে, ততটুকু পরিমাণে মনে হতে পারে যে তা বেড়েছে। এ আসলে মনের ভুল, যা পরে প্রকাশ পেতে বাধ্য। পবিত্র কোরআনে উদ্‌ভ্রান্ত কবিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> আমি কি তোমাকে জানাব কার প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটা ঘোর বিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে, এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারাই যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার ক'রে থাকে। এবং ওরা যা বলে তা করে না। তবে তাদের কথা আলাদা যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ... (সূরা শুয়ারা, আয়াত : ২২১-২২৭)

> তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? ... তুমি কি মনে কর যে ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুর মতোই, বরং ওরা আরো অধম। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৪৩-৪৪)

> ... শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, যারা পাষাণ হৃদয়। সীমালঙ্ঘনকারীরা অশেষ মতভেদে আছে।
> (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৩)

কোরআনে পথ-প্রাপ্ত কবিদেরকে প্রশাংসাও করা হয়েছে।

আপনি এখন একটা মহিলার দিকে তাকিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। কিন্তু যার মধ্যে পুরুষত্ব শক্তি নেই, সে পাচ্ছে না। যেমন একজন হিজড়ে বা অন্য একজন নারী তা

www.pathagar.com

পাচ্ছে না। আপনারই শরীরের পুরুষত্ব শক্তিকে এখন যদি ওষুধ প্রয়োগ ক'রে নষ্ট ক'রে দেয়া হয়, এবং হরমোন থেরাপির মাধ্যমে আপনার দেহে নারী হরমোন ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আপনি আর নারী দেখে সুড়সুড়ি পাবেন না।

তাহলে নারী আসলে আছে কোথায়?

আপনারই দেহ-মনে।

নারী রয়েছে আপনার ভেতরে।

... তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদের মধ্য থেকে চতুষ্পদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন ...
(সূরা শুরা, আয়াত : ১১)

তবে আপনার ভেতরে আপনি তাকে খুঁজলেও পাবেন না। কৌশল হলো—তাকে বাইরে ততটুকু খুঁজুন যতটুকু শরীয়তে খুঁজতে বলা হয়েছে। তাহলে ভেতরটা এমনিতেই গাঢ় হয়ে যাবে। বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না, এবং মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত পুরস্কার রয়েছে পরকালে।

এই পার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

নারী, সন্তান, বাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর সুশিক্ষিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর ও লোভনীয় করা হয়েছে–এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ–তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল রয়েছে।
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪)

... তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ তাকান পরকালের দিকে ... (সূরা আন্‌ফাল, আয়াত : ৬৭)

বাইরে থেকে পরকীয়া বাদ দিতে হবে। তাহলে ভেতরে পাওয়া নারীর মধ্যেই এমন না-পাওয়া তৃপ্তি পাওয়া যাবে যা আপনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি। **কেউ যখন একবার খাওয়ার পরও আবার খাবার দেখলে খেতে চায় তখন কী বুঝতে হবে? তখন বুঝতে হবে যে সে প্রথমবারের খাওয়াতে আসল তৃপ্তিটুকু পায়নি। এখানে খাদ্য বড় কথা নয়। বড় কথা হলো তৃপ্তি। ভোগ বড় কথা নয়। বড় কথা হলো উপভোগ। আর উপভোগের সাথে খাদ্য জড়িত নয়, ক্ষুধা জড়িত। ভরা-পেটে আপনি যে-খাদ্য খাবেন, সেই একই খাদ্য ক্ষুধার্ত পেটে খেলে অনেক বেশি তৃপ্তি পাবেন। ক্ষুধার তীব্রতাই খাবারে স্বাদ এনে দেয়। শুধু ক্ষুধার তীব্রতাই নয়, ক্ষুধার প্রগাঢ়তাই আসল কথা।**

তাহলে কি স্ত্রীর কাছে যাবার ব্যাপারে সংযম পালন করতে হবে? তার কাছে খুব কমই যেতে হবে?

www.pathagar.com

একদম না। এই ভুলটা করে না-বুঝ হুজুররা। তাতে তাদের দেহ-মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মেজাজ থাকে তিরিক্ষি। তাতে তারা শুধু ক্ষুধার্ত হয়, তৃষ্ণার্ত হয় না। তাই যখন নারীর কাছে যায়, তখন তাকে এক প্লেট খাদ্যবস্তু ব'লে মনে করে। **নারী শুধু ভোগের এবং খাবার জন্য নয়, উপভোগের এবং পানীয়ের জন্যও। আপনি শুধু ক্ষুধা মেটাবেন, তৃষ্ণা মেটাবেন না, তাহলে তো আপনার ক্ষুধার মধ্যেও বিকৃতি চ'লে আসবে।** রসুলল্লাহ (সঃ) নারীগমনকে নির্ঝঞ্ঝাট খেলা হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।

তাহলে কী করতে হবে?

বিকৃতি কমাতে হবে। তাহলে ভালো লাগার গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরনারীর দিকে দৃষ্টি এবং মন দিয়ে দিয়ে যার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, সে নিজের স্ত্রীর কাছে যখন যায় তখন নিজেকে পুরোপুরি খুঁজে পায় না, ভেতরের নারীটাকেই গোছগাছ করতে পারে না, এবং ফলে বাইরের নারীকেও পূর্ণাঙ্গভাবে পায় না। পরকীয়া মানেই স্ববিরোধিতা। পরকীয়াতে আসক্ত পুরুষ এবং নারী উভয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

সূর্য চাঁদকে এবং পৃথিবীকে বলল—তোমরা উভয়ে আমার চারদিকে ঘোরো।

পৃথিবী বলল—রাজি।

চাঁদ বলল—রাজি।

কিন্তু পৃথিবী চাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ ক'রে বলল—তুমি শুধু আমার চারদিকেই ঘুরবে। এটাই তোমার বিধান। তোমার নিয়মকে তুমি লঙ্ঘন করতে পার না।

এসব শুনে সূর্য মুচকি হেসে বলল—আমিই তোমাদের উভয়ের কেন্দ্র। অর্থাৎ আমার চারদিকে ঘোরার মধ্যেই তোমাদের ঐক্য নিহিত। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে পার না।

কিন্তু আদেশের নৈকট্যই আদেশের বৈধতা নির্ণয় করে। পৃথিবী মেনে নিল সূর্যের আদেশ আর চাঁদ মেনে নিল পৃথিবীর আদেশ।

কারো ঐক্য বিনষ্ট হলো না।

চাঁদ চলল একদিকে অথচ দুই মনিবের দাসত্ব করতে তার কোনো সমস্যা হলো না।

চঁদ ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। তাই সে ঘুরল কেবল পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী ঘুরল সূর্যের চারদিকে। এভাবে চাঁদও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চারদিকেও ঘুরতে থাকল। কেন্দ্র সন্তুষ্ট হলো।

কেন্দ্রের সাপেক্ষেই তারই **ঐক্যের বা তাওহীদের** ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে উপকেন্দ্রগুলো। এদিকে উপকেন্দ্রের পরিবেশের গতিবিধি এবং নিয়ম নির্ধারিত হয় তার

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রভাব দ্বারা। অথচ এর ফলে কোনো অরাজকতার সৃষ্টি হয় না। কারণ উপকেন্দ্রের আনুগত্য যার প্রতি, তার প্রভাবক্ষমতাও আসে তার থেকে। এ কারণে লক্ষ-কোটি তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ডের বিচিত্র পথচলার ফলেও কোনো অনাকাঙ্খিত সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না। যা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটে, তা ফর্মুলারই অংশ—তা মানুষের কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আকাশমণ্ডলীর পরিচালনব্যবস্থার ফর্মুলার মধ্যে মানুষের আচরণও অন্তর্ভুক্ত। তাকে এজন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন মানুষ তারই কৃতকর্মের ফাঁদে আটকা পড়ে :

আল্লাহ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন **এই উদ্দেশ্যে যে, যেন** প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে। (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং (পরিমাপের জন্য) ভারসাম্য স্থাপিত করেছেন। **যেন** তোমরা পরিমাপে বৃদ্ধি না কর (ভারসাম্য লঙঘন না কর) ন্যায্য ওজনের মাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিয়ো না। (সূরা রহমান, আয়াত : ৭-৯)

আসমান উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, এবং ফেরেস্তাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা শুরা, আয়াত : ৫)

আল্লাহ যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, **যেন** প্রত্যেক মানুষ তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২২)

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রতিশ্রুতি। আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় এ তোমাদের বাক্যালাপের মতোই সত্য।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২)

আমি আমার ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি, এবং আমি অবশ্যই মহাক্ষমতাশালী।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭)

... তিনি জানের—যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও ভূমি থেকে নির্গত হয়, এবং আকাশ থেকে যা বর্ষিত হয়, এবং আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় ... (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৪)

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (সূরা ফাবির, আয়াত : ৪৫)

www.pathagar.com

আমি আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই ... (সূরা সাদ, আয়াত : ২৭)

গোটা মানবজাতি সৃষ্ট হয়েছে একটামাত্র আত্মা থেকে। সেই আত্মায় ছিল অসীম বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্যের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের শক্তির বদৌলতে। নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করার ফলে তাওহীদের প্রত্যক্ষতা নষ্ট হলো। আগে আদম-হাওয়ার (আঃ) হৃদয় সরাসরি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পরে তাওহীদ বা ঐক্যের মধ্যে পরোক্ষতার সৃষ্টি হলো। কিন্তু আদম-হাওয়ার (আঃ) ভুলও কিন্তু মূল তাওহীদের বা ঐক্যের বাইরে ছিল না; এই পদস্খলনও ছিল তাওহীদের অন্তর্গত। অন্য কথায়, নিয়মকে যতই লঙ্ঘন করা হোক, তা সার্বিক নিয়মাবলীর আন্তঃসম্পর্কের ঐক্যকে নষ্ট করে না—ঐক্যের নিয়মের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তা কেউ লঙ্ঘন করলে তা লঙ্ঘনকারীর জন্য পরিবর্তিত হয়ে তার কর্মফলকে তার কাছে ফেরত পাঠাবে। গোটা-আকাশ পৃথবী এরূপ ঐক্যের রজ্জু দিয়ে বাধা। নিয়ম-ভাঙ্গা যদি ঐক্যের মধ্যে না থাকত, তাহলে নিয়ম-ভাঙ্গার সম্ভাবনাই সৃষ্ট হতো না কোনোদিন।

কিন্তু ঐক্য যখন পরোক্ষ হয়ে গেল, তখন ঐক্যের কেন্দ্রের প্রতিবিম্ব আকারে এবং তারই প্রশাখা হিসেবে সৃষ্ট হলো বিভিন্ন উপকেন্দ্র। কেন্দ্রের নিয়ম তখন প্রযোজ্য হলো উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে। উপকেন্দ্র তার প্রভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত সবকিছুকে বলল তার নিজের দিকে ঘুরতে বা তারই নিয়মকে অনুসরণ করতে। ফলে একটা উপকেন্দ্রের চারপাশে যা আছে তা তার উপকেন্দ্রের চেয়ে দূরে তাকাতে পারে না। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকে যদি তার উপকেন্দ্রকে—অর্থাৎ নিজস্ব কেন্দ্রকে—অনুসরণ করে, তাহলে এরূপ সব উপকেন্দ্রের সব ঘটনাই মূল কেন্দ্রের বা ঐক্যের পক্ষে পায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এই সব উপকেন্দ্রের সম্বন্ধে যে-বিধান প্রযোজ্য, তাই-ই হলো শরীয়া বা রসুল (সঃ) এর সুন্নাহ। এই আচরণবিধি সর্বদা সার্বিক ঐক্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

আল্লাহ আকাশ এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিকে বলেছিলেন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার বিধানকে মেনে নিতে :

আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সেচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি সিজদায় নত হয়, এবং সকালে ও বিকালে তাদের ছায়ারাও।

(সূরা রা'দ, আয়াত : ১৫)

এই আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সৃষ্ট জীবের অনিচ্ছাও আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ।

তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতি (ভারসাম্য)। (সূরা, রুম, আয়াত : ২৫)

www.pathagar.com

আল্লাহর **অনুমতি** ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

(সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেককে যথাযথ স্বভাব এবং পরিমাপ দান করেছেন।

(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যবর্তীতে যা আছে তা আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১৬)

সেইদিনই আল্লাহর **চূড়ান্ত কর্তৃত্ব** হবে। তিনিই ওদের বিচার করবেন।

(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৬)

তারপর তিনি আকাশকে ও পৃথিবীকে বললেন–তোমরা উভয়ে **ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়** আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। তারা বলল–আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ, আয়াত : ১১)

কি রহস্যময় কথা! **আল্লাহ নিজেই তাদেরকে বিকল্প choice এর সুযোগ দিয়েছিলেন। এটাই প্রমাণ করে যে এই বিকল্প বা সৃষ্টির আপাত-বিদ্রোহও তার ঐক্যের অংশ। অন্য কথায়, সৃষ্টির মুক্ত ইচ্ছাও একটা সীমার মধ্যে তাঁর ঐক্য দ্বারা সমর্থিত।**

তুমি বল, তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই—যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সমানভাবে সকলের জন্য, **যারা এর অনুসন্ধান করে**। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেন—তোমরা উভয়ে **ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হোক**—আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও। ওরা বলল আমরা তো আনুগত্যের সাথেই প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন; এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি প্রথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করলেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

(সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ, আয়াত : ৯-১২)

তাহলে কি যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, **আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সৎপথে চালিত করতে পারতেন?** এবং অবিশ্বাসীরা যা করেছে, তাদের কর্মফলের জন্য তাদের প্রতি নিশ্চয়ই বিপদ উপনীত হবে, অথবা বিপদ তাদের আশেপাশে পতিত হবে। ... নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা রাদ, আয়াত : ৩১)

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা দ্বারা মানুষের মুক্ত-ইচ্ছাকে প্রভাবিত করেন না। মানুষকে স্বাধীনতার সম্মান দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে–অর্থাৎ যারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে বেহেস্ত লাভ করে। যারা তাদের আমিত্ব নিয়ে দূরে থাকে, তাদের দূরত্বই তাদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়।

... কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ দেখালে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৭)

বল, 'সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে'; যে বিশ্বাস করতে চায়, করুক, এবং সে তা অস্বীকার করতে চায়, করুক। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯)

যার হৃদয়কে আমি আমাকে অবহেলা করার অনুমতি দিয়েছি, সে অধীনতা স্বীকার করবে না। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮)

কারণ তিনি মানুষকে পূর্ণ মুক্ত-ইচ্ছা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি কিছুই হাতে রাখেননি। সুতরাং তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না। যে-ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার পক্ষে স্বাধীনতার উৎসকে দোষারোপ করা মানায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে–মানুষ যদি স্বাধীনই হবে, তাহলে ভাগ্যলিপির পরাধীনতা কেন? জবাব হলো–ধর্ম/আল্লাহ্‌কে মানা-না-মানার ব্যাপারে ভাগ্যের পূর্বনির্ধারণ নেই। কিছু ক্ষেত্রে যে-রহস্য আছে, তা সবার কাছে সব মুহূর্তে প্রকাশ করা যাবে না।

মানুষ জন্মগতভাবেই অস্থির ... । (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৭)

কারো আয়ু বৃদ্ধি হলে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে তা তো হয় কেতাব (সংরক্ষিত ফলক) অনুসারে। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১১)

এক পুরুষ থেকেই যাবতীয় নারী-পুরুষের সৃষ্টি। সৃষ্টির আগে সমস্ত নারী-পুরুষই ছিল সেই মহাপুরুষের কামনায়। তার কামনায় একটা নারী ছিল—আল্লাহ নারী সৃষ্টি করলেন। তাঁদের দুজনের কামনায় ছিল সন্তান-সন্ততি—আল্লাহ সেই কামনাকে তাদের জৈবিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। সেই সন্তানদের মধ্যেও একই কামনা জাগল। ঘটল একই ঘটনা। সেই থেকে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আল্লাহ কোরআনেই এ ব্যাপারে মানবজাতিকে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছেন :

তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তা থেকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের মৃত্যুকালে স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই। ... তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা অংকুরিত কর, না আমি তা করি? (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৬৪)

www.pathagar.com

বল–আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল–আল্লাহ্। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

... তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদের মধ্য থেকে চতুস্পদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন ...
(সূরা শুরা, আয়াত : ১১)

আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে নির্গত করেছেন— তোমরা কিছুই জানতে না। তিনিই তোমাদের কান, চোখ, ও **অন্তঃকরণসমূহ** দান করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
(সূরা নহল, আয়াত : ৭৮)

তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ বা নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ এবং পৃথিবীর সৃজন, এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ।
(সূরা রুম, আয়াত : ২২)

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি বা পরিমাপ দান করেছেন। (সূরা ফোরকান, আয়াত : ২)

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহপূর্ণ হও, (তাহলে চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। যেন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই (তোমরা কিভাবে জীবন লাভ করেছ এবং কিভাবে মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থিত হবে)। আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা নিজ নিজ যৌবনে উপনীত হতে পার। তোমাদের মধ্যে (শিশু অবস্থায়) কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং **তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা ভুলে যায়**। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫)

... তারা বলবে কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে? বল–তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবারের মতো সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর ওরা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে—তা কবে? বল—হবে। **সম্ভবত** শ্রীঘ্রই। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দেবে, এবং তোমরা মনে করবে–তোমরা **অল্পকালই** অবস্থান করেছিলে। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৫১)

www.pathagar.com

ওরা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি ওরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? নাকি ওরা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? (সূরা তূর, আয়াত : ৩৫-৩৬)

বল—পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ২০)

প্রত্যেকটা মানুষের কামনা-বাসনার মধ্যেই রয়েছে তার পরবর্তী প্রজন্ম। একটা মেয়ে যখন বড় হতে থাকে, তখন সে স্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখার আগেই স্বপ্ন দেখে মা হবার। সে পুতুলের মা হয়। সে ছোট শিশুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। সচরাচর পুরুষের মধ্যে এই সন্তান-বাসনা এতটা প্রত্যক্ষ নয়। পুরুষ চায় নারী। নারী চায় সন্তান। ফলে পুরুষকে নারীর কাছে কোনোদিন সন্তান ধারণের মতো এত বড় একটা কষ্টের দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুরোধ করতে হয়নি। নারী সে-কষ্ট সইবার জন্য নিজেই পাগল। তার এই কামনার মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম। আদমের (আঃ) হৃদয়ে জেগেছিল একজন স্ত্রীর ক্ষুধা। তাঁর স্ত্রীর হৃদয়ে জেগেছিল নিজস্ব সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে গোটা মানবজাতিকে জন্ম দেয়ার ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার আজও কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনও পুরুষ আদমের (আঃ) মতো এবং নারী হাওয়ার (আঃ) মতো।

এভাবে সব ভবিষ্যৎ মানুষের বর্তমানের মনেই লুকানো রয়েছে। এদিকে সব অতীতও রয়েছে তার মধ্যে—জেনেটিক বৈশিষ্ট্য আকারে।

আপনার মধ্যেই রয়েছেন আপনার মা—আপনার জেনেটিক বৈশিষ্ট্য আকারে। আপনারই মধ্যে রয়েছে জগতের সব নারী-পুরুষের প্রতিচ্ছবি। যিনি আপনার মা, তিনি আপনার হৃদয়ে মা হিসেবেই রয়েছেন। বাইরে আপনার একজন মা আছেন, এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে হৃদয়েও তিনি আপনার মা। বাইরে তার একটা দেহ আছে—সবই আছে যা একজন পুরুষ চায়। কিন্তু একজন পুরুষ কি একটা মা চায় না? সুতরাং তাকে আপনি মা হিসেবে দেখলেই সৃষ্টিজগতের সার্বিক ঐক্য এবং ভারসাম্য রক্ষিত হবে। নইলে তা হবে আপনার নিজের প্রতিই অবিচার। এভাবে বাইরে তিনিই আপনার বোন যিনি আপনার হৃদয়ে বোনের তৃষ্ণা আকারে রয়েছেন। এভাবে ঘনিষ্ট সম্পর্কগুলো বাদে যত মানুষ আছে, তারা সবাই হয় আপনার ভাই না হয় বোন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহর নামের উছিলায় আপনার বিয়ে না হচ্ছে। আপনার বোনের দিকে আপনি যদি কুদৃষ্টি দিয়ে তাকান, তাহলে তার মানে হবে নিজেরই হৃদয়ের ভারসাম্যকে নষ্ট করা।

বরং কোনো একটা নারীকে দেখে আপনি যদি সম্মান এবং ভালোবাসার সাথে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন, এবং দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে কেন তাকাবেন না তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা মনকে দেন, তাহলে একটা রহস্যজনক ঘটনা ঘটবে।

রহস্যজনক ঘটনা।

www.pathagar.com

সেই মহিলা বাইরে থেকে আপনার ভেতরে ঢুকে যাবেন। আপনি তাকে ভেতরেই পাবেন। নিজের আমিত্বের সাথে একনিষ্ঠ আকারে, বোন হিসেবে।

এভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আপনি দেখবেন যে সারা পৃথিবীতে আপনার কোটি-কোটি ভাই, কোটি কোটি বোন। বিশ্বময় আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। বিশ্বময় সব বিশ্বাসী মিলে আপনার জন্য একটাই পরিবার। কোরআন এবং হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে। হৃদয় যখন এই পর্যায়ে চ'লে যায়, তখন তাওহীদ বা আল্লাহর ঐক্যের প্রাথমিক স্তরটাকে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

তখন নিজেকে পাওয়া যায়।

মৃত্যুকে অতিক্রম করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো যায়।

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

অতঃপর আমি বললাম হে আদম! (ইবলিস) **তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু**; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের ক'রে না দেয়, দিলে তোমরা কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি বেহেস্তে **ক্ষুধার্ত হবে না ও বস্ত্রহীন (বা নগ্ন) হবে না**। সেখানে পিপাসার্ত হবে না, এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল–হে আদম! আমি কি তোমাকে ব'লে দেব অনন্ত জীবন দায়ী বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা তার ফল খেল, তখন **তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল**, এবং তারা উদ্যানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো। **এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন**, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। তিনি বললেন–তোমরা **একে অপরের শত্রুরূপে** একই সাথে **বেহেস্ত থেকে নেমে যাও**। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৭–১২৩)

তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩)

হে মানুষ! আমি **তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে**, পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, **যেন** তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

... আল্লাহ—তিনিই পরম বাস্তবতা। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬২)

সত্য যদি ওদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো, তাহলে আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। (সূরা মোমেনুল, আয়াত : ৭১)

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (সূরা ফাবির, আয়াত : ৪৫)

আকাশ এবং পৃথিবী উভয়স্থানেই তিনি আল্লাহ। (সূরা আন্'আম, আয়াত : ৩)

www.pathagar.com

... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।
(সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

যারা অন্ধ এবং যারা দেখে, তারা সমান নয় : তারাও সমান নয়, যারা বিশ্বাস করে এবং ভালো কাজ ক'রে, এবং যারা মন্দ কাজ ক'রে। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ৫৮)

যখন ওদের কারে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠাও, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি।—না এ হবার নয়। এ তো আর একটা উক্তিমাত্র। ওদের সামনে পর্দা থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ৯৯-১০০)

নিয়মিত গভীর ধ্যানের মাধ্যমে এই সত্যটাকে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে হবে। এবং তওবা করার পরে আর একটা ভুলও করা যাবে না।

এই অবস্থায় আপনার যৌনতা চ'লে যাবে যৌনতার নিজস্ব জায়গায়। আপনি আপনার স্ত্রীর/স্ত্রীদের মধ্যে সেই তৃপ্তি পাবেন যা সাধারণ স্বাস্থ্যবান বিশ জন পুরুষ পেয়ে থাকে। কিংবা আরো বেশি। মাঝে মাঝে আপনার ভয় জাগবে—তৃপ্তির প্রবলতায় আপনি মৃত্যুবরণ করেন কি না! সুতরাং সেক্ষেত্রেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। **নিয়ন্ত্রণ যত প্রবল হবে, তৃপ্তি তত আপনার দাসত্ব করবে।** আপনি তাই জানবেন যা কোনো মানব-মস্তিষ্ক জানেনি। হতেও পারে আপনি তাই দেখবেন যা কোনো মানুষ দেখেনি।

... এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ।
(সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২২)

কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের কী নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে আছে।
(সূরা সিজদাহ, আয়াত : ১৭)

আমার সেই কমুনিস্ট বন্ধুটা কোনো কথা না ব'লে সেদিন বিদায় নিল। যে কমুনিস্টরা কথা শোনে, তাদেরকে অনেক কিছুই বুঝানো যায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিছক তর্কের খাতিরে তর্ক করে—অহমিকা!

প্রিয় পাঠক, একটা আসল কথা বলি। একজন সাধক যখন আল্লাহর তাওহীদের প্রথম স্তরটাকে চিন্তায় এবং অনুভূতিতে পুরোপুরি ধারণ করতে পারেন, তখন তিনি সেই স্তরের (উপকেন্দ্রের) সাথে একাত্ম হয়ে যান এবং তাতে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টিকুলের মধ্যে শুধু নিজেকে দেখেন। তিনি আল্লাহর তাওহীদে একাকার হয়ে যান। তিনি নিজেকে চিনতে পারেন।

তার মানে এই নয় যে তিনিই আল্লাহ! এই বিষয়টাতে মানুষ এতই ভুল করে যে কিছু লোক পুরোপুরি বিভ্রান্তও হয়ে যায়। এক দল লোক আছে যারা এসব সত্য জেনে

www.pathagar.com

ফেলেছে। এসব হলো মারেফত বা আল্লাহর তাওহীদের জ্ঞানের প্রথম স্তরের কথামাত্র, যা তাঁর অলিগণকে তিনি জানিয়ে থাকেন। এই সত্য যিনি পান তিনি সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি হতে পারে ভয়ে তা প্রকাশ করেন না। শুধু নীরবে সৃষ্টির মঙ্গলে নিজের কাজ ক'রে যান। কিন্তু একদল দাম্ভিক উদ্‌ভ্রান্ত লোক এই সত্য অপরের কাছ থেকে শুনে দুয়েকদিন কিছু ছাঁচে-ঢালা কায়দায় সাধনা ক'রে নিজেদেরকে মারফতপন্থী ব'লে প্রচার করে এবং নবী (সঃ) এর শরীয়া এবং সুন্নাহকে পুরোপুরি বাদ দেয়। তারা বলে যে শরীয়ত হলো 'সাধারণ' মানুষের জন্য, এবং তারা নাকি 'অসাধারণ' স্তরে পৌঁছে গেছে। তারা একেবারেই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তিতে যেন কেউ না পড়ে সেজন্য আল্লাহ কোরআনেই প্রশ্ন তুলেছেন :

> তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরিক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে-কারণে **সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে?**—বল, আল্লাহই সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ, আয়াত : ১৬)

> মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অন্তরাল ছাড়া, অথবা সংবাদবাহক পাঠানো ছাড়া, ... (সূরা শুরা, আয়াত : ৫১)

> তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তা থেকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের মৃত্যুকালে স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই। ... তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা অংকুরিত কর, না আমি তা করি? (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৬৪)

> বল–আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল–আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

> তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ বা নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ এবং পৃথিবীর সৃজন, এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ। (সূরা রুম, আয়াত : ২২)

> তার চেয়ে বড় অবিচারী আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে? (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৭)

ভ্রান্ত মারেফতপন্থীরা মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এর কথার গুরুত্বকে বুঝতে না পেরে বলে বসে যে মানুষই আল্লাহ। তাই আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন—তোমরা কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছ?

তারা ভ্রান্ত। তারা মারেফতের নিম্নতম স্তরের জ্ঞান কিংবা অনুভূতিতে পৌঁছেই অহংকারী হয়ে আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। শরীয়ত অনুসরণ না করলে মারেফত হাসিল হতেই পারে না।

www.pathagar.com

... কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৩০)

তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখান, এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবিকা প্রেরণ করেন, কিন্তু কেবল তারাই আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলে–যারা আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে। (সূরা মু'মিন, আয়াত : ১৩)

আবার মারেফতকে কেউ বুঝুক না বুঝুক, তাকে অস্বীকার করলে সে কফুরি করে—কারণ তখন আল্লাহর তাওহীদকেই অস্বীকার করা হয়। তবে সবার সবকিছু জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু কেউ যদি স্পষ্টভাবে প্রমাণ পেয়ে যায় যে কোনো ব্যক্তি নবীর (সঃ) সুন্নাহ অনুসারে চলেন এবং আল্লাহ তাকে করুণা ক'রে তাঁর গোপন জ্ঞান দান করেছেন, তাহলে তেমন ব্যক্তিকে সজ্ঞানে নির্যাতন করা বা তার বিরোধিতা করা হবে ধ্বংসেরই কারণ। কারণ এরূপ ব্যক্তিকে দেখে হিংসার কিছু নেই—তারা সমাজের আর দশজনের মঙ্গলের জন্যই সর্বদা চিন্তিত। তারা বেঁচে থাকেন অন্যদের জন্য। তবে এরূপ ব্যক্তিকে টাকা-পয়সা দিয়ে ভেট দিতে হবে এমনটা নয়। সত্যকে যিনি জেনেছেন, তিনি সকল সংকীর্ণতা এবং অভাবের উর্ধ্বে চ'লে গেছেন। তার কাছে সমাজের আর দশজন তার নিজের চেয়েও প্রিয়।

আবার গতানুগতিক আলেম সমাজের এক দল আছে যারা আল্লাহর মারেফতকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখতে চায়। কেউ তা করে অহংকারবশত, মূলধন জমিয়ে ব্যবসা কামানোর জন্য, যারা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথেই ধ্বংস হবে। আর কিছু আলেম জনগণের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য তা সবার সামনে তুলে ধরেন না। তারা সঠিক পথে আছেন। তবুও প্রায় সবারই—এমনকি প্রত্যক্ষ দিব্যদৃষ্টিধারী অনেকেরও—একটা বড় ভুল রয়ে গেছে। তারা মনে করেন যে আল্লাহর মারেফত একটা ঠুনকো গোপন জিনিস, যাকে প্রকাশ করলেই তা ফুরিয়ে যাবে। আসলে তাদের এই অমূলক ভয়ের পেছনে রয়েছে তাদের জ্ঞানের এবং দৃষ্টির স্বল্পতা। তাদের কেউ কেউ ভেতরে ভেতরে ভেবেই বসে থাকেন যে মানুষই এক পর্যায়ে আল্লাহ হয়ে যায়! এত ক্ষুদ্র কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে তো নবীর সুন্নাহই থাকবে না। তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার দিকে তাকিয়ে বলতে হয় যে তাদের ভয় অমূলক নয়। তারা আল্লাহকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর! ভ্রান্ত! তবে এই ভ্রান্তির মূলে রয়েছেন পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন আউলিয়াগণ, যারা নিজেদের অজান্তেই কিছু বিভ্রান্তির কারণ হয়েছেন—তাঁরা তা সৃষ্টি করেননি বটে, তবে তাঁদের কিছু নীরবতার সুযোগ নিয়ে মানুষ এখন বিভ্রান্ত হচ্ছে।

একটু ভেবে দেখুন তো—আপনাকে এখন যদি একটা জ্বিনে আছর করে, তাহলে, যতক্ষণ সে আপনার মধ্য দিয়ে কথা বলবে, ততক্ষণ কিভাবে তা বলবে? আপনার

www.pathagar.com

আমিত্বটাকে পুরোপুরি দখল ক'রেই সে কথা বলবে। ফলে জ্বিনটা যখন কথা বলবে, তখন আপনি অচেতন থাকবেন। এবং আপনি যখন জেগে উঠবেন, তখন আর বলতে পারবেন না একটু আগে জ্বিনটা আপনার মধ্য দিয়ে কী বলেছিল।

কেউ যখন আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেন, তখন তাঁর নিজস্ব আমিত্বের সংকীর্ণতা আর থাকে না। তিনি আল্লাহর তাওহীদের সাথে একাত্ম হয়ে যান। তখন তিনি তাই-ই বলেন যা আল্লাহ তাঁকে দিয়ে বলান, তাই করেন যা আল্লাহ তাঁকে দিয়ে করান। তাঁর আমিত্ব পুরোপুরি সমর্পিত। এর মানে এই নয় যে তিনি আল্লাহ হয়ে গেছেন! আল্লাহ তো আল্লাহই। আল্লাহ-র ক্ষেত্রে 'হওয়া-না-হওয়া'র কোনো অর্থ নেই। তাঁর শুরু নেই শেষ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পরিবর্তন নেই, অভাব নেই, অস্থিরতা নেই, নশ্বরতা নেই। তিনি তিনিই। বাকি সব তাঁরই করুণায় তাঁরই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অস্তিত্ববান। তিনি যদি একটা বিড়ালের মধ্যেও তাঁর রূহকে প্রকাশ করতেন, তাহলে বিড়ালটাও তাই বলত যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। তাহলে রহস্যটা কোথায়? আমার মধ্যে নয়, তাঁর মধ্যে। সুতরাং সামান্য দিব্যদৃষ্টি পেয়ে মুখে মিটিমিটি হাসি মাখিয়ে ভাবার কোনো দরকার নেই যে আপনিই আল্লাহ হয়েছেন! মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য পায় মাত্র। এমনকি পরকালেও তাই হবে।

তাওহীদের উচ্চতম স্তরে যারা পৌঁছে যান, তাঁরাই কেবল জানেন যে মানুষ একটা তুচ্ছ জীব। সবকিছু আল্লাহরই।

আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে 'কোনটা তিনি নিজে আর কোনটা তাঁর সৃষ্টি' এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। এর জবাব আল্লাহ যাঁদেরকে দেন, তাঁদের স্তর অনেক উঁচুতে। তারাও তা বলতে পারেন না, কারণ এই সত্যের সাথে **মিলে যাওয়া যায়**, তা **বলা যায় না**— মানবীয় যুক্তি এবং ভাষার তা উর্ধ্বে। ভাষা এবং যুক্তি দিয়েছেন আল্লাহ। সুতরাং এই যুক্তি ততদূর পৌঁছাবে যেখানে তা শুরু হয়েছিল। তার উপরে আছে অন্য যুক্তি, যাকে এই যুক্তি দ্বারা আর বর্ণনা করা যাবে না—বর্ণনা করতে যাওয়া মানেই হলো আবার এই যুক্তিতে ফিরে আসা।

সুতরাং এ ব্যাপারে আলেম সমাজের ভয়েরও কিছু নেই। বরং আমাদেরকে খুঁজতে হবে সেই সত্য যা জানলে শরীয়তের সবকিছুকে মারেফত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এবং দেখানো যায় যে **শরীয়তের বাইরে মারেফত ব'লে কিছু নেই**। তবে কেউ যদি সৎভাবে মনে করেন যে তার জ্ঞান বা ভাষা বা যুক্তি শরীয়তকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে মারেফত বুঝানোর জন্য উপযুক্ত নয়, তাহলে তাকে অবশ্যই চুপ ক'রে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কার মুখ দিয়ে কী বলা উচিত তা আল্লাহই ঠিক করবেন।

বর্তমানে Mysticism, Hinduism, Philosophy ইত্যাদিতে আমল ছাড়াই মারেফত শেখানো হয়। এরূপ বিষয়াদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এসব প'ড়ে ভ্রান্ত

www.pathagar.com

পাঠকরা মনে করে যে মানুষই এক পর্যায়ে আল্লাহ হয় বা হবে। তারা মনে করে যে জ্ঞানার্জনই আসল। কিন্তু না, মারেফত কোনো জ্ঞান নয়—তা হলো বাস্তবতার সাথে আমলের মাধ্যমে মিশে যাওয়া—তা জেনে কোনো লাভ নেই, ক্ষতি ছাড়া। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) একথা বলেছেন।

এসব বিষয়ের শিক্ষার্থীদেরকে শরীয়ত অনেক সময়ে একেবারেই শেখানো হয় না বা পালন করানো হয় না। ফলে এদের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের কাছে শরীয়তকে হাস্যকর ব'লে মনে হয়। এদেরকে সত্যটা দেখাতে হলে শরীয়ত এবং মারেফতকে একত্র করতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যাটা হলো *থিওরি অব রিলেটিভিটি* এবং *কোয়ান্টাম থিওরিকে* মেলানো, যার পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা চলছে। আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের মৌলিকতম সমস্যা হলো *বিজ্ঞান ও বাস্তবতাকে* এবং *ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানকে* মেলানো। **এগুলো কোনোদিনও মিলবে না, আল্লাহর তাওহীদ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া। অতএব মানব-মস্তিষ্কে আসতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে তাওহীদ জটিলতম। মানুষের সকল জ্ঞানের লক্ষ্যই হলো এই তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা।**

বিজ্ঞানও তার উচ্চতম পর্যায়ে এটাই দেখাতে চায়—দেখাতে চায় বাস্তবতার সব মাত্রার উৎস আসলে এক কি-না। কিন্তু বিজ্ঞান এমন এক জায়গায় এসে থেমে গেছে যেখান থেকে আল্লাহর অলিদের যাত্রা শুরু হয়। **বিজ্ঞান এসে থেমেছে একটা আত্মবিরোধে। তার ভিত্তিতে সে বলছে যে যেহেতু দুইকে এক-এ মেলানো সম্ভব নয়, সেহেতু আর এগোনো সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহর অলিগণ জানেন যে আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁদের দরকার আত্মবিরোধই। তাঁরা আত্মবিরোধই অনুসন্ধান করেন এবং একে একে সেগুলো অতিক্রম করেন। আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া মানেই তো হলো তাঁর তাওহীদে একাকার হয়ে যাওয়া। এর মানেই তো হলো দুই বিপরীতের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া। তা যখন ঘটে, তখন দুই বিপরীত এক হয়ে যায়—আমিত্ব লোপ পায়, আল্লাহর শান প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন আর দুই থাকে না। এক হয়ে যায় সব। সাধক তখন মৃত্যুর অতীতে গিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে বেঁচে থাকেন। এটাই তো ইবাদত। এটাই তো কাম্য। অথচ তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবীরা' আত্মবিরোধ দেখেই ছিটকে ত্রিশ গজ দূরে সরে যায়। অথচ সৌভাগ্য এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায় তখনই যখন আমরা একটা আত্মবিরোধের মুখোমুখি হই।**

সুতরাং জ্ঞানী পাঠককে অনুরোধ করব—জীবনটাকে আরেকবার বিবেচনা করুন। এমনও হতে পারে যে আপনিই হবেন সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যারা জীবদ্দশাতেই মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যান। রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসরণ করুন। তাতে যদি দিব্যদৃষ্টি না-ও পান, কিছু এসে যায় না—যা জানবার মৃত্যুর সময়ে ঠিকই জেনে যাবেন, যা পাবার মৃত্যুর সময়ে ঠিকই পেয়ে যাবেন। দুশ্চিন্তা কী!

www.pathagar.com

মারেফত-দাম্ভিক সুন্নাহ-বিরোধী জ্ঞানীদের মেকিত্ব প্রমাণিত হয়ে যাবে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে—সিজদায় গিয়ে মৃত্যু কামনা করুন, যদি সাহস থাকে। মৃত্যুর সাধনা না ক'রে কেউ আউলিয়া হন না। যদি কেউ তা বাদ দিয়ে, আল্লাহর ভয় বাদ দিয়ে, কেবল তথাকথিত কিছু উপায়ে কলবে বা হার্টে জিকির প্রতিষ্ঠায় আল্লাহকে কেবল প্রেমাস্পদ মনে করায় এবং মারেফত শেখায় ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে কিছু রহস্য জেনে আল্লাহকে কেবল বন্ধু ভেবে ব'সে থাকবে, তাঁর প্রতিহিংসামূলক এবং ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করবে না। অথচ কোরআনে আল্লাহ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে তার জৌলুস দেখিয়ে ভয় দিয়েছেন। যারা প্রকৃত মারেফতধারী, তারা জানেন যে আল্লাহর শাস্তি আক্ষরিক অর্থেই মারাত্মক কঠোর এবং ধ্বংসাত্মক। সামান্য পৃথিবীর খুন-খারাবি রাহাজানি-হিংসা-বিচারের কঠোরতা ভূমিকম্প-ঝড়-বন্যা ইত্যাদির কারণে তাই মানুষের অবস্থা থরেকম্প; এমতাবস্থায় বিনা আমলে আল্লাহকে বন্ধু ভেবে ব'সে থাকলে তা হবে জঘন্য বোকামি। আল্লাহর সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা করার অবকাশ নেই। তার মারেফতও আসতে হবে কোরআন থেকে, নইলে তা হবে ধ্বংসের কারণ :

> তার চেয়ে বড় অবিচারী আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে? (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৭)

সুতরাং মেকি মারেফতপন্থীদের সাবধান হওয়া উচিত। অন্যদিকে বিজ্ঞ আলেমদেরও ভয়ের কিছু নেই—বিভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানকে যারা মারেফতের নামে চালিয়ে দিচ্ছে, তাদের দ্বারা প্রকৃত ধার্মিক কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আল্লাহর মারেফতের নামে কিছু ভ্রান্ত জ্ঞান জেনে ফেললেই কিন্তু আল্লাহ দুর্বল বা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যান না—বরং তাঁর কঠোরতা আরো বেড়ে যায়।

> তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? তা থেকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের মৃত্যুকালে স্থির করেছি, এবং আমি অক্ষমও নই। ... তোমরা তো প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা অংকুরিত কর, না আমি তা করি? (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৬৪)

> বল—আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল—আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

> ... আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮)

> ... আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও জমিনের পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখাই, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর যখন তার ওপর রাত আচ্ছন্ন হলো, তখন সে নক্ষত্র

www.pathagar.com

দেখে বলর, এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, **যা অস্তমিত হয় আমি তা পছন্দ করি না**। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। যখন সেটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। এটাই সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর সমকক্ষ কর, তা থেকে আমি মুক্ত। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মুখ স্থাপন করলাম **যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন**। এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন'আম, আয়াত : ৭৫-৭৯)

বল–আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন? বল–আল্লাহ। হয় আমরা সৎপথে স্থিত, এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ, এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। (সূরা সাবা, আয়াত : ২৪)

ওরা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি ওরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? নাকি ওরা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? (সূরা তূর, আয়াত : ৩৫-৩৬)

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অন্তরাল ছাড়া, অথবা সংবাদবাহক পাঠানো ছাড়া, ... (সূরা শুরা, আয়াত : ৫১)

এবং সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত ক'র না, কিংবা সত্যকে জেনে তা গোপন ক'র না।
(সূরা বাকারা, আয়াত : ৪২)

যাহোক, চাঁদ মনে করে পৃথিবী তার কেন্দ্র, ফলে সে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এবং পৃথিবী জানে যে সূর্য তার কেন্দ্র, ফলে সে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এবং যার-যার কেন্দ্রকে প্রত্যেকে ঠিকঠাক রাখে ব'লে সার্বিক কেন্দ্রের ঐক্য বিনষ্ট হয় না। অন্য কথায়, সার্বিক কেন্দ্রের ঐক্যকে মেনে চলার ক্ষেত্রে চাঁদকে শুধু এটুকু পালন করাই যথেষ্ট যে সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে। প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান-কাল-দায়িত্ব আছে। তার জন্য শুধু সেটুকুই অবশ্যপালনীয় এবং সেটুকু পালন করাই তার জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার অর্পণ করা হয় না। কি টাকা-কড়ি, কি মেহমানদারি, কি রোগযন্ত্রণা—সবক্ষেত্রেই কোরআনের কথাটা সত্য। **কেউ যেন তার স্থান চেড়ে ভুল স্থানে না চ'লে যায়**। কোরআনে বলা হয়েছে—আকাশ এবং পৃথিবীকে যদি মানুষের খামখেয়ালিপূর্ণ ইচ্ছা অনুসারে চালানো হতো, তাহলে তার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এজন্য আল্লাহ মানুষের আচরণকে দৃশ্যমান সৃষ্টির পরিচালন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত ক'রেও সবক্ষেত্রে কিছু সীমারেখা রেখে দিয়েছেন। মানুষের সীমালঙ্ঘন যেন প্রকৃতির ভারসাম্যকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত না করে সেজন্য তিনি পূর্বনির্ধারিত বিধানও ক'রে রেখেছেন। তবুও মানুষই যাবতীয় অনিয়মের জন্য দায়ী। কোরআনে বলা হয়েছে যে মানুষের কৃতকর্মের জন্য আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, যা তাদেরই কর্মফল স্বরূপ তাদের কাছে ফেরত আসে, যেন তারা তা পর্যবেক্ষণ ক'রে তওবা করার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

সুতরাং যার সাথে যার যে-সম্পর্ক, তার সাথে তা দৃঢ়ভাবে সম্মানের সাথে বজায় রাখা মানেই তার তরফ থেকে নিজের প্রতি সুবিচার করা। প্রত্যেকটা ব্যক্তির সাথেই গোটা নিখিল-বিশ্বের যোগসূত্র রয়েছে, এবং তার বিশ্ব তার কাজকে অবলম্বন ক'রেই তার সাথে ক্রিয়া করে। এক কথায় প্রত্যেকের মহাবিশ্বের সে নিজেই কেন্দ্র; তার মধ্যে আল্লাহর রূহ অবস্থান করাতে তার এই সম্মান। সুতরাং সেই বিশ্বে যে তার বোন সে তার বোনই, যিনি মা তিনি মা-ই, যে ভাই সে ভাই-ই, যে কন্যা সে কন্যাই, যিনি স্ত্রী তিনি স্ত্রীই। প্রত্যেকের সাথে তার যে সম্পর্ক, তাকে তাই-ই বহাল রাখতে বলা হয়েছে। নইলে কেউ তাকে ক্ষতি করবে না—সে নিজেই নিজের কর্মফল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে :

কিন্তু আল্লাহ তাদের কোনো ক্ষতি করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।
(সূরা নহল, আয়াত : ৩৩)

তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৯)

হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদেরই বিরুদ্ধে যায়। (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৩)

তোমরা অনুমান ও নিজেদের স্বভাবের অনুসরণ কর, যদিও তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, আয়াত : ২৩)

সারা পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আর যদি কেউ না থাকত, তাহলে আপনি প্রথমে একজন মা এবং একজন বাবা চাইতেন—কারণ তারা বিগত হলেও তাদের তৃষ্ণা আপনার জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ আকারে রয়ে গেছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়া যায় না ব'লে বয়োবৃদ্ধির সূচনালগ্নে আপনি খেলার সাথী ভাই-বোন ইত্যাদি চাইতেন। তারপর একজন স্ত্রী চাইতেন। তারপর সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিবেশী দেশবাসী ইত্যাদি চাইতেন। আপনাকে ঘিরে তা-ই তো আছে, যার তৃষ্ণা আপনার হৃদয়ে ছিল। সুতরাং **প্রত্যেকের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা মানেই তো হলো নিজেকে ভালোবাসা**। আপনি তো শুধুই স্ত্রী চাননি, একজন প্রতিবেশী বন্ধুও চেয়েছিলেন। সেই বন্ধুর জন্য একজন স্ত্রীও দরকার ছিল। সুতরাং সব তো আপনারই কামনার ফলস্বরূপ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, আপনার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে। আপনি কি একা পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতেন? রবিনসন ক্রুসো কি পেরেছিল? শুধু স্ত্রী হলেই কি আপনার চলত? তাহলে অন্যদের স্ত্রীর দিকে সেই দৃষ্টি কেন দেবেন যা দেন নিজের স্ত্রীর বা স্ত্রীদের প্রতি? **আপনার প্রয়োজন এক রকমের, আচরণ করবেন আর এক রকমের, তা কেন? তা যদি করেনই, তাহলে যা হবার তা হবে।** মৃত্যুর সময়ে কিছুই নিজের আয়ত্তে থাকবে না—সব চ'লে যাবে আপনার কর্মফলের অধীনে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অপরপক্ষে, আপনি যদি স্রষ্টার তাওহীদ বা ঐক্যের মালায় সৃষ্টিকে গেঁথে নিয়ে সবার সাথে সেই ঐক্যেরই সম্মানে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখেন, তাহলে মৃত্যুর সময়ে—

www.pathagar.com

এমনকি জীবদ্দশাতেই—আপনার কর্মফল আপনার পক্ষে যাবে এবং সবই আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে—এবং তারপর দেখবেন যে গোটা সৃষ্টিজগৎকেই আল্লাহ্ আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন। কারণ :

আকাশ এবং পৃথিবী উভয়স্থানেই তিনি আল্লাহ। (সূরা আন্'আম, আয়াত : ৩)

আপনি কে? দেহটা শুধু? যখন আপনি বাথরুম থেকে কথা বলেন, 'আমি বাথরুমে, আসছি গো', তখন আপনি মানে আপনার দেহটা। তখন আপনি মানে আপনার মনটাও নয়, কেননা আপনার মনটা ততক্ষণে বাথরুমে নেই, যাকে 'আসছি' বলেছেন তার কাছে চ'লে গেছে। আপনি যখন মহল্লার বা পাড়ার বখাটে ছেলেদেরকে বলেন, 'আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা কিসের? আমি তোমাদেরকে পুলিশে দেব', তখন আপনি মানে আপনার পরিবার—আপনি তখন গোটা পরিবারের পক্ষে কথা বলেছেন। আপনি যখন মহল্লার বা পাড়ার নেতা হয়ে আরেক মহল্লায় যান কোনো সালিশ বা চুক্তি করতে, তখন আপনি মানে আপনার মহল্লাটা—আপনি তাদের সবার পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছেন। আপনি যখন সংসদে আপনার দাবি পেশ করেন, তখন আপনি মানে আপনার গোটা নির্বাচনী এলাকা—আপনি সবার পক্ষ থেকে কথা বলছেন। এভাবে আপনি যখনই রসুলের (সঃ) সুন্নাহ অনুসরণ ক'রে আল্লাহর পথে জীবনযাপন করার জন্য নেমেছেন, তখন আপনি মানে গোটা পৃথিবীর মুসলমান সম্প্রদায়—কারণ আপনি সবার জন্য দোয়া ক'রে থাকেন, সবার সাথে বিশ্বাস এবং আচরণসূত্রে অভিন্ন, সবার ওপর আপনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দায়িত্ব আছে : সবাই আপনার ভাই-বোন। তাই তো কোরআনে বলা হয়েছে যে, যে-কেউ একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করল সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল, এবং যে-কেউ একজন বিশ্বাসীকে বাঁচাল/সাহায্য করল, সে যেন গোটা মানবজাতিকে বাঁচাল।

তিনি (আল্লাহ) বললেন–হে নূহ, সে [নূহ (আঃ) এর পুত্র] তোমার পরিবারের কেউ নয়, কারণ সে সদাচারী নয় ... (সূরা হূদ, আয়াত : ৪৬)

বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০)

তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান একটামাত্র প্রাণীর সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব—তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে। (সূরা আল্-হিজর, আয়াত : ৪৭)

সুতরাং সারাবিশ্বে আপনি আর ইবলিস ছাড়া কেউ নেই। আপনি কি ইবলিসের কথায় কান দিয়ে নিজের সাথেই বিরোধিতা করবেন?

www.pathagar.com

আল্লাহ আপনারই মঙ্গল চেয়েছেন—আপনি কি ইবলিসের মঙ্গল চান?

এই সত্য যে জেনেছে, সে মৃত্যুকে মেনে নেবে তবুও পরকীয়াকে প্রশ্রয় দেবে না। কে আপনার পর? পরকীয়া হবে কিভাবে?

চলার পথে যত সুন্দরী নারীই দেখেন না কেন, তার দিকে একবারের বেশি কখনও তাকাবেন না। নিজেকে জোর ক'রে ধ'রে রাখুন। 'আমি তো শুধু সৌন্দর্য দেখছি' এই অর্থেও তাকাবেন না। তাহলে দেখবেন যে সেই নারীর প্রতি—তথা সব নারীর প্রতি—আপনার ভালোবাসা তাৎক্ষণিকভাবেই বেড়ে যাবে। কারণ সে তখন বাইরে থেকে আপনার ভেতরে চ'লে আসবে। আপনি দেখবেন যে 'সে' ব'লে কিছু নেই—আপনিই : **আপনি আপনার বিচ্ছিন্নতাবাদকে চাপা দিয়েছেন, ফলে আপনি তাওহীদের ঐক্য বরাবর বিস্তৃত হয়েছেন এবং সবকিছুকে আপনার মধ্যে পেয়েছেন**। যে-অর্থে আপনার পরিবার মানে আপনি, যে-অর্থে আপনার সমাজ মানে আপনি, যে-অর্থে গোটা মুসলিম উম্মাহ মানে আপনি—সেই অর্থে, অথচ নিবিড় পারিবারিক বন্ধনের আকর্ষণে এবং নিখাঁদ ভালোবাসার তীব্রতায়, আপনি সব নারীকেই নিজের মধ্যে পেয়ে যাবেন—যেখানে সবাই হবে আপনার বোন এবং কারোরই অপ্রস্তুত মুহূর্তে তার দিকে আপনার তাকাতে ইচ্ছা করবে না। **এই ইচ্ছা না-করার জন্যই আপনি প্রচণ্ড তৃপ্তি পাবেন**। আপনি কি আপনার বোনের দিকে তার অপ্রস্তুত মুহূর্তে তাকিয়ে তৃপ্তি পান, নাকি না-তাকিয়ে?

সুতরাং ভালোবাসার যৌনতাপূর্ণ যে-অংশ আছে তার সবটুকু আপনার স্ত্রীকে বা স্ত্রীগণকে দিন। স্ত্রীকে প্রশ্রয় দিন, ভালোবাসুন, তার সামান্য বায়না সহ্য করুন। যে-ব্যক্তি অহংকারী সে ছাড়া সবাই স্ত্রীকে সহজে সহ্য করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন—'হে আদম! ইবলিস তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু ... (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১১৭) সুতরাং আপনার ও আপনার স্ত্রীর মধ্যে যে মতানৈক্য আছে তা এসেছে পুরোপুরি ইবলিসের কাছ থেকে। তার কথামতো আপনি অহংকারী এবং আত্মাকেন্দ্রিক আচরণ করেন বলে আপনার স্ত্রীর আবদারকে আপনার কাছে ভালো লাগে না। ইবলিসকে তাড়িয়ে দিন। স্ত্রীকে সাদরে আলিঙ্গন করুন। পরকীয়াকে হৃদয় থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করুন।

> যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি আছে, এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।
>
> (সূরা নূর, আয়াত : ১৯)

> বিশ্বাসীদেরকে বল—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে, এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে—এটাই তাদের জন্য উত্তম; ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদেরকে বল—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন-অঙ্গের হেফাজত করে, এবং যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাছাড়া যেন নিজের বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন নিজ-নিজ বক্ষসমূহের ওপর আবরণী স্থাপন করে; তারা

www.pathagar.com

যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভাতুষ্পুত্র, ভগ্নি-পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন-কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (নরনারী), তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ দয়ায় অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান ওদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে তোমরা ওদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিনী হতে (অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি করতে) বাধ্য ক'র না। তবে কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে, তবে তাদের বাধ্য হবার পর (নরুপায় অবস্থায়) নিশ্চয় আল্লাহ (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, দয়াময়। আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি—তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও সংযমীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ।

(সূরা নূর, আয়াত : ৩০-৩৪)

www.pathagar.com

বারো

আল্লাহর আক্রোশ

আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তাঁকে ভয় না ক'রে তাঁকে ভালোবাসা যায় না। তাঁর শাস্তি যে কত কঠোর তা নিচের আয়াতগুলো থেকেই বুঝা যাবে।

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। (সূরা ফাবির, আয়াত : ৪৫)

... শপথ সমুন্নত আকাশের। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তা অনিবার্য। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে। এবং পর্বতমালা উন্মূলিত হবে। সেই দিন মিথ্যাবাদীদের জন্য দুর্ভোগ। যারা খেলাচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। (সূরা তূর, আয়াত : ৫-১১)

তুমি কি জান (হে মুহাম্মদ (সঃ))—**সম্ভবত** কেয়ামত আসন্ন। যারা বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে তা ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে তা সত্য। (সূরা হা-মীম-আস্-সিজদাহ, আয়াত : ১৭-১৮)

কেয়ামতের **লক্ষণসমূহ** তো এসে পড়েছে। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

বড় শাস্তির আগে আমি ওদেরকে অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যেন ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ২১)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহর পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ যা হারিয়েছে), তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না, আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২-২৩)

ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন সে পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করেছিল, **তখন তার ভাগ্য নির্ণয় কর হলো,** ফলত সে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস তাকে গিলে ফেলল, তখন সে ধিক্কারযোগ্য। সে **যদি** আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, **তাহলে** তাকে মাছের পেটে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো। (সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

www.pathagar.com

তোমাদের নিটক শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম কেতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, যেন (পরে) কাউকে বলতে না হয়—হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টবিদ্রূপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে—আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। (সূরা যুমার, আয়াত : ৫৪-৫৭)

যেদিন আকাশ মেঘাপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।
(সূরা ফোরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

তোমরা অবিশ্বাসী হলে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন—তিনি তাঁর সেবকগণের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৭)

যে সৎ কাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, এবং কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্, আয়াত : ৪৬)

তোমরা সৎকাজ করলে তা করবে নিজেদের জন্যে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। (সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৭)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত।
(সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬)

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, এবং এটাই তার স্বভাবগত কর্তব্য। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত ক'রে সমতল করা হবে। এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।
(সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত : ১-৪)

যখন সূর্যকে সংকুচিত করা হবে। যখন নক্ষত্র খ'সে পড়বে। পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে। সমুদ্র যখন স্ফীত হবে ... . যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে—সে কী নিয়ে এসেছে। আমি ভ্রাম্যমাণ গ্রহনক্ষত্রের শপথ করি, যা গতিশীল ও স্থিতিবান। (এবং শপথ) রজনীর যখন তা গত হয়। এবং উষার, যখন তার আবির্ভাব হয়। নিশ্চয় এ কোরআন এক সম্মানিত রসূলের ওপর অবতারিত আল্লাহর বাণী।
(সূরা তাক্‌ভীর, আয়াত : ১-১৯)

যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।
(সূরা নূর, আয়াত : ৫২)

... আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮)

www.pathagar.com

মানুষ কি মনে করে যে, শুধু আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? নিশ্চয়ই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ ক'রে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।
(সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩)

আল্লাহর **অনুমতি** ছাড়া কোনো বিপদই পতিত হয় না, এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।
(সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১)

যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কর না, বরং এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এই কথা (অর্থাৎ রসুল (সঃ) এর এক স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ) শুনবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ-ধারণা করেনি এবং বলেনি এতো নির্জলা অপবাদ। **তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি** সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। (সূরা নূর, আয়াত : ১১-১২)

সকালবেলায় বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করল। (সূরা ক্বামার, আয়াত : ৩৮)

আমি ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম, যাতে ওরা সৎপথে ফেরে। (সূরা যুখরোফ, আয়াত : ৪৮)

তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে এবং একটা সময় নির্ধারিত না হলে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১২৯)

পৃথিবীতে বা তোমাদের মনোজগতে এমন কোনো দুঃখ-দুর্দশায় কারণ ঘটে না যা ঘটানোর আগে আমি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখিনি; আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ।

সেইদিনই আল্লাহর **চূড়ান্ত কর্তৃত্ব** হবে। তিনিই ওদের বিচার করবেন।
(সূরা হজ্ব, আয়াত : ৫৬)

যারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে, তারা আগুনের সঙ্গী হবে তারা তাতে অবস্থান করবে (চিরকাল)। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

... অতঃপর তারা **ভূমিকম্প** দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা **নিজগৃহে** অধোমুখে শেষ হয়ে গেল। (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৯১)

ওরা কি পৃথিবীকে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত ওদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ওদের চেয়ে শক্তি এবং কীর্তিতে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। (সূরা মুমিন, আয়াত : ২১)

তিনিই 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন; এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও—কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেননি। এবং এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন; ওরা ছিল

www.pathagar.com

অতিশয় অত্যাচারী, অবাধ্য। তিনিই লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে শূন্যে উত্তোলন ক'রে নিক্ষেপ করেছিলেন। সর্বগ্রাসী শাস্তি ওকে আচ্ছন্ন করল। ... কেয়ামত আসন্ন। আল্লাহ ছাড়া কেউই তা ঘটাতে সক্ষম নয়। তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসিঠাট্টা করছ? ক্রন্দন করছ? তোমরা তো উদাসীন। অতএব তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁরই উপাসনা কর। (সূরা নাজম, আয়াত : ৫০-৬২)

মানুষের প্রতি দয়া দেখালে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। বল [হে মুহাম্মদ (সাঃ)]–তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরাআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং এ তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত আছ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী বিশ্বজগতে প্রকাশ করব এবং (প্রকাশ করব) ওদের নিজেদের (মনোজগতের) মধ্যেও, ফলে ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই (কোরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সব বিষয়ে জ্ঞাত? জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে : জেনে রাখ, আল্লাহ সব কিছুকে ঘিরে আছেন।

(সূরা হা-মীম-আস্‌-সিজদাহ, আয়াত : ৫১-৫৪)

বস্তুত যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে। ওরা কি ওদের সামনে ও পেছনে যে আসমান ও জমিন আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদের সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেব অথবা ওদের ওপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাবে; আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি দাসের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

(সূরা সা-বা, আয়াত : ৮-৯)

এই নিদর্শন কি কিছুদিন আগে আমরা ভারতের গুজরাটে লক্ষ্য করিনি? আল্লাহই তো বলেছেন :

আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা সা-বা, আয়াত : ১৭)

প্রত্যেক বিরুদ্ধাচারী অবিশ্বাসীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর; যে ভালো কাজে বাধা দিত, সীমালঙ্ঘন করত ও সন্দেহ করত। (সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২৫)

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীস্টান-বৈরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৪০)

তাহলে কি তোমরা নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, কিংবা তোমাদের ওপর শিলাবর্ষণ করবেন না, তখন তোমরা কোনোই অভিভাবক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের আবার সাগরে নিমজ্জিত করবেন না। কিংবা তোমাদের ওপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাবেন না, এবং তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনোই প্রতিদ্বন্দ্বী (সাহায্যকারী) পাবে না।

(সূরা বনি-ইসরাইল, আয়াত : ৬৮-৬৯)

www.pathagar.com

বিশ্বজগতের জন্য এ (কোরআন) **উপদেশমাত্র**। এর সংবাদের সত্যতা কিছুকাল পরে তোমরা অবশ্যই জানবে। (সূরা সাদ, আয়াত : ৮৭-৮৮)

যেসব মরুবাসী গৃহে গিয়েছিল, তাদেরকে বল–তোমরা অচিরেই এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে–যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগে মতো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। (সূরা ফাতাহ্, আয়াত : ১৬)

যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে আল্লাহ ওদেরকে ভূ-তলে বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত? অথবা চলাফেরা করার সময়ে তিনি ওদেরকে পাকড়াও করবেন না?

(সূরা নহল, আয়াত : ৪৫-৪৬)

কেউ বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং প্রত্যাখানের জন্য হৃদয় মুক্ত রাখলে তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হবে এবং তার জন্য মহা শাস্তি আছে ... ।

(সূরা নহর, আয়াত : ১০৬)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমরা প্রত্যেকে তা থেকে ব্যয় কর–মৃত্যু আসার আগে, নইলে মৃত্যু আসলে সে বলবে–হে প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য সময় দিলে আমি দান করতাম, এবং সৎশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে সময় দেন না। (সূরা মোনাফেকুন, আয়াত : ৯-১১)

www.pathagar.com

পরবর্তী বই

- **কোরানিক সাধনা এবং আত্মার তীর্থযাত্রা**

  এই বইটি হলো বর্তমান বইটির ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় ধাপ। বর্তমান বইটিতে মূলত মৃত্যুহীন লোকে পৌঁছানোর প্রাথমিক তত্ত্বাবলী আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ব্যবহারিক পথ বাতলে দেয়া হয়নি। এই প্রায়োগিক বা practical পথ বাতলে দেয়া হবে প্রস্তাবিত এই বইতে, ইনশাল্লাহ। লেখক কোরআনের কিছু গূঢ় রহস্য প্রকাশ করতে চান। কিন্তু তিনি তা তাদের কাছেই করতে চান যারা তা বোঝার জন্য উপযুক্ত হয়েছেন। এভাবে পাঠককে উপযুক্ত ক'রে নেয়ার জন্যই এই বইটি। অবশ্য যারা আগে থেকেই আল্লাহর করুণায় যোগ্যতা লাভ করেছেন, তাদের কথা আলাদা। 'কোরানিক সাধনা এবং আত্মার তীর্থযাত্রা' হবে মুসলিম হৃদয়ের জন্য এরূপ একটি বই, যার জন্য আল্লাহ-প্রেমিক হৃদয় উদ্‌গ্রীব এবং তৃষ্ণার্ত—এটাই আমাদের বিশ্বাস।

- **আল্লাহর পরিচয় : জাহের ও বাতেন**—পূর্ববর্তী বইটি না পড়লে এবং আমল না করলে এই বইটি পড়া নিষিদ্ধ। তাতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না, পাঠক বইটি থেকে মন প্রস্তুত থাকলে যা পেতে পারতেন অপ্রস্তুত মনে তা পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন না ব'লেই এই নিষেধাজ্ঞা। নামাজ-ত্যাগী নামে-মুসলমানের এসব বই পড়ার দরকার নেই।

- **নামাজের মহাজাগতিক রহস্য**—বইটির নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনুমান করা যাচ্ছে। লেখককে আল্লাহ্ তৌফিক দিলে হয়তো এই বইটি হবে মানব মন সম্বন্ধে এযাবৎকালের আবিষ্কৃত মহারহস্যগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

- **কোরআন এক মহাবিস্ময় : রহস্যোদ্ঘাটন, স্তরভেদ, এবং আলোকপ্রাপ্তি :** বর্তমানে লেখকের জীবনের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হলো এই বইটিকে আল্লাহর করুণায় সফলভাবে রচনা করা।

- **কোরআন পুরাণ গীতা—কোথায় মিল, কোথায় অমিল, কেন?**

- **কোরআন এবং ধম্মপদ—মিল-অমিলের রহস্য**

www.pathagar.com

- **বেহেস্ত-দোজখ দেখে এলাম**—প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতার সাথে কোরআন-হাদীসের সমন্বয়। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন সব আপনারই তাজা অভিজ্ঞতা। এক রহস্যময় গ্রন্থ! না পড়া পর্যন্ত বুঝতে পারবেন না লেখক কার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

- প্রিয় পাঠক, আপনি যদি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ)-কে ভালোবাসার জন্য এই লেখককে ভালোবেসে থাকেন, এবং যদি মনে করেন যে তার বই দ্বারা প্রকৃত ইসলামের প্রসার ঘটবে, তাহলে মুসলিম এবং অমুসলিম ব্যক্তিদেরকে তার বই উপহার দিন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোরানিক সেলফ কন্ট্রোল এবং মৃত্যুহীন জীবন